

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৩

প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া,

কলিকাতা ৩৭

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :

খালেদ চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

উৎসর্গ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

-

এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সন—মোটামুটি এই সময়ের মধ্যে নিবন্ধগুলি রচিত হয়, তবে দু-একটির রচনাকাল তারও পূর্বে হতে পারে।

গ্রন্থটিতে নানা বিষয়ক রচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে, তবে সেগুলি নানাখানা নয়। সব কটি রচনাই সংস্কৃতি সম্পর্কিত, সেই দিক দিয়ে রচনাগুলির ভিতর একটা সঙ্গতিসূত্র সহজেই আবিষ্কার করা যেতে পারে। বাংলা দেশের শিল্প-সংস্কৃতির নানামুখী ধারার উপর আলোকপাতের চেষ্টা আছে বইটিতে, এই চেষ্টার সাফল্য-অসাফল্য সুধীবর্গ বিচার করবেন।

ইতিপূর্বে 'বাংলার সাহিত্য' নামক আমার একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলার সংস্কৃতি'কে তার পরিপূরক গ্রন্থ বলা যেতে পারে। উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। এই সুযোগে বেঙ্গল পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই।

দুটি গ্রন্থেরই মুদ্রণ-ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন ও অনুজপ্রতিম সুহৃৎ স্নেহাস্পদ শ্রীপশুপতি দের সহায়তাও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করছি।

কলিকাতা
১৩ই শ্রাবণ ১৩৬৩

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, বিভেদের মধ্যে ঐক্যই হল ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনা। 'বিভেদের মধ্যে ঐক্য' অর্থাৎ বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তাদের অন্তর্শায়ী সঙ্গতির সূত্রটিকে আবিষ্কার ও অবলম্বন করবার ক্ষমতা। ভারতীয় সাধনায় এই ক্ষমতা সহজাত, তার এই বৈশিষ্ট্য অতীত থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ আছে। হয়তো এ ক্ষমতার প্রয়োগে সাময়িক রূপভেদ ঘটেছে কিন্তু মূল উপাদানটি আগাগোড়া অবিকৃত থেকেছে। ভাবতবর্ষ সম্পর্কে এই-যে পরম সত্য, এই সত্যে উপনীত হবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে গড়পরতা ঐতিহাসিকের ন্যায় ইতিহাসগ্রন্থের সমুদ্র মন্থন করতে হয় নি, তিনি কতকটা তাঁর কবিসুলভ ধ্যানদৃষ্টির প্রসাদেই এই সত্যে উপনীত হতে পেরেছেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এবং অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ভারতের ইতিহাসপ্রণেতা অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁদের গ্রন্থাদিতে ঠিক এই সত্যই প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি আশ্রয় করে; সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির নির্যাসরূপে এই পরম সত্যটিকে খুঁজে বার করতে হলে যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন, শুষ্ক ইতিহাস-চর্চাকারী পণ্ডিতদের মানসিক গঠনের ভিতর স্বতঃই তা থাকবার কথা নয়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই কল্পনাশক্তি অপরিমেয় মাত্রায় ছিল। কবিদের মধ্যে যাঁরা দ্রষ্টা, ঋষি পর্যায়ের মানুষ তাঁদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপরে একটি করে ষষ্ঠেন্দ্রিয় (sixth sense) থাকে। আমাদের সাহিত্যের পরিভাষায় একে আমরা তৃতীয় নয়ন বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ছিল এই তৃতীয় নয়ন। আর এই তৃতীয় নয়নের সাহায্যেই তিনি ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এত বড় একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সুপরিচিত বক্তব্য প্রতিপাদন করতে গিয়ে কি পরিমাণ ও কতটা বিশুদ্ধ ইতিহাস-গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন বলতে পারব না, তবে এ ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকে প্রচুর প্রেরণা পেয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস প্রকারান্তরে সমন্বয়-সাধনেরই ইতিহাস। এ সমন্বয়-প্রয়াস জীবনের নানা স্তরকে আশ্রয় করে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। কখনও এ সমন্বয় বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনপ্রয়াসের রূপ নিয়েছে, কখনও পরস্পর-বিরোধী আচার-আচরণ সমূহের মিলনের আকার পরিগ্রহ করেছে, কখনও এ সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে ভারতের অধিবাসী বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী গূঢ় ঐক্য, কখনও তা বিভিন্ন শিল্পরীতির মিলনে অভিব্যক্ত হয়েছে, আবার এ সবেরই উর্ধ্বে এবং এ সব কিছুকেই নিয়ে বিশুদ্ধ মানসিক সামঞ্জস্যের সাধনাটাও ওই একই সমন্বয়-প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। খতিয়ে দেখতে গেলে, শেষোক্ত সাধনাটাই সমন্বয়-রাজ্যের সব চাইতে বড় ঘটনা। কেন না পরস্পর-বিরোধী মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মত কঠিন কাজ আর নেই। এই দুরূহ সাধনায় যিনি যত বেশী সাফল্য অর্জনের ক্ষমতা রাখেন তিনি আধ্যাত্মিক সিদ্ধির পথে তত বেশী অগ্রগামী হন। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, ভারতবর্ষ চিরকাল এই দুরূহ সাধনার আদর্শটিকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। বর্তমানকালে আমরা নানা দিক দিয়ে যতই অধঃপতিত হই না কেন, উক্ত সাধনার কিঞ্চিৎ সুফল উত্তরাধিকার-সূত্রে নিশ্চয়ই আমরা লাভ করেছি। তা যদি না হত, আধুনিক জীবনের এত শত বিপর্যয়ের মধ্যে আমরা টিকে থাকতে পারতাম কি না সন্দেহ।

সংস্কৃতির প্রসঙ্গে এ সব কথার আলোচনা কারও কারও নিকট অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতি কি শুধুই শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ভাস্কর্য ইত্যাদি চারুকলামূলক তৎপরতা? সে কি তার বেশী কিছু নয়? আমাদের তো মনে হয় শিল্প সাহিত্যগত প্রয়াস আর সংস্কৃতিকে অভিন্ন মনে করলে সংস্কৃতির পরিধিকে নিতান্ত সঙ্কুচিত করে দেখা হয়। 'সংস্কৃতি' কথাটি আরও

অনেক বেশী উদার অর্থে ব্যবহৃতব্য এবং সেইটেই তার উপযুক্ত অর্থ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় একটা গোটা জাতির mode of living, তার ধ্যান ধারণা আচরণ শীলাদি। অর্থাৎ সংস্কৃতি হল একটা দেশের সামগ্রিক জীবনচর্যার আদর্শ। এই আদর্শের ভিতর যেমন শিল্পচিন্তার স্থান আছে, যেমন আছে বিদ্যাশিক্ষার একটি সুনিরূপিত স্থান, তেমনি আছে আচার-আচরণের শুচিতা, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, সহানুভূতি, মৈত্রী প্রভৃতি সদ্ধর্মের পোষকতা। অর্থাৎ মানুষের মানসিক জীবন এবং কর্মজীবন, ব্যক্তি-জীবন এবং সামাজিক জীবন—এই দ্বিবিধ জীবনের যোগফল নিয়ে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হল বিচিত্র সদ্‌গুণের একটি অখণ্ড যৌগিক রূপ, তাকে আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ নির্যাসও বলতে পারি। সংসারে বেঁচে থাকাটা যে নিরর্থক নয়, পক্ষান্তরে জীবন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও আনন্দময়—এই বোধ সংস্কৃতি থেকেই মানুষ লাভ করে। সংস্কৃতিকে ঠিক চোখে দেখা যায় না, এমন কি তার সঠিক বর্ণনা দেওয়াও অসম্ভব, যদিও বিচিত্র কথার সাহায্যে তার রূপের একটা আভাস ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে এই মাত্র। তবে এটুকু অন্ততঃ বলা যায় যে, সৎ মানুষের বাক্য, আচরণ এবং কর্মের মধ্য দিয়ে যে আলো ঠিকরে পড়ে সেটি সংস্কৃতির আলো ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের জীবন সত্যকার আলোময় হয় একমাত্র সংস্কৃতির দীপ্তিতেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা'য় অমিতের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, কমল হীরের পাথরটাকে বলে শিক্ষা, তার থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার। সংস্কৃতির এর চাইতে সুন্দর সংজ্ঞা আর হতে পারে না। সংস্কৃতির এই মানদণ্ডটি মনে রাখলে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বোঝার কাজ সহজতর হবে।

ভারতবর্ষকে অত্যন্ত পরমতসহিষ্ণু দেশ বলা হয়। এই পরমতসহিষ্ণুতার অর্থ কী?—সাংস্কৃতিক ঔদার্য বই অন্য কিছু নয়। এই ঔদার্য অমনিতে অধিগম্য হয় না, তার জন্য সাধনা করতে হয়, এবং সে সাধনাও আবার ব্যক্তিগত স্তরের সাধনা নয়, জাতিগত সাধনা। একটা গোটা জাতির মানুষ যদি স্থায়ী ভাবে ঔদার্যের অনুশীলন না করে তাহলে সে গুণ তার স্বভাবগত

হয় না। সুখের বিষয়, দীর্ঘকালীন অনুশীলনের ফলে ভারতবাসীর ভিতর এ গুণ স্বভাবগত হয়ে গিয়েছে। অতীত পর্ব থেকে আধুনিক পর্ব পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের সুদীর্ঘ পাঁচ হাজার বৎসর কি তারও বেশীকাল ভারতবাসীর ভিতর নানা সাময়িক ও লৌকিক বৈচিত্র্যভেদে এ গুণের বিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই গুণের জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সুমহতী সমৃদ্ধি। ঔদার্যের সাধনা আসলে সমন্বয়ের সাধনা, আর যেখানেই সমন্বয় সেখানেই ঐশ্বর্যের ব্যাপ্তি। কি ধর্মে কি শিল্পভাস্কর্য-স্থাপত্যে, কি জাতি-সমবায়ের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যত বেশী সমন্বয়ের সাধনা করেছে তত বেশী তার সংস্কৃতি বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, ভারতবর্ষ তার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েই এ বৈচিত্র্যের সাধনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বিভেদের মধ্যে ঐক্য বলেছেন, সেই ঐক্যচেতনা ভারতীয় সাধনার মর্মমূল থেকে কোন সময়ে বিচ্যুত হয় নি। ভারত নানা সূত্র থেকে নানা উপাদান গ্রহণ করেছে, তার দ্বারা তার স্বকীয়তার হানি হয় নি। ভারতীয় সংস্কৃতির যে বিশিষ্ট ধবন বিশিষ্ট গড়ন, তা সমস্ত পরিবর্তন বিপ্লব উপপ্লব সত্ত্বেও অক্ষুণ্ন থেকেছে। এইখানেই ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, আর এইখানেই তার সংস্কৃতির উৎকর্ষ।

একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য মূলতঃ পরমতসহিষ্ণুতারই দান। পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শকে আমরা অনেক সময় অসহিষ্ণু হয়ে দুর্বলতা আখ্যা দিই। এবং একই যুক্তি অনুসরণ করে, অন্য সবকিছু হিসাব বাদ দিয়ে নিজের সঙ্কীর্ণ বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ধরে থাকাটাকেই আত্মরক্ষার উপায় বলে মনে করি। যেন অপরের সামান্যতম সংস্পর্শেই আমাদের জাত যাবার দাখিল। বলা বাহুল্য, এ পথ আত্মরক্ষার পথ নয়, আত্ম-অবলুপ্তির পথ। এ উপায়ে ক্ষুদ্র অর্থে আত্মরক্ষা হয়তো হয়, কিন্তু তার মধ্যে সজীবতার কোন লক্ষণ থাকে না। না থাকে সে আত্ম-রক্ষায় কোন গৌরব। অন্যনিরপেক্ষ অত্যুগ্র স্বাজাতিকতাবাদ ওই উগ্রতার পথ ধরে ধীরে ধীরে জাতিকে বিনাশের অভিমুখে ঠেলে দেয়।

ভরসার কথা, ভারত এই ছুৎমার্গী সঙ্কীর্ণতার পথ কখনও গ্রহণ করে নি। আর তাইতেই সে বেঁচে গেছে। দীর্ঘ পাঁচ হাজার বৎসরের ব্যবধানে অন্ধকার দিনেও যে সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে, এই আশ্চর্য সংঘটনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব, ভারতীয় মানসের অদ্ভুত একপ্রকারের স্থিতিস্থাপকত্ব গুণের জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে। পরপ্রভাব আত্মস্থকরণের ক্ষমতা আমাদের অসীম, কিন্তু তাই বলে এই ক্ষমতার প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা স্বকীয়তা বিসর্জন দিই নি। বরং ওই পথে আমাদের স্বকীয়তা আরও বেশী অক্ষুণ্ণ থেকেছে। বৈচিত্র্য-নীতিকে যত বেশী আমরা মেনে নিয়েছি তত বেশী ফলপ্রদ ভাবে আমরা আমাদের সভ্যতার অন্তর্বর্তী ঐক্যসূত্রটিকে খুঁজে পেয়েছি। ভারতবর্ষের সনাতন তপস্যা হল 'একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া একটি বিরাট হিয়া জাগিয়ে তোলার' সাধনা। এটি যে কথার কথা নয় বরং গভীর উপলব্ধিপ্রসূত আর্ষ-উক্তি, ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সে কথা বোঝা যাবে।

আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে দ্রাবিড়দের আধিপত্য ছিল, মহেন্‌জো-দড়ো ও হারাপ্পার অতীত কঙ্কাল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। দ্রাবিড়দের সভ্যতা আর্যপ্রতিষ্ঠিত বৈদিক সভ্যতা থেকে অনুন্নত তো ছিলই না, বরং কোন কোন দিক দিয়ে উন্নত ছিল। আজকের ভাবাদর্শের মাপকাঠিতে এই দুই সভ্যতার তুলামূল্য নির্ধারণ করতে হলে এদের সমস্তরের সভ্যতা বলাই যুক্তিযুক্ত। সমস্তরের, কেন না আর্যদের যদি ছিল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের মহিমা, প্রাক্‌-আর্য দ্রাবিড়দের ছিল ঐহিক শক্তির গৌরব। কিন্তু এদের মধ্যে তুলনা বড় কথা নয়, এদের সমন্বয়টাই হল আসল। আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণের ফলে তৎকালীন ভারতীয় সমাজদেহ যে আকার পরিগ্রহ করল তার মধ্যে আর্য-অনার্য উপাদান দুই-ই অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশে আছে। প্রক্রিয়াটি যৌগিক, অনেকটা দুই মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে তাদের গুণগত রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মত। এর ভিতর নিছক

আর্যত্বও নেই, নিছক অনার্যত্বও নেই, পরন্তু দুইয়ের সমবায়ে এক সমৃদ্ধতর জীবনভঙ্গির উদ্ভবের প্রতিশ্রুতি আছে। অনার্যরা যেমন দৃষ্টান্তপ্রভাবে আর্যদের বহু গুণ আত্মসাৎ করেছে, তেমনি আর্যরাও অনার্যদের বহু বৈশিষ্ট্য স্বকীয় জীবনধারার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসের অগ্রগতির পক্ষে এই মিশ্রণের ফল হয়েছে অতিশয় শুভ। এর দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি বহুগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন ঐহিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিবিড় আধ্যাত্মিক চেতনা যুক্ত হয়ে ভারতীয় মানসের দৃষ্টিগ্রাহ্য গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। ভোগ ও ত্যাগ এক আধারে মিশে 'ভুক্তি-মুক্তি'রূপ সুন্দর যুগ্ম আদর্শের বিকাশ ঘটেছে। অনার্যোচিত গুণের দ্বারা আর্যদের অপূর্ণতার শোধন হয়েছে, পক্ষান্তরে আর্যদের বহু গুণ স্বীয়কৃত করে নিয়ে অনার্যরা সুষ্ঠুতর জীবনযাপনের প্রণালী উদ্ভাবন করে নিয়েছে। দুই জাতিই এতে বেঁচে গেছে। অনার্য সভ্যতার বিলুপ্তির সমাধিভূমির উপর যদি আর্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হত, তা হলে ভারতীয় সংস্কৃতির এত সমৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব সম্পাদিত হত কি না সন্দেহ।

তারপর হিন্দু এবং বৌদ্ধ প্রভাবের সংঘর্ষ। এখানেও সেই একই সমন্বয়ের লীলা প্রকট দেখতে পাই। একদিকে জীবনবাদ; অন্যদিকে জীবন-অস্বীকৃতি। একদিকে ধর্মাচরণের পথে আত্মোপলব্ধির সাধনা; অন্যদিকে শীলাচারের একান্ত পবিত্রতার দ্বারা মোক্ষপ্রয়াস। একটিতে আধ্যাত্মিকতা; অন্যটিতে নৈতিকতা। একটিতে চতুরাশ্রমকেন্দ্রিক জীবন-যাপনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা; অন্যটিতে কেবলমাত্র সন্ন্যাস-আশ্রমের জয় ঘোষণা। ভারত-ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন, এই দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বহু গুণে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষতঃ, শিল্প-সাহিত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই সমন্বয় যে কত শুভফলের কারক হয়েছে তা বলে বোঝানো যায় না। পরবর্তী কালের মানুষের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতেও এই সমন্বয়ের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। আজকের দিনের ভারতবাসীর মানসিক গঠন বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখতে পাব, তার মধ্যে হিন্দু

জীবনদর্শন-সুলভ অস্তিবাদ এবং বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রভাব একত্র মিশে আছে।

বৌদ্ধযুগের বিলয়ের পর হিন্দুত্বের পুনরভ্যুত্থান। ভারত-ইতিহাসের এই অধ্যায়টি যদিও নানা গৌরবের চিহ্নবহনকারী, তবু এ কথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে, এই অধ্যায়েই সমন্বয় সব চাইতে কম হয়েছে। এর ফল ভারত-ইতিহাসের পক্ষে ভাল হয়েছে এমন কথা বলতে পারি না। এক ধরনের উগ্র স্বাজাতিকতাবোধের সঙ্গে পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা এবং সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব মিলে এই যুগটিকে অন্যান্য যুগের তুলনায়, মানসিক দিক দিয়ে অন্ততঃ, অধোগামী করে রেখেছে। সত্য বটে এই কালে মহাকবি কালিদাস এবং অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃত কবিদের উদ্ভব এবং হিন্দু শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশও যে এই কালেই ঘটেছিল তাও ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু মনে হয় এই সব লাভের পিঠে একটা মস্ত বড় ক্ষতির অঙ্কও ছিল। এই কালে ভারতবাসী ভোগসুখের আদর্শের প্রতি বড় বেশী স্পৃহা-পরায়ণ হয়ে উঠেছিল। রাজভবনকে কেন্দ্র করে বিলাসব্যসন এবং সাধারণ জীবনের স্তরে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত নেমে এসে ক্রমেই ভারতীয় সংস্কৃতির গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিকটিকে নিম্নাভিমুখী করে তুলেছিল। এই কালীন মানুষের মানসিক গঠনের ভিতর আধ্যাত্মিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিলে যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনেক কিছু বাদ পড়ে যায় এটি যদি বুঝি, তা হলে সমালোচ্য কালের অপূর্ণতা ও বিচ্যুতির কতকটা ধারণা করতে পারব।

একদিকে বৌদ্ধধর্মের বিকার, অন্যদিকে পুনর্জাগ্রত হিন্দুত্বের উগ্র অভিমান—এই দুই মত্ততা ভারত-ইতিহাসে কিছুকাল পাশাপাশি চলেছিল। তারই অবসানে—এবং কতকটা তারই কারণে—ভারতে মুস্লিম আধিপত্যের সূচনা। মুসলমানদের শাসন ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্তরে বহু অনর্থের সৃষ্টি করেছিল এবং সে অনর্থের জের আমরা আজও টানছি। কিন্তু এই নিদারুণ দুঃখময় অভিজ্ঞতা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, সংস্কৃতির স্তরে অন্ততঃ হিন্দু-মুসলমানের মিলন বহু শুভ ফলের কারক হয়েছে।

ভারতবর্ষে সহজিয়া ধর্মের বিকাশ হিন্দু-মুস্লিম ধর্ম-সমন্বয়ের ফলেই মুখ্যতঃ সম্ভব হয়েছে। পারসিক স্থফিবাদের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাধকদের দৃষ্টিভঙ্গির যে ঐক্য লক্ষ করা যায় সে ঐক্য মুসলমান প্রভাব ব্যতিরেকে সম্ভব হত কি না সন্দেহ। মুসলমান ফকির-দরবেশদের আচরিত ধর্মমতের সঙ্গে সহজিয়াপন্থী হিন্দু আউল-বাউলদের জীবনভঙ্গির বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রমাণ হয়, এই আশ্চর্য সংঘটনের পিছনে দুই ধর্মের পারস্পরিক মিলনের পোষকতা আছে। নানক, কবীর, দাদু, স্থরদাস প্রমুখ মধ্যযুগীয় সাধকদের প্রচারিত সমন্বয়ের বাণী ভারতবর্ষের তৎকালীন দুই প্রধান ধর্মের পারস্পরিক সহনশীলতাই শুধু স্থচনা করে। অন্যদিকে মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের আবেগময় প্রেমধর্ম ও দুকূলপ্লাবী ভক্তিবাদ সর্বপ্রকার ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের প্রতিষেধক রূপে বাংলার মাটিতে জোয়ারের মত নেমে এসেছিল। তৎকালীন বাংলা দেশের প্রবহমান আবহাওয়ার ভিতর শ্রেষ্ঠ সহনশীলতার আদর্শ বর্তমান না থাকলে প্রেমধর্মের এমন সর্বব্যাপী বিস্তার সাধিত হতে পারত কিনা সন্দেহ।

এ তো গেল সংস্কৃতির এক দিক। সংস্কৃতির অন্যান্য স্তরেও হিন্দু-মুস্লিম সমন্বয়-সাধনা স্থফলপ্রস্থ হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লোকসাহিত্য ও লোকগাথার বিকাশের উল্লেখ করা যায়। মুসলমান আমলে বাংলা দেশের লোকগাথা, লোকগীতিজাতীয় রচনা এবং সর্বপ্রকার লোকশিল্পের প্রসার বলতে গেলে উল্লিখিত সাংস্কৃতিক সমন্বয়েরই ফল। আর শুধু লোকসাহিত্য লোকশিল্পের কথাই বা কেন, তৎকালীন গোটা বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও পরিপুষ্টি এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আবহাওয়ার মধ্যেই নিষ্পন্ন হয়েছে বলা চলে।

অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক হিন্দু-মুসলমানের এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের তত্ত্ব স্বীকার করেন না। উদাহরণতঃ আমরা স্থপরিচিত ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের নামোল্লেখ করতে পারি। কিছুকাল আগে জয়পুরে নিখিল-ভারত সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দান করেন তাতে তাঁর ওই নঞর্থক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলনের তত্ত্বকে মহলবিশেষের

স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত ভ্রান্ত মতবাদ আখ্যা দিয়েছেন। এই স্থলে শ্রীযুত্ মজুমদারের উক্তির সত্যাসত্য সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার অবকাশ অল্প। যোগ্য ব্যক্তিরা সাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই বিতর্কের সূত্রপাত করেছেন এবং শ্রীমজুমদার তাঁদের প্রত্যুত্তর দেবারও চেষ্টা করেছেন। হয়তো ভবিষ্যতেও এই নিয়ে আরও বিতর্ক হবে। আমি শুধু এইখানে ডঃ মজুমদারের মতের বিপরীত মত-সম্বলিত একটি মূল্যবান পুস্তিকার উল্লেখ করতে পারি। পুস্তিকাটির রচয়িতা অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। কয়েক বৎসর আগে অধ্যাপক কবীর বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কীর্তি-মন্দির বক্তৃতা'রূপে হিন্দু-মুস্লিম সাংস্কৃতিক মিলনের উপর একটি সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। আলোচ্য পুস্তিকা সেই ভাষণের সংকলন। এতে তিনি বিচিত্র ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস করেছেন। তাঁর সে প্রয়াস সফল হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

এর পর ইংরেজ শাসনের যুগ। এই যুগের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ইতিবৃত্ত এতই সুবিদিত এবং আমাদের আপন কালের এতই সন্নিকট যে, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক বিবেচনা করি। আমাদের বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, এ সমন্বয় ভাবের রাজ্যে যতটা সাধিত হয়েছে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে তার একাংশও হয় নি। সামাজিক জীবনে বরাবর ইংরেজের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান দুরতিক্রম্য থেকে গেছে। ভারতভূমির উপর রাষ্ট্রিক আধিপত্য স্থাপনকারী অন্যান্য বিদেশী জাতি যেরূপ অবলীলাক্রমে ভারতের সমাজদেহে মিশে গিয়েছে, ইংরেজ তেমন ভাবে আমাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে পারে নি। সে তার স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান নিয়ে দূরে সরে থেকে দুশো বছর ভারতবাসীর অনাত্মীয়তাই শুধু অর্জন করেছে। তবু এ কথা স্বীকার করব, ইংরেজী সাহিত্য ও ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে আমাদের মানসজীবনের যোগাযোগ, কিছু কিছু ব্যতিক্রম-নিদর্শন বাদ দিলে, বহু কল্যাণের আকর হয়েছে। জাতির

মানসজীবনের পরিধির সম্প্রসারণে যে ক্ষতি হয় না বরং লাভ বহুবিধ, উক্ত যোগাযোগ তা প্রমাণ করেছে।

পরিশেষে পুনরায় বলব, সমন্বয়-সাধনাই হল আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সাধনা। এতেই এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, এতেই এর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা ও দীর্ঘায়ুর রহস্যও নিহিত এই পরিচয়ের মধ্যে। সমন্বয়, ঔদার্য, পরমতসহিষ্ণুতা ভারতবাসীর সহজাত; এ সকল আদর্শ থেকে ভ্রষ্টতা স্বধর্মচ্যুতিরই নামান্তর। কাজেই আর কোন কারণে যদি না-ও হয়, নিছক আত্মরক্ষা এবং স্বভাবের স্ফূর্তির জন্যই এই ত্রিবিধ বৃত্তির অনুশীলন আমাদের করণীয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ সর্বধর্ম সর্বমত সর্বমানবের মিলনতীর্থ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। এ ধ্যানদৃষ্টি অকারণ নয়। কবি ভারতের হৃদয়ের কেন্দ্রমধ্যে সমন্বয়ের আদর্শটিকে জয়যুক্ত দেখতে পেয়েছেন আর তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন—

“হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।”

জাতীয় সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

বাংলা দেশের অধিবাসী আমরা ২৫শে বৈশাখ তারিখে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র-জন্মতিথির অনুষ্ঠান করে থাকি। যে মহাপুরুষকে আমরা আমাদের আত্মার আত্মীয় বলে মনে করি, যে মহাপুরুষের দ্বারা ঘরে বাইরে আমাদের গৌরব বহুগুণিত হয়েছে, একটি বিশেষ দিনকে উপলক্ষ্য করে তাঁর পুণ্য নাম স্মরণ আমাদের অবশ্যকরণীয় কাজ; কিন্তু সেই অনুষ্ঠান যেন সাম্বৎসরিক একটি আচার মাত্রে পর্যবসিত না হয় সেটি দেখা দরকার। নতুন বছর ঘুরে ঘুরে আসবে আর নতুন বছরের সূচনাকালীন একটি নির্ধারিত দিনে কবিকে আমরা স্মরণ করব এ জিনিস বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু কবিকে আমাদের মধ্যে ধরে রাখবার এইটে সর্বাধিক ফলপ্রদ উপায় নয়, এমন কি অন্যতম ফলপ্রদ উপায়ও বুঝি নয়। একটি উৎসব-দিনে মানুষকে স্মরণ করে তার পর যদি গোটা বছর তাঁকে ভুলে থাকি, তা হলে সেই আনুষ্ঠানিক স্মৃতিচারণের বিশেষ অর্থ হয় না। আমাদের দেশের অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক উৎসবের পরিণাম এই জাতীয় বিস্মৃতিকেই বরণ করে কি না তা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের বেলায় এই আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন আরও বেশী। কেন সেটা বলি।

বাংলা দেশ আজ নানা দুর্যোগ দ্বারা আচ্ছন্ন। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় যে দুর্যোগ, সে হল সাংস্কৃতিক দুর্যোগ। বাঙালীর জীবনে সংস্কৃতির অবক্ষয় এমন মর্মান্তিক হয়ে বোধ হয় আর কখনও দেখা দেয় নি। সংস্কৃতির অবক্ষয় বলতে শুধু মাত্র শিল্প-সাহিত্যের মানের অপকর্ষই বোঝায় না, আচার আচরণ রুচি বিশ্বাস চিন্তা ও কর্ম নিয়ে আমাদের গোটা যে জীবনযাত্রা, তার নিম্নগামিতাও বোঝায়। বাঙালীর আজকের দিনের জীবনযাত্রার দিকে তাকালে এই অপকর্ষ অচিরেই ধরা পড়বে। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক নানা রকম বিপর্যয়ের ফলে আমাদের রুচি বিকৃত, আদর্শবাদ ধূল্যবলুন্ঠিত। ধনকৌলীন্য সকল

কৌলীন্যের উপর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সর্বপ্রকার গর্হিত আচরণের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধিটাই একটা মস্ত বড় শঙ্কার কথা ; সেই শঙ্কা তো আছেই, তার চাইতেও যা ভয়ের কথা, গর্হিত আচরণ সম্পর্কে আচরণকারীর মনে কুণ্ঠাবোধ প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। মহৎ মূল্যবোধগুলির প্রতি আমাদের আস্থা কত দুর্বল আর স্তিমিত হয়ে গেছে তা এই সর্বব্যাপী বিবেকচেতনার অসাড়তা চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

এই নিরতিশয় হতাশ্বাস অবস্থা থেকে যিনি আমাদের উর্ধ্বে টেনে তুলতে পারেন তিনি—রবীন্দ্রনাথ। অন্য সময়ে, অন্য অবস্থাধীনে, অন্য কোন মহাপুরুষের আদর্শানুসরণের প্রয়োজন আমাদের পক্ষে হয়তো এমনি একান্ত হয়েই দেখা দিত, কিন্তু আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথকেই প্রয়োজন আমাদের সব চাইতে বেশী। জাতির মন যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অচেতন হবার উপক্রম হয় তখন মনোরাজ্যের যিনি অধীশ্বর, মনের উপর যাঁর ক্রিয়া বিশল্যকরণীসদৃশ হিতকর, তাঁকে স্মরণ করাই পন্থা। আমাদের দেশে বহু প্রথম শ্রেণীর ধর্মনায়ক ও কর্মনায়কের অভ্যুদয় হয়েছে। তাঁরা আমাদের নমস্য। তাঁদের আদর্শ-প্রভাবে সমাজ বহুভাবে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু আজকে যেটা সমাজের পক্ষে মূল প্রয়োজন তা ধর্মের (আনুষ্ঠানিক অর্থে) পুনরুজ্জীবন নয়, এমন কি কর্মচেতনার উদ্বোধনও নয়। প্রয়োজন সব চাইতে বেশী সৌন্দর্যানুভূতির উন্মেষের। আর সেই সৌন্দর্যানুভূতির জন্যই কবিশ্রেষ্ঠকে আমাদের জীবনে একান্তভাবে বরণ করে লওয়া প্রয়োজন। সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে মনের প্রকর্ষ, রুচির পরিশীলন, বিনয়, নম্রতা, বিদ্যানুরাগ, মার্জিত আচরণ এসব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ সবের আজ যত প্রয়োজন এমন বোধ করি আর কোন কিছুরই নয়। সত্যকার ধর্মবোধের জাগরণের মধ্যেও বিদ্যা, বিনয় আর শীলের পুনরুজ্জীবন-সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু নানা কারণে ধর্মের সাহায্য নিতে আজ ভয় করে। ইতিহাসের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অতি সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত ধর্মও শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের বিভেদের কারণ সৃষ্টি করে। বিভেদের ফলে অসহিষ্ণুতা ;

অসহিষ্ণুতার ফল ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। ধর্মরূপ সুবৃক্ষের এই দুই বিষময় ফল কি পরিমাণ অনর্থের কারক হতে পারে সেই নজীরের জন্য দূরে যাবার প্রয়োজন নেই; সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসই তার প্রকৃষ্ট সাক্ষী।

জাতি হিসাবে বাঙালীর ভিতর কর্মচেতনা আশানুরূপ প্রবল নয়। এটিকে বাঙালী চরিত্রের অন্যতম ত্রুটি জ্ঞান করা হয় এবং এই ত্রুটির জন্য ধিক্কার বর্ষিত হয়। আমাদের মধ্যে যাঁরা কর্মানুরাগী তাঁদের কথা হল, কর্মসাধনার মধ্যেই বাঙালী জাতির যথার্থ মুক্তির সঙ্কেত নিহিত; এতাবৎ অন্যান্য বহুতর পথে আমরা অভিযান করেছি, সে অভিযান আর নয়, এক্ষণে সজ্ঞানে কর্ম-সাধনার আদর্শকে অগ্রপ্রাধান্য দিতে হবে এবং সেই মূল প্রয়োজনের নিকট আর সব প্রয়োজন খাটো করতে হবে।

কথাটা শুনতে ভাল। তবে মুশকিল হয়েছে এই যে, এক-একটা জাতি বা জনসম্প্রদায়ের এক-একটা বিশেষ দিকে প্রবণতা কিংবা বিমুখতা থাকে। এই প্রবণতা বা বিমুখতার দ্বারাই সাধারণতঃ জাতীয় প্রতিভার বিচার করা হয়। বাঙালীর ভিতর কর্মোদ্যমের প্রেরণা কথঞ্চিৎ দুর্বল বটে, তবে তার জন্য আক্ষেপের কারণ দেখি না। বাঙালীর আপেক্ষিক কর্মোদ্যমহীনতার ওপিঠে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রয়েছে তার স্বভাবগত কল্পনাপ্রিয়তা ও চিন্তাপ্রবণতা। সাদা চোখে এ দুটি গুণের যথার্থ মূল্য নিরূপিত না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু একটা জাতির অগ্রগতির ইতিহাসে মানসিক বৃত্তির গুরুত্ব খুবই বেশী। বিশেষতঃ, শিল্প-সংস্কৃতির দ্বারাই মূলতঃ সভ্যতার পরিচয়, এ যাঁরা মনে করেন তাঁদের নিকট এই গুরুত্ব অবিসম্বাদী। ভাব আগে কর্ম পরে। এই কারণে তো বটেই, পক্ষান্তরে ভাবের স্বাভাবিক প্রাধান্যের জন্যও বটে, বাঙালী জাতি সভ্যতার মূল বস্তুটিকেই আত্মস্থ করেছে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী চরিত্রের সাংস্কৃতিক ধারার শ্রেষ্ঠ বাণীবাহক কাজেই বাঙালীর জাতীয় প্রতিভারও তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথকে বিস্মৃত হওয়া মানে আত্মবিস্মৃত হওয়া, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের চেতনা হারানো। সেই অমঙ্গলকর সম্ভাবনা সর্বসাধ্য উপায়ে প্রতিরুদ্ধ হোক।

অথচ ঠিক এই বিপদই আজ গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে। আমরা আমাদের স্বভাবগত সাধনার ঐতিহ্য ভুলতে বসেছি। আমাদের সাম্প্রতিক দুর্দশা এ জন্য নয় যে, আমরা কর্মিকতার ক্ষেত্রে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি নি; আমাদের দুর্দশা এ জন্য যে, আমরা আমাদের স্বভাবসুলভ মননশীলতা ও কল্পনাপ্রিয়তার সংস্কার থেকে ক্রমবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। অকিঞ্চিৎকর মূল্যবোধ আমাদের মহৎ মূল্যবোধগুলির স্থলাভিষিক্ত হয়ে আমাদের বিপথগামী করতে বসেছে। সমাজজীবন থেকে আজ রুচির শালীনতা, আচরণের শালীনতা, সদভিপ্রায় ও সততা, সম্ভ্রমবোধ প্রভৃতি বিশিষ্ট মানসিক সদ্‌গুণসমূহ অন্তর্হিত হবার উপক্রম। যে কারণের সমবায়েই এই অবস্থা ঘটুক না কেন এ অতি প্রত্যক্ষ যে, এই মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে চেতনার অসাড়তার ফলে বাঙালী সমাজের মূল ভিত্তি বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হয়েছে। এই চরম জাতীয় দুর্গতির দিনে যিনি আমাদের সার্থকভাবে রক্ষা করতে পাবেন তিনি কর্মবীর নন, রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক নেতা নন, ধর্মনায়ক নন, তিনি অবশ্যতঃই একজন সংস্কৃতিনায়ক। এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই যে আমাদের সর্বপ্রধান ভরসার স্থল তা বলে বোঝাবার প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথ যদিও মূলতঃ কবি, তিনি কবিমাত্র ছিলেন না। তাঁর প্রতিভার যে আশ্চর্য সচলতা ছিল সেই সচলতার দ্বারা তিনি সংস্কৃতির প্রায় সকল বিভাগকে বেষ্টন করেছিলেন। সংস্কৃতির যিনি পুরোধাঃ, জাতীয় প্রতিভার যিনি মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ, তাঁর পক্ষে এই সব্যসাচিত্বই একমাত্র উপযুক্ত ভূমিকা এবং সেইটেই তাঁর কাছ থেকে একমাত্র প্রত্যাশিত ভূমিকা। যাঁরা শিল্প-সাহিত্যের এক একটি খণ্ড বিভাগ নিয়ে আছেন তাঁরা সংস্কৃতির পূজারী, কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে অশেষ কৃতী হওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিত্ব কখনও তাঁদের অধিগম্য নয়, যে ব্যক্তিত্ব, একমাত্র সব্যসাচী-শিল্পীর দ্বারাই আয়ত্ত হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এই সব্যসাচীদের মধ্যে ছিলেন প্রধান পুরুষ। তিনি শুধু সংস্কৃতির পূজারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সংস্কৃতির চালক। বাংলার

সংস্কৃতি তাঁর নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। একদিকে কবির মধ্যে ছিল সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য, অন্য দিকে সৃষ্টির অপরিমেয় প্রাচুর্য। প্রাচুর্য বস্তুটি কারও কারও মতে কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে অধর্তব্য। মোটেই তা নয়। সৃষ্টির প্রাচুর্য সৃষ্টির গভীর আকৃতির একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যে মন ভাবসমৃদ্ধ তার বহিঃপ্রকাশ প্রাচুর্যলক্ষণ দ্বারা মণ্ডিত হতে বাধ্য। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জীবনে অনেকানেক কবিতা লিখেছেন যা কালের বিচারে অগ্রাহ্য, কিন্তু তিনি যে একাধিক ভাল কবিতার সঙ্গে ওই অকিঞ্চিৎকর কবিতাগুলিও লিখেছিলেন তাতেই প্রমাণ হয় যে, তাঁর সৃষ্টিশীল মন প্রকাশচাঞ্চল্যের দ্বারা নিরন্তর পূর্ণ ছিল। সে চাঞ্চল্য নিত্য-নূতন কবিতার আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে। বনস্পতির চতুর্দিক বেষ্টন করে তৃণশষ্পের প্রাচুর্য বনস্পতিরই ভূমিকা।

কবির কাব্যসত্তা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব তার ভিতর দুটি মূল ভাব পাশাপাশি বিধৃত ছিল।—ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, অন্য পক্ষে নিত্য নব নব বৈচিত্র্যপ্রয়াস। বৈচিত্র্যের প্রতি এই একান্ত উন্মুখতা কবির দৃষ্টিকে সত্যকার ঔদার্য আর আধুনিকতার লক্ষণ দ্বারা মণ্ডিত করেছে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর অসীম, কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তাঁকে কখনও বর্তমানের প্রতি পরান্মুখ করে নি। যে মন দিয়ে তিনি ভারতের অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্প-সংস্কারকে ভালবেসেছেন সেই একই মন দিয়ে তিনি আন্তর্জাতিকতার আদর্শ আত্মস্থ করেছিলেন। উপনিষদের সুগভীর ভাবসমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ চিত্তকে তিনি প্রগতির সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। অতীতকে মান্য করতে গিয়ে তিনি অতীতবাদী হয়ে ওঠেন নি এটি তাঁর গভীর মানসিক সচলতারই ফল।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে প্রধানতঃ অধ্যাত্মবাদী কবি মনে করেন তাঁরা অধ্যাত্মবাদের প্রতিও সুবিচার করেন না, কবির প্রতিও সুবিচার করেন না। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ", "জীবনদেবতা" শীর্ষক কবিতা, 'গীতাঞ্জলি'র কিছু কবিতা ও গান, 'শান্তিনিকেতন' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ভাষণ ও রচনা,

'Personality,' 'Sadhana,' 'Religion of Man' প্রভৃতি পাঠান্তে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, কবির ভিতর অধ্যাত্মবাদী প্রেরণা সবচেয়ে বলবৎ ছিল এবং সেই প্রেরণাই তাঁর কবিজীবনকে মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু এ নিতান্ত ভাসা-ভাসা বিচার। কবির অধ্যাত্মবাদ তাঁর সমগ্র কবি-প্রকৃতির একটি খণ্ডাংশের প্রকাশ মাত্র; সেই খণ্ডকে অখণ্ডের মর্যাদা দিলে নিরতিশয় ভুল করা হবে। আসলে কবি ছিলেন অখণ্ড দৃষ্টি সমন্বিত এক বহুমুখী স্রষ্টা ('যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি'); আধ্যাত্মিকতা সেই সৃজনধর্মী সর্বাত্মক কবিত্বের ঠাসবুনন জমিতে একটি তন্তু বই নয়।

কবির কবিত্ব মানুষ ও প্রকৃতি এই দুই সীমার মধ্যে নিরন্তর আন্দোলিত হয়েছে। কখনও তিনি প্রকৃতির জয়গান করেছেন, কখনও মানুষের। প্রথম বয়সের কাব্যগ্রন্থগুলি মুখ্যতঃ প্রকৃতিপ্রেম সঞ্জাত; শেষ জীবনের কবিতা মুখ্যতঃ মানবভিত্তিক। তবে মূলতঃ তিনি প্রকৃতিরই কবি, কেন না তাঁর মানুষ প্রকৃতির কোলে সঞ্জাত মানুষ; প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন যে মানুষ, সে মানুষ রবীন্দ্র-কল্পনার বিষয়ীভূত হয়েছে সামান্যই। এইখানেই শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল পার্থক্য। শেক্‌স্‌পীয়রের অঙ্কিত চরিত্রগুলি জাগতিক অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিপূর্ণ; এক দিকে স্নেহ প্রেম দাক্ষিণ্য করুণা আদর্শপ্রীতি, অন্য দিকে শঠতা বঞ্চনা লোভ হিংসা স্বার্থসংঘর্ষ প্রভৃতি সংসারের বিচিত্র উপাদান মিলে সেই সব চরিত্রের দেহ ও মন তৈরী। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক শেক্‌স্‌পীয়রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংঘাতের আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথে মোটেই তা নয়। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথ নিছক সদ্‌বৃত্তির বেলায়ও কেবলমাত্র মৌলিক বৃত্তিগুলিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, সৌভ্রাত্র, পত্নীপ্রেম, বাল্যপ্রীতি, সখ্য প্রভৃতি মোটা মোটা চিত্তবৃত্তি—যেগুলি সভ্যতার আদি থেকে আজ পর্যন্ত মনুষ্যচরিত্রে সহজাত স্থায়ী ভাব রূপে বিদ্যমান এবং যেগুলি সকল দেশের ক্লাসিক্যাল সাহিত্যেরই প্রধান উপজীব্য বিষয়—এ সবই রবীন্দ্ররচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। একমাত্র শেষ বয়সের কিছু রচনা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর কোথাও জটিল বা মিশ্র অনুভূতিকে গুরুত্ব দেন নি। এই

বিচারে রবীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পীয়ারের তুলনায় কম আধুনিক। আধুনিক সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ হল জটিল অনুভূতির রূপায়ণ। নানা মিশ্র ভাবের সমবায়ে গঠিত জটিল মনের জট ছাড়ানো আধুনিক লেখকদের একটা বিশেষ কাজ। সেইদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের কবি হয়েও আধুনিকদের সগোত্র নন, ধ্রুপদী লেখকদের সঙ্গেই তাঁর সমধিক মনের মিল। ধ্রুপদী আদর্শ এখন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যিক রুচির নিয়ামক। ভারতীয় মানসিকতায় অদ্যাবধি মৌলিক বৃত্তিসমূহেরই প্রাধান্য। রবীন্দ্রচিত্রিত মৌলিক অনুভূতিসম্পন্ন স্বভাব-মানুষগুলিকে এই কারণেই আমাদের এত ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির উৎকর্ষের মূল উৎসও এইখানে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় **evil** বা অসুন্দরকে সযত্নে পরিহার করেছেন। এটাও তাঁর আপেক্ষিক অনাধুনিকতার অন্যতর প্রমাণ। কিন্তু ওই অপূর্ণতার মধ্যেই রয়েছে তাঁর সত্যকার উৎকর্ষের নিদর্শন। কবি তাঁর কাব্যে যে স্বভাব-মানুষের বন্দনাগান করেছেন সে মানুষ শান্ততায় স্থির, প্রীতিতে স্নিগ্ধ, বিশ্বাসে বলীয়ান, সারল্যে মধুর। বলা বাহুল্য শান্ততা, প্রীতি, বিশ্বাস, সারল্য এ সব হচ্ছে যথার্থ প্রগতিমূলক চিত্তবৃত্তি; আর সকল বৃত্তি এই বৃত্তিগুলির তুলনায় গৌণ। আজকের সংঘর্ষ-ক্ষুব্ধ অশান্ত পৃথিবীতে শান্ততা প্রীতি আর সহযোগের প্রয়োজন যত বেশী এমন আর কিছুরই নয়। সুতরাং যে কবির কাব্যে এই মৌলিক আদর্শগুলি সমুন্নত মহিমায় বিরাজমান তিনিই হলেন অদ্যকার মানদণ্ডে সত্যকার প্রগতিশীল কবি। প্রগতির মূল কথা প্রীতি প্রেম সহযোগ; সাহিত্যেরও তাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য মুখ্যতঃ এই প্রীতি প্রেমের সাহিত্য। তাঁর কবিতায় ভালবাসার বাণী প্রধান—প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, মানুষের প্রতি ভালবাসা, প্রকৃতি ও মানুষের অস্তিত্বের পরপারে যে পরম সত্তা বিদ্যমান তাঁর প্রতি ভালবাসা। কবিচিত্তের এই সর্বব্যাপী ভালবাসাই কবির রচনাবলীকে যথার্থ প্রগতিলক্ষণাক্রান্ত করেছে।

নিবন্ধের গোড়ায় যে সৌন্দর্যানুভূতির কথা বলা হয়েছে তা প্রেমানুভূতিরই একটা পরোক্ষ ফল। যে মন অপ্রেম দ্বারা আচ্ছন্ন সে মন সৌন্দর্যের ভোক্তা

হতে পারে না। সৌন্দর্যানুভূতির উপর জোর দেওয়া প্রকারান্তরে জীবনে ভালবাসার প্রয়োজনটাকেই চিহ্নিত করা। অদ্যকার বিপর্যস্ত বিক্ষিপ্ত দিনে এই দুটি জিনিসেরই একান্ত প্রয়োজন। আমাদের জীবন প্রীতিমণ্ডিত হোক সুন্দর হোক, এই আমাদের মনের কামনা। এই কামনার বাণী রবীন্দ্রসাহিত্যে সুন্দরতমরূপে অভিব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ মৌলিক অনুভূতির কবি না হয়ে যদি মিশ্র অনুভূতির কবি হতেন, তাঁর রচনায় সৌন্দর্য ও প্রেমের সন্নীতি এমন মহিমময় হয়ে উদ্ভাসিত হত কিনা। আধুনিক পর্যায়ের কবিরা মিশ্র অনুভূতির চিত্রণে যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁদের সে ঝোঁক ও কুশলতা বাস্তবরীতিসম্মতও বটে, কিন্তু বাস্তবের যথাযথ রূপায়ণটাই সাহিত্যের একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপনের দিন এসেছে। সাহিত্যের বাস্তব আর সংসারের বাস্তব সম্ভবতঃ এক জিনিস নয়। সাহিত্যে চিরকাল আদর্শবাদের স্থান ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। মানবমনের প্রগতিকামনাকে আদর্শবাদের পথেই সব চাইতে সুষ্ঠু রূপ দেওয়া সম্ভব। এইটে যদি বহুস্বীকৃত সাহিত্যাদর্শ হয়, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রগতিশীল কবি পৃথিবীতে খুব বেশী জন্মান নি।

সবশেষে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা দিয়ে বক্ষ্যমাণ আলোচনার ছেদ ঘটাচ্ছি। কবিতাটি তাঁর শেষ বয়সের রচনা। রচনার অন্তর্নিহিত উচ্চ আদর্শবাদী সুরটুকু অনুধাবন করবার মত। বিশেষতঃ অজস্র প্রশ্ন কণ্টকিত, সংশয় সন্দেহ দোলায়িত অনাত্মস্থ আধুনিক মনের কাছে কবিতাটির একটা বিশেষ আবেদন আছে। আধুনিকেরা কবিতাটির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করলে উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

“নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ

সব তুচ্ছতার উর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরই নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়॥”

জাতীয়তার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

।

দেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণা বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমুন্নত পরিবেশে বাংলা দেশে যখন নানাদিকে নব জাগরণের সূত্রপাত হল তখন বাঙালী আত্ম-উপলব্ধির একটি বড় উৎস খুঁজে পেল তার দেশপ্রেমে, জাতীয়তার চেতনায়। পূর্বে আমাদের সাহিত্যের মূল ঝোঁকটি ছিল ধর্মের ভিতর; বস্তুতঃ, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বাংলা সাহিত্য সর্বাংশে ধর্মানুভূতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল এ কথা বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না। কিন্তু ইংরেজ-অভ্যুদয়ের পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটল। এক কালে যেখানে ধর্ম আসর জাঁকিয়ে বসে ছিল, সেস্থলে এখন দেশপ্রীতি সাহিত্যের মূল ভাববিগ্রহরূপে জাতির হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল। বৈদেশিক শাসনের হীনতা ও গ্লানি বাঙালী জাতিকে এমন মর্মান্তিক পীড়নে আর কখনও পীড়িত করে নি। এই সুতীব্র মর্মপীড়ার নিরুদ্ধ বেদনা বাঙালীকে আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পথের সন্ধান দিল, আর এই আত্মানুসন্ধানের ফলেই জন্ম নিল জাতীয় চিত্তে সুগভীর দেশপ্রেম। সমগ্র বাংলাদেশ যেন একটা নূতন ভাবের জোয়ারে উন্মথিত ও প্লাবিত হল। সাহিত্যক্ষেত্রে দেশপ্রেমের নিত্য নূতন অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠল। শ্রীমধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ পর পর আবির্ভূত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কতিপয় সেবক সাহিত্যের মাধ্যমে দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিলেন। সমগ্র উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও বিশ শতকের প্রথম দু'তিন দশকের বাংলা সাহিত্য দেশ-প্রেমের উজ্জ্বল ছটায় ভাস্বর। বস্তুতঃ পূর্বাচার্যদের দেশহিতৈষণার এই ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যে এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে এবং তা বহু লেখকের প্রেরণার মূলে কাজ করে যাচ্ছে। দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদী চেতনার

প্রসাদে বাংলা সাহিত্য নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনায় দেশপ্রেমের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। বাস্তবিক, দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্যটিকে যদি দু'এক কথায় বোঝাতে হয় তা হলে তাঁর দেশপ্রেমের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করতে হয়। দেশপ্রেমমূলক ভাব ও আবেগ দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। কি ঐতিহাসিক নাটক, কি সমাজসমস্যা বিষয়ক নাটক, কি হাসির গান ও প্যারডি, কি আর্যগাথা—সর্বত্র দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা দেশপ্রেমের সুগন্ধে ভরপূর। পরাধীনতার নিদারুণ অপমান ও বেদনা তাঁকে অতি মর্মান্তিক ভাবে বেজেছিল। আর সেই সঙ্গে, সর্ববিধ জাতীয় অধোগতি ও অনাচারের দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে তাঁর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। তুচ্ছ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের লোভে আত্মবিক্রয়ের হীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, পরনির্ভরতা, কাপুরুষতা ও নিষ্ক্রিয়তা, বিজাতীয় রীতিনীতির মোহ প্রভৃতি রাষ্ট্র ও সমাজ-দেহের অযুত ক্ষতের উপর তিনি তাঁর অভ্রান্ত হস্ত রক্ষা করেছিলেন এবং বলাই বাহুল্য, এ সকল অধোগামী প্রবৃত্তির কবল থেকে দেশকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। যা-কিছু অন্যায়, হীন ও নীচ, তার উপর তাঁর রোষের খড়্গ নির্মমভাবে পতিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল শুধুমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টির নেশায় বিভোর কবি ছিলেন না—তিনি আরও কিছু ছিলেন। সৌন্দর্যসৃষ্টির পাশে পাশে তিনি জাতিকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস করোছলেন। কবিত্ব ও জাতিসংগঠন কুশলতা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বের ভিতর এক আধারে বিধৃত হয়েছিল। দেশপ্রেমকে রচনার মূল বিষয়ীভূত করে শিল্পসৃষ্টির দাবী পূরণ সহজ নয়; দ্বিজেন্দ্রলাল সে দাবী নিপুণভাবে পূরণ করেছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি।' বাঙালীর সকল অধোগতির মূলে রয়েছে তার এই আত্মবিস্মৃতি এবং সেই কারণে আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার সাধনাটাই তার সব-সেরা সাধনা হওয়া উচিত।

সাহিত্যের মাধ্যমে আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির, এই আত্মসম্বিৎ পুনরুদ্ধারের সাধনায় শক্তিশালী যে কজন সাহিত্যিক বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম। রাজপুত জাতির অতীত বীরত্বগাথার মধ্যে জাতীয় গৌরবের একটি বড় উপাদান নিহিত আছে। পরাধীন ভারতবাসীর মনে রাজপুত জাতির স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ক্ষাত্রতেজ, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ যদি কিছু পরিমাণেও সঞ্চারিত করা যায় তা হলে বৈদেশিক আধিপত্যের শৃঙ্খলপাশ মোচনের কাজ সহজতর হয়—এ কথা দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষভাবেই বুঝেছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি একক ছিলেন না। তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র তাঁদের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির উপাদান সংগ্রহে বিশেষ ভাবেই এ পথের অনুসরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী'র কবিতার মধ্য দিয়ে রাজপুত-মারাঠার গৌরবান্বিত বীরত্বের স্মৃতি বাঙালী পাঠকের চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব এখানে যে, এতকাল যা ছিল উপন্যাস ও কাব্যের পাতায় সীমাবদ্ধ, সে-প্রয়াসকে তিনি নাটকের পরিধির ভিতর টেনে আনলেন। দেখা দিল 'প্রতাপসিংহ', 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস', 'তারাবাঈ' প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক প্রসিদ্ধ নাটক। এ বাদে বিশুদ্ধ মুঘল ইতিহাসের পাতা থেকেও তিনি নাটকের বিষয় আহরণ করেছেন। যেমন 'সাজাহান', 'নুরজাহান'। পৌরাণিক নাট্য রচনার উদাহরণ—'ভীষ্ম', 'সীতা' ও 'পাষাণী'। দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি প্রসিদ্ধ নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'। কিন্তু যে উপাদানের সাহায্যে যে-জাতীয় নাটকই তিনি লিখুন না কেন, দেশপ্রেম তাদের ভিতর একটি মূল আদর্শরূপে বিরাজমান। জাতীয় শৌর্য-বীর্যের আদর্শকে তিনি তাঁর অধিকাংশ নাটকে বড় করে তুলে ধরেছেন।

তাই বলে তিনি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার পরিপোষক ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতীয়তা ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ সমন্বিত হয়েছিল। একদিকে তেজ, সাহস ও শক্তির তিনি পূজারী ছিলেন, অন্যদিকে প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলির মহিমা তিনি

উচ্চ নাদে কীর্তন করেছেন। 'মেবার পতন' নাটকে রাণা অমরসিংহের কন্যা মানসীর চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এই মহীয়সী নারী-চরিত্রের মুখে নাট্যকার যে সকল গভীর ভাবোদ্দীপক কথার অবতারণা করেছেন তা দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চ আদর্শবাদী মনটিকে সুচিহ্নিত করেছে। মোটকথা, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের ভিতর কোন খাদ ছিল না। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শের মধ্যে যে ধরনের একদেশদর্শিতা ও উগ্রতা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের মন ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। যদিও তিনি মুখ্যতঃ হিন্দুর অতীত গৌরব নিয়ে নাটক রচনা করেছেন, তা বলে তাঁর রচনায় অহিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি মুসলমান চরিত্রকে যথেষ্ট মহত্ত্ব দান করেছেন। যেমন 'দুর্গাদাস' নাটকের দিলীর খাঁ চরিত্র, কাসেম চরিত্র; 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান, দারা, সোলেমান, জাহানারা চরিত্র; 'মেবার পতন' নাটকে আংশিক ভাবে মহাবৎ খাঁর চরিত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমের ভিতর যে সমদর্শিতার অভাব ছিল না এ সব দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যায়।

এবার কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালকে বুঝতে চেষ্টা করব।

'দুর্গাদাস' নাটকে ঔরংজীবের চক্রান্তে নিহত মাড়বার-অধিপতি যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী মহারাণী মহামায়া সম্ভাবিত মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে যে ভাষায় ও যে ভাবাবেগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন তা উচ্চ দেশপ্রেমের স্মারক। "শোন গ্রামবাসিগণ, সম্রাট (ঔরংজীব) লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মাড়বার আক্রমণ করতে আসছেন। তোমরা মাড়বারের সন্তান; তোমরা রাজপুত; তোমরা বীর। তোমরা কি নিশ্চিন্ত ভাবে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমি পরপদদলিত, নিষ্পেষিত, বিধ্বস্ত হতে দেখবে? তোমাদের দূর করে দলিত করে মোগল এই তোমাদের স্বর্ণভূমি অধিকার করবে, তাই তোমরা নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দেখবে? হা ধিক! এত তরল

কোমল যে জল, তাকে স্থানচ্যুত করতে গেলে সেও বাধা দেয়। আর তোমরা নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে নিজের দেশকে অন্যের হাতে সঁপে দেবে?"

তার পরেই গ্রামবাসীদের পুরুষবিনিন্দিত বজ্রগম্ভীর স্বরে আহ্বান জানাচ্ছেন, "শুনবে যদি, তবে তোমাদের গ্রাম, কুটির ছেড়ে চলে এসো। তরবারি লও। ওঠো, এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। এবার দৃঢ়পণ করে ওঠো। ওঠো। যেমন তূরীশব্দে সিংহ জেগে ওঠে! ওঠো—ওঠো, যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে ওঠে; ওঠো—যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোল ওঠে। ওঠো! রাজস্থান জানুক, ঔরংজীব জানুক যে, তোমাদের শৌর্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।"

যাদের উদ্দেশে রাণী মহামায়া কম্বুকণ্ঠে এই আহ্বান জানাচ্ছেন তারা এতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, বিরাট মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মাড়বার বাহিনীর প্রতিরোধের যৌক্তিকতায় সংশয়াপন্ন ছিল, কিন্তু মহারাণীর এই তেজোদৃপ্ত ভাষণের পর তাদের আপত্তি শিথিল হল, তারা একবাক্যে জানাল যে, তারা মহারাণীর নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত। তখন মহারাণী বলছেন, "এই তো তোমাদের যোগ্য কথা! শোন—আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকছি না। যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাক—সে এস! সে একাই একশ'। ক্ষীণসঙ্কল্প, দ্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না। একাগ্র দৃঢ় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। দুই পথ আছে, বেছে নাও!—একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম আর উপভোগ; আর একদিকে শ্রম, অনাহার, দারিদ্র্য ও দুঃখ! একদিকে সংসার, গৃহ ও শান্তি; আর একদিকে সমরক্ষেত্র, ক্ষত ও মৃত্যু। একদিকে নিজের সুখ আর একদিকে দেশের প্রতি কর্তব্য—বেছে নাও।"

'মেবার পতন' নাটকে আর একটি গরীয়সী নারীর সাক্ষাৎ আমরা পাই যাঁর অন্তর একই রকম বলদৃপ্ত স্বদেশপ্রেমে ভরপূর—তিনি সগর সিংহের কন্যা

চারণী সত্যবতী। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর বিরাট বাহিনী নিয়ে মেবার আক্রমণ করতে উদ্যত; যুদ্ধের পর যুদ্ধে ক্ষয়িতশক্তি, হীনবল মেবার এই আক্রমণভীতি সম্মুখে নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। রাণা অমর সিংহ অযথা রক্তক্ষয়ে অনিচ্ছুক; তিনি তাঁর সোনার মেবারকে সুনিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য সামন্ত সর্দারদের নিষেধ সত্ত্বেও মোগলের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব মনের ভিতর নাড়াচাড়া করে দেখছেন, এমন সময় কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন চারণী সত্যবতী। তিনি দেশপ্রেমের অমিত উদ্দীপনায় রাণার চিত্ত ভরে তুললেন, দেখতে দেখতে রাণার দ্বিধাগ্রস্ত মন সঙ্কল্পের কঠিনতায় দুর্জয় হয়ে উঠল। সত্যবতী বললেন—"কিছু দুঃখ নেই রাণা। বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে, দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।" রাণা অমর সিংহের যুক্তি ছিল যে, "মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্ববিজয়ী দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ান অবিমিশ্র উন্মত্ততা", তার উত্তরে সত্যবতী বলছেন—"উন্মত্ততা রাণা? তাই যদি হয়—তবে এ উন্মত্ততার স্থান সব বিবেচনা বিচারের বহু উর্ধ্বে। নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণ-তলে লুটিয়ে পড়ে! স্বর্গ হতে একটি গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়।—উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হলে কেউ কোন কালে মহৎ কাজ করতে পেরেছে?"

রাণী মহামায়া বা চারণী সত্যবতীর মুখে এই যে-সব তেজোদৃপ্ত কথা আরোপিত হয়েছে, নাটকের প্রয়োজনে এগুলিকে চরিত্রোচিত কথার আকার দেওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু লেখকেরও যে এ-সব মনের কথা তা দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র নাট্য-সাহিত্য একটু অবধান করলেই ধরা পড়ে। দেশপ্রেমের আগুন মনের ভিতর পোরা না থাকলে কারও লেখনীমুখে এমন অনলবর্ষী বাক্যস্রোত উদগিরিত হতে পারে কি না সন্দেহ। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার ভিতর সর্বত্র একটা আদর্শবাদের সুর অন্তর্লীন দেখতে পাই। এই আদর্শবাদের বহু তন্ত্রী, তবে প্রধান তন্ত্রীটি দেশপ্রেমের। দেশপ্রেম একটি মৌলিক প্রেরণারূপে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে সতত বিদ্যমান। হয়তো এই দেশপ্রেমের ভিতর কিছু পরিমাণে

ভাবালুতা আছে, আছে বাচনের আতিশয্য বা বাহুল্য, তবু জিনিসটি যে অত্যন্ত খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। রাণী মহামায়ার কিংবা চারণী সত্যবতীর মুখের কথা প্রকারান্তরে দ্বিজেন্দ্রলালের মুখের কথা, এবং তা থেকেই বোঝা যাবে কী উচ্চ ও মহান্ ভাব দেশপ্রেমের আকারে নাট্যকারের লেখনীকে অনুপ্রাণিত করেছে। বর্ণিত চরিত্রের মুখের কথা আর লেখকের নিজের কথায় ঐক্য থাকা প্রায়ই সম্ভব নয়, কেন না প্রথমটির সৃষ্টি শিল্পের প্রয়োজনে, দ্বিতীয়ের উৎস লেখকের জীবনবোধ। জীবনবোধের সঙ্গে শিল্পাদর্শ মিলবে এমন কোন কথা নেই, বরং দেখা যায়, কখনও কখনও মেলে না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্যের এই একটি মহা সদ্‌গুণ দেখতে পাই যে, এখানে লেখকের জীবনবোধ আর নাটকাশ্রিত মূল ভাবের ভিতর বিরোধ ঘটে নি, পক্ষান্তরে দুটি ভাব এক মহান সামঞ্জস্যের ভিতর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলি প্রধানতঃ রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে, তা থেকে এমন ধারণা হতে পারে লেখকের কল্পনায় হিন্দু-ঘেঁষা জাতীয়তাবাদের আদর্শটিই সমধিক বলবৎ ছিল। মুসলমান শক্তির প্রতিরোধের নামে তিনি বুঝি 'হিন্দুয়ানিরই' জয়জয়কার কামনা করেছিলেন। মোটেই তা নয়, বরং উল্টো। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের একদেশদর্শিতা ও উগ্রতা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের মন ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। কবির দেশপ্রেমের ভিতর কোন খাদ ছিল না। ভারতবর্ষের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে আশ্রয় করেই তাঁর দেশপ্রেম বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল। এ কথার বড় প্রমাণ 'দুর্গাদাস' নাটকের দিলীর চরিত্র। দিল্লীশ্বর ঔরংজীবের প্রধান সেনাপতি দিলীর খাঁ চরিত্রটিকে তিনি যেভাবে অঙ্কন করেছেন তাতে লেখকের পরম ঔদার্য প্রকটিত হয়েছে। দিলীর খাঁর নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা, সত্যানুরাগ, বীরত্ব প্রকৃতই অনুকরণযোগ্য। এই চরিত্রটিতে অনেকগুলি সদ্‌গুণের আরোপ করে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, মহৎ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির দেখা সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়, ভালমন্দ সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই আছে, দেশপ্রেম কিছু হিন্দুর একচেটিয়া

নয়। ইতিহাসের দিলীর খাঁ চরিত্র নাটকে বর্ণিত চরিত্রের ঠিক অনুরূপ কি না বলতে পারব না, তবে এ কথা নিশ্চিত, দ্বিজেন্দ্রলাল এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সর্বজনসমক্ষে এমন একটি আদর্শ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন যার প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন অবান্তর, উচ্চ মনুষ্যত্বের নমুনা হিসাবেই যা গ্রহণীয় ও বিচারণীয়। দু'একটি সংলাপের টুকরো উদ্ধার করে দেখালেই এ মন্তব্যের যাথার্থ্য ধরা পড়বে বলে মনে করি।

"দিলীর।...কিন্তু সম্রাট, বাহুবলে কি ধর্মপ্রচার হয়? তরবারির অগ্রভাগে বিশ্বাস স্থাপিত হয়? পদাঘাতে রাজভক্তি তৈয়ের হয়? মহারাজাধিরাজ! এখনো বলি—ফিরুন। এখনো হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। হিন্দু মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মসজিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মার নাম নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামামা শঙ্খধ্বনি উঠুক। হিন্দু মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক দেখি সম্রাট! সেদিন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা' সংসারে কেহ কখন দেখে নাই।

ঔরংজীব। হিন্দু মুসলমান এক হবে, দিলীর খাঁ?

দিলীর। কেন হবে না সম্রাট? তারা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন করে, একই জল পান করে, একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আসছে। এখনো কি তাদের প্রাণ এক হয় নি? তারা একবার ধর্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, নতজানু হয়ে, করজোড়ে ভক্তিবাষ্প-গদগদ স্বরে এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে প্রাণ ভরে মা বলে ডাকুক দেখি, সম্রাট।

ঔরংজীব। দিলীর খাঁ! তুমি স্বপ্ন দেখছো।

দিলীর। আমায় মাফ করবেন জাঁহাপনা!—আমি স্বপ্নই দেখছিলাম বটে। কিন্তু বড় সুখের স্বপ্ন। ভেঙ্গে গেল।"

বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালেরও এই স্বপ্ন ছিল। তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ হিন্দুমুসলমানের আন্তরিক ঐক্যকে আশ্রয় করে রূপান্বিত হয়ে

উঠেছিল। কিন্তু ভারতের পরম দুর্ভাগ্য, পরবর্তী ইতিহাস এ স্বপ্নের সফলতা বিধান করতে পারে নি, সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ও হানাহানির ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে পড়ে ঘটনাবলী অন্য পথে বাঁক নিয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ এক ও অখণ্ড ভারত শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদীর স্বপ্নকল্পনাই থেকে গেল।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেমমূলক কোরাস গানগুলি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য যোজনা। এ সব গান এতই পরিচিত যে সংকলন করে আর এগুলির জনপ্রিয়তার অমর্যাদা ঘটাতে চাই নে। 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ', 'বঙ্গ আমার, জননি আমার, ধাত্রি আমার, আমার দেশ', 'ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র', 'আজি গো তোমার চরণে জননি! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান', 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়, যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর' ইত্যাদি কোরাস গান গুন গুন করেও অন্ততঃ গায় নি এমন সঙ্গীতামোদী বাঙালী খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সুপ্রসিদ্ধ। রঙ্গ ব্যঙ্গের আশ্রয়ে তিনি এই গানগুলিতে বাঙালীর ত্রুটীবিচ্যুতিসমূহের সমালোচনা করেছেন। দেশ-প্রেমের গভীরেই যে এই সমালোচনার উৎস নিহিত তা গানগুলির বাণী পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে। বাঙালীর অভ্যস্ত ত্রুটীবিচ্যুতি-গুলির মধ্যে তিনি বিজাতীয় মনোভাবকে গোড়ায় স্থাপন করেছেন। বিজাতীয় রীতিনীতি, বেশভূষা, বাগ্‌ভঙ্গি, চলনবলন—বিজাতীয়তার প্রত্যেকটি অভিব্যক্তিই লেখকের নির্মম বিদ্রূপের কষায় জর্জরিত হয়েছে। স্বয়ং বিলাতফেরত হওয়া সত্ত্বে তিনি বাঙালীর বিলাতিয়ানাকে বরদাস্ত করেন নি। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বিভিন্ন গানে (যথা, 'আমরা বিলেতফেরতা ক' ভাই,' 'চম্পটি চম্পটি চম্পটি চম্পটির দল আমরা সবে', 'নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো' ইত্যাদি) কিংবা অন্যান্য হাসির গানে তিনি এই নকল বিদেশিয়ানাকে ব্যঙ্গবাণে ছিন্নভিন্ন করেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, নিগূঢ় দেশপ্রেমই এই সকল বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের উৎস।

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা'র উল্লেখ করেছি। 'আর্যগাথা'য় অন্যান্য ভাবের কবিতার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাও অনেক আছে। এই সব স্বদেশ-স্তোত্রের ভাব যেমন গম্ভীর তেমনি আন্তরিকতাপূর্ণ। দুই একটি স্তোত্রাংশ তুলে দিলেই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হবে।

"কেন রে ভারতবাসী ঘুমঘোরে অচেতন !
দেখ আঁখি মেলি, গিয়াছে সকলি,
ভারতের বল কি আছে এখন।

ভারত গৌরব-সুখ-দিনমণি
ঢেকেছে গভীর আঁধার রজনী,
হবে কি প্রভাত সে দুঃখ-যামিনী
হইবে ভারত আবার তেমন।"

কিংবা, "আজ আয় আয় ভাই সব মিলে।
সাধিতে স্বদেশ-হিত আয়রে সকলে।
চিরদিন দুখে বসি কি হবে কাঁদিলে,
একা অসহায় ভাই মোরা ধরাতলে,
হয় কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হলে,
হয় কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে ;
আয় একবার সবে দ্বেষ হিংসা ভুলে,
আয় এই দুখনিশি দূরে যাবে চলে॥"

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

আমাদের মাতৃভাষা দুই দিক থেকে আজ গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন। রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগের দ্বারা বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব-পরিধি যেমন অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি বাংলা ভাষার অগ্রগতির পক্ষে প্রচণ্ড আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত উভয় বঙ্গে বাংলা ভাষা চালু রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে রকম বিধিবদ্ধ ভাবে পূর্ব পাকিস্থানে উর্দুভাষীদের অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং পাকিস্থানি রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্তাদের যে রকম মনোভাব, তাতে পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষা অনাগত ভবিষ্যৎ কালে এখনকার মত বহাল-তবিয়তে টিঁকে থাকবে কি না সে বিষয়ে সঙ্গত ভাবেই সংশয় প্রকাশ করা চলে। আর টিঁকে থাকলেও তাকে বাংলা ভাষা বলে চেনা যাবে কিনা তাও একটি প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গের কোন কোন মহলে বাংলাকে উর্দুবিমিশ্র করবার যে পরিকল্পিত আন্দোলন কিছুকাল যাবৎ চলেছিল আজ হয়তো তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের তীব্রতা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তবে এই সাফল্য সব সময়ের জন্য প্রতিরোধকারীদের করায়ত্ত থাকবে কি না সন্দেহ। ধর্ম-মোহ আর সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সে রাষ্ট্রের একাংশে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ যতই প্রবল হোক, সে অনুরাগ যে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হবে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

সুতরাং কথাটা অপ্রিয় হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের পক্ষে আজ পশ্চিমবঙ্গই প্রধান নির্ভর। অথচ এই পশ্চিমবঙ্গ আজ কত ভাবেই না বিপর্যস্ত। সকলের চাইতে বড় বিপর্যয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়, আর এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাব ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যের উপর গিয়ে পড়েছে। প্রাণশক্তির অভাবে আজ পশ্চিম-বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের সাহিত্যপ্রয়াস স্ফূর্তিহীন। সাহিত্যের যে একটি অর্থকরী বা

ব্যবসায়গত দিক আছে, সেটি পাকিস্থান স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে। বাংলা বইয়ের একটা মোটা পরিমাণ সংখ্যার ক্রেতা ছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়, সেই হিন্দু সম্প্রদায় আজ সাহিত্যের আনুকূল্য করা দূরে থাক, বিড়ম্বিতভাগ্য উদ্বাস্তুরূপে নিজেরাই সর্বপ্রকার আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল। জীবনযাত্রায় পদে পদে অনৈশ্চিত্য নিয়ে সাহিত্যের পোষকতা করা চলে না। এদিকে পাকিস্থানের অভ্যন্তরে বাংলা বই প্রচারিত হবার পথেও ব্যবহারিক বাধা বহু। ফলে বাঙালী লেখক এবং প্রকাশক উভয়কেই আজ কর্তিত-অঙ্গ, ক্ষীণ-পরিসর পশ্চিম-বাংলার সীমাবদ্ধ পাঠক সংখ্যাকে নিয়েই মুখ্যতঃ সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

বিপদের উপর বিপদ। বঙ্গ বিভক্ত হতে না হতেই দেখা দিল রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর সমস্যা। ভারতীয় সংবিধানে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আর মাত্র পনের বৎসরের মধ্যেই কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের কর্ম সম্পাদনের ভাষা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ভাব-বিনিময়ের ভাষারূপে হিন্দী ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত হবে। দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দীর প্রতি ন্যস্ত এই গুরুত্ব হিন্দীর যথাযথ ভাবে প্রাপ্য কি না জানি না, তবে এ কথা ঠিক, ভারতীয় সংবিধানকারদের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দীর গুরুত্ব বহু গুণ বেড়ে গেছে। বাঙালী ছেলে-মেয়েরা দলে দলে হিন্দী শিখতে উঠে-পড়ে লেগেছে। বহু প্রবীণের মধ্যেও এই নূতন নেশা সঞ্চারিত হয়েছে। কেউ কেউ আবার হিন্দীর অনুকূলে প্রচারপ্রবন্ধও লিখছেন দেখতে পাই।

যাঁরা বলেন বাঙালীর নবার্জিত হিন্দীমনস্কতার দরুণ বাংলা ভাষার সম্পর্কে ভয় পাবার কিছু নেই তাঁরা যথার্থ বলেন কি না সন্দেহ। এ ক্ষেত্রে ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দীর তুলনা করা ভুল হবে, কেন না ইংরেজীর অবস্থা আর হিন্দীর অবস্থা এক নয়। ইংরেজী একটি ঐশ্বর্যময় ভাষা, তার ঐশ্বর্যের খ্যাতি আন্তর্জাতিক। এই ভাষার সহিত সংস্পর্শের ফলে বাংলার তো ক্ষতি হয়ই নি, বরং নানা দিক দিয়ে তার সম্পদ বেড়েছে। ইংরেজীর খাতবাহিত বিচিত্র

ভাবস্রোতের দ্বারা বাংলা ভাষার বারিধি পুষ্ট ও পরিস্ফীত হয়েছে। বাঙালীর মনোভবনের অনেকগুলি রুদ্ধ বাতায়ন ইংরেজী ভাষার করস্পর্শেই প্রথম উন্মুক্ত হল। ইংরেজী ভাষার প্রসাদে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ হয়েছে তা প্রাক্-ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশ-উত্তর বাংলা সাহিত্যের পার্থক্যের পরিমাপ নিলেই হৃদয়ঙ্গম হবে। ["ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্ন-প্রসূতি ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল।" ["পত্র-সূচনা," 'বঙ্গদর্শন', ১৮৭২—বঙ্কিমচন্দ্র।]

ইংরেজীর এই ঐশ্বর্য হিন্দী ভাষার নেই, কাজেই হিন্দী ভাষার চর্চার দ্বারা বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ হওয়ার আশা অল্প। বড় জোর হিন্দী থেকে নূতন নূতন শব্দ আহরণ করে আমরা বাংলা ভাষার শব্দসম্পদ বাড়াতে পারি, কিন্তু ভাবের দিক থেকে হিন্দীর বিশেষ কিছু দেবার আছে বলে মনে হয় না। কথাটার মধ্যে হয়তো স্বীয় মাতৃভাষা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘার মনোভাব প্রকাশ পেল, তবে সাফাই এই যে, এইটুকু আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করবার মত অবস্থা আজ সুনিশ্চিতরূপেই বাংলা ভাষার করায়ত্ত। সকলের দ্বারা অবিসম্বাদী ভাবে স্বীকৃত যে গৌরব, সেই গৌরবের বোধে উদ্দীপিত হওয়ায় দোষ নেই।

বরং ব্যাপক হিন্দী চর্চার ফলে বাংলার মর্যাদাহানির আশঙ্কা আছে। নানা বাস্তব কার্য-কারণের যোগে এমনিতেই বাংলা আজ হৃতস্ফূর্তি, ম্রিয়মাণ, তার উপর যদি আমাদের সাংস্কৃতিক উদ্যমের একাংশ হিন্দী শিক্ষায় ব্যয়িত হয়, সে ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ ভেবে কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত হতে হয় বইকি। কারণ এ তো শুধু হিন্দী শিক্ষার প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে অ্যাটিচ্যুড অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নও জড়িত আছে। হিন্দী কেন্দ্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে হারে বাঙালী ছেলেমেয়েরা হিন্দী শিখতে উঠে পড়ে লেগেছে, তাতে উৎসাহের পরিবর্তে মনে বরং নৈরাশ্যই জাগ্রত হয় বেশী। বাঙালী তরুণ সম্প্রদায় যে ইতিমধ্যে এতখানি বৈষয়িক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে এ সংবাদ আমাদের জানা ছিল না। হিন্দী শিক্ষার অন্তরালবর্তী মূল প্রেরণা যে

বৈষয়িক সে কথা আশা করি কাউকে বলে দিতে হবে না। উদ্দেশ্য দ্রুত হিন্দী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে ওই ভাষায় নৈপুণ্য অর্জন এবং তদ্দ্বারা কেন্দ্রীয় তথা আন্তঃপ্রাদেশিক স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ। সরকারী চাকুরী ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে না থাকার মনোভাবও উক্ত ভাষাশিক্ষাগত তৎপরতার মূলে বহুলাংশে সক্রিয়।

এ সকল উদ্দেশ্য অসাধু তা বলি না, বরং জাগতিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে অপরিহার্য জ্ঞানে মান্য, কিন্তু কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যদি দলে দলে লোক নতুন ভাষা শিখতে আদা-জল খেয়ে লাগে, সে ক্ষেত্রে আপত্তি না জানিয়ে পারা যায় না। কারণ, এতে মাতৃভাষার প্রতি এক ধরনের অবহেলা সূচিত হয়—যে অবহেলা হিন্দী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কই, দশ বছর আগে অন্ততঃ দশ জন লোককেও তো হিন্দী শিক্ষায় আগ্রহশীল হতে দেখা যায় নি।

প্রথম যখন বাঙালী ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে, সে প্রধানতঃ বৈষয়িক প্রয়োজনেই এই দিকে ঝুঁকেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই ইংরেজী শিক্ষাই বাঙালী লেখক সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে অযুত শুভ ফলের কারক হয়ে উঠেছিল। জাতীয় জীবনের উপর ইংরেজী শিক্ষার কুফল একেবারেই যে কিছু না হয়েছে তা বলি না, তবে এই কুফলের কাঁটা ধন্য করেই অজস্র সুন্দর ফুল ফুটে উঠেছে জাতীয় মনোতরুতে। ইংরেজী শিক্ষার সামান্য ক্ষতির পিঠে বাঙালী-মানস সমৃদ্ধ হয়েছে নানা ভাবে। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে তৎকালীন বাঙালী লেখকদের লেখনীমুখে যে নূতন ভাবধারা বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করল তার কোন পূর্ব-ঐতিহ্য এ দেশে ছিল না।

তা ছাড়া, এখনকার অবস্থার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলের অবস্থার তুলনা হয় না। তখন বাংলা ভাষা, বিশেষ বাংলা গদ্য ছিল নিতান্ত দরিদ্র; এখন আর সে কথা বলা যায় না। আজ বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের বিচারে যে কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের অনেকানেক কুশলী গদ্যলেখকদের মিলিত সাধনায় বাংলা গদ্য বর্তমানে যেখানে এসে উপনীত হয়েছে, সেখানে উন্নীত হতে ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার আরও কিছু দিন সময় লাগবে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ভাষা শিক্ষার নাম করে হিন্দী নিয়ে হৈচৈ করার একমাত্র অর্থ ই হয়—সে অর্থ, বাংলা ভাষার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অচেতনতা, মাতৃভাষার প্রতি সম্যক্ প্রীতির অভাব, এবং এক ধরনের সাংস্কৃতিক চিত্ত-দৈন্য। বাংলার সব চাইতে গৌরবের বস্তু তার ভাষা ও সাহিত্য, সেই গৌরবের কাঞ্চনখণ্ড ত্যাগ করে আঁচলে কাচ বাঁধবার প্রয়াসকে কোন ব্যক্তিই প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন না, বিশেষ তিনি যদি সংস্কৃতিনিষ্ঠ হন।

বাংলা ভাষার তুলনায় হিন্দী ভাষার ঐশ্বর্যাপকর্যই যে হিন্দী শিক্ষার ব্যাপারে ভয়ের একমাত্র কারণ সৃষ্টি করেছে তা নয়। ভয়ের আরও কারণ আছে। ইংরেজীর বেলায় আমরা দেখেছি, ইংরেজ সরকারী কর্তাদের দৌলতে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবা এক সময়ে এ দেশে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। এ-দেশীয় শিক্ষার ধারায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা যথার্থ পণ্ডিত হয়েও অবহেলিত হয়েছেন, এদিকে নাম মাত্র ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের কৃতিত্বকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অযথা বড় করে তোলা হয়েছে। মাতৃভাষার অনুশীলনকারীরা যোগ্যতার অধিকারী হয়েও তদানীন্তন সরকারের নিকট কল্কে পান নি, এদিকে কেবল মাত্র 'ড্রাফট' রচনার তথাকথিত কৃতিত্বের সুবাদে বা ইংরেজী কথন-নৈপুণ্যে পল্লবগ্রাহী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি একটা কেষ্ট-বিষ্টুরূপে সমাজে অভিনন্দিত হয়েছেন। ইংরেজী ভাষার বহুতর উৎকর্ষ আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, কেবল মাত্র ইংরেজী জ্ঞানের বিশেষ কোন সার্থকতা নেই—যদি না সেই জ্ঞানের দ্বারা স্বজাতির ও স্বসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। মানুষের কৃতিত্ব ভাষাকুশলতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার দৃষ্টিভঙ্গীর ঐশ্বর্যে, তার প্রজ্ঞায়। ইংরেজী না জেনেও একজন ব্যক্তি প্রাজ্ঞ হতে পারেন যদি তাঁর এ-দেশীয়

শিক্ষার উদার, মানবতাবাদী ধারাটির সঙ্গে উপযুক্ত পরিচয় থাকে। তেমন ব্যক্তি যে একজন বিদেশী ভাষা শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত পল্লবগ্রাহী শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা বহু গুণে মান্য, সেটি যুক্তি-তর্কের দ্বারা বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। তবু দুর্ভাগ্য এই যে, এমন প্রত্যক্ষ সত্যের ক্ষেত্রেও যুক্তি দিতে হয়। শুধু তা-ই নয়, আমরা এ ক্ষেত্রে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলি, বিদেশী ভাষায় হাজার শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তির জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগ নেই তাঁর ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত এবং অসার্থক। সমাজ-জীবনের বৃক্ষে তিনি পরগাছার মত ঝুলে থাকেন। তাঁর পরকীয় ভাষাজ্ঞানের দ্বারা দেশের কোন উপকার হয় না, তিনিও দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ স্থাপন করতে পারেন না। জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রহীন হয়ে তিনি চিরটা কাল দেশের অভ্যন্তরে থেকেও বিড়ম্বিত জীবন যাপন করেন।

অথচ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিরাই ইংরেজ শাসনের আমলে সকলের চাইতে সুবিধা-সুযোগ লাভ করে আত্মাভিমানপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। এঁদের দ্বারা সরকারী সেবার কাজটি ভাল ভাবেই সাধিত হয়েছে, এ বাদে আর কিছু হয় নি। বাংলা দেশ তথা বাংলা ভাষার স্বার্থ এঁদের দৃষ্টিসীমার বাইরে বরাবর অবজ্ঞাত অবস্থায়ই পড়ে ছিল। অথচ সরকারী আনুকূল্য-মহিমার প্রসাদে কী দাপটই না এঁদের ছিল! যাঁরা সমাজসেবা ও মাতৃভাষার সেবাকে জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রতি এঁদের তাচ্ছিল্যের অন্ত ছিল না, কিন্তু তাঁরা যে এঁদের চাইতে ইংরেজী কিছু কম জানতেন তা নয়, বরং বেশীই জানতেন। মাইকেল মধুসূদন, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়দের অপরাধ এই যে, তাঁদের জ্ঞানের সীমা কিঞ্চিৎ অধিক সম্প্রসারিত ছিল। তাঁরা বিদেশী ভাষা শিক্ষা করেই তৃপ্ত থাকেন নি, সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে যেন মাতৃভাষাটাকেও ভাল করে আয়ত্ত করেছিলেন। বিদেশী ভাষা অপরের ক্ষেত্রে যেখানে শুধু বৈষয়িক স্বার্থ সংসাধনের এবং সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ আত্মাভিমান পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় বিধানের ভাষা হয়ে উঠেছিল, এঁদের বেলায় তা হয়ে ওঠে মাতৃভাষা তথা

জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধতর করবার সুস্পষ্ট হাতিয়ার। বিদেশী ভাষাভিমানী, ভিতর-ফাঁপা সরকারী চাকুরিয়ার দল ইংরেজী ভাষাকে মনে করেছিলেন জর্দন নদীর জল, গায়ে ছিটোলেই কৌলীন্যের অধিকারী হলেন; আর আমাদের পূজনীয় পূর্বাচার্য সাহিত্যরথীরা ছিলেন সাহিত্যিক ভগীরথ, যাঁদের চোখে ইংরেজী সাহিত্য ছিল ভাবগঙ্গাবৎ। সেই ভাবগঙ্গাকে তাঁরা বহু আয়াসে বাংলার মৃত্তিকায় বয়ে এনে তাকে নানা ভাবে ফলপ্রসূ করে তুলেছিলেন। বাংলার সাহিত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে ইংরেজী ভাষাভিমানী পরগাছাদের কোন তুলনা হতে পারে না।

আমাদের ভয় হয়, হিন্দী ভাষা যখন বাংলা দেশে তার পদাধিকারের সুযোগে যথেষ্ট পরিমাণে আসর জাঁকিয়ে বসবে, তখন গত যুগের ইংরেজী শিক্ষাভিমানী বাঙালী সম্প্রদায়ের মতই হিন্দীকে কেন্দ্র করে এক নূতন পরগাছা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে। পরগাছা, কেন না কেন্দ্রীয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাই হবে এই সম্প্রদায়ের প্রধান নির্ভর, আর সেই সূত্রে মাতৃভাষা এঁদের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক। যদি কেউ বলেন এমনতরো আশঙ্কার যুক্তিসঙ্গত কোন ভিত্তি নেই, তা হলে পুনরায় তাঁকে গত যুগের ইংরেজী ভাষাভিমানী সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে। চোখ-কান খোলা রেখে যাঁরাই পথ হাঁটেন তাঁরাই জানেন, সরকারী প্রসাদপুষ্ট ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞম্মন্যদের দাপটে বাংলা ভাষা বহু দিন কী রকম স্ফূর্তিহীন, ম্লান অবস্থায়ই না ছিল। হ্যাটকোটধারীদের সামনে ধুতি-চাদর যেমন ম্লান হয়ে থাকে সে জাতীয় ম্লানতা গোটা ইংরেজশাসনের কাল জুড়ে বাংলা ভাষাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যদিও সম্যক্‌দর্শী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন, ধুতি-চাদরের তুলনায় হ্যাটকোটকে সহজাত ভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করবার কোন কারণ নেই। হিন্দী ভাষাকে অবলম্বন করে মাতৃভাষার সেই ম্রিয়মাণতার অধ্যায় যদি পুনরাবৃত্ত হয়, সে কি খুব আশ্চর্যের বিষয় হবে? এ প্রসঙ্গে যে কথাটা সব চাইতে বেশী মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে এই, হিন্দীর পিছনে সরকারী সমর্থনের জোর আছে, বাংলা ভাষার পিছনে তেমন কোন জোর নেই। এটা

যে কত বড় তফাত তা বলে বোঝাবার দরকার আছে বলে মনে করি না। সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতার অর্থই হল বৈষয়িক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হওয়া। হিন্দী ভাষার বেলায় যখন সেই সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আর মাতৃভাষা বাংলার বেলায় তেমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, তখন সাধ করে কে আর হিন্দীকে পিছনে ফেলে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসবে? আমরা মুখে সংস্কৃতি-প্রীতির যতই বড়াই করি না কেন, আসলে আমাদের মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের সংখ্যাই বেশী। সকল বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যেও মাতৃভাষার অনুশীলনকে পরম কর্তব্য জ্ঞানে আঁকড়ে থাকবার মত স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি খুব বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয় সে ক্ষেত্রে এমন অনুমান নিশ্চয় করা যেতে পারে যে, বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধির টানেই বহু লোক হিন্দীকে কুলীন জ্ঞান করবে এবং তদনুপাতে মাতৃভাষাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখবে। সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের মানসিক ধর্মই হচ্ছে, যা তাঁদের সুবিধা-সুযোগের কারক তাকে মহামূল্য জ্ঞান করা এবং যে বস্তুর পশ্চাতে সুবিধা-সুযোগের প্রতিশ্রুতি নেই তাকে অবজ্ঞা করা। এই প্রতিতুলনার বোধ অজ্ঞতা থেকে আসে এমন মনে করা ঠিক হবে না, কারণ অনেক সময় নিতান্ত সচেতন ভাবেই সুবিধা-সুযোগের কারণ-বর্জিত বস্তুকে হেয় জ্ঞান করা হয়। মনের ভিতর হয়তো প্রচ্ছন্ন এই অনুভূতি থাকে যে, যাকে হেয় জ্ঞান করা হচ্ছে তা আসলে হেয় নয়, কিন্তু যেহেতু তা থেকে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নিতান্ত কম বা একেবারেই নেই, সেই হেতু জেনে-শুনেই তাকে পাশ কাটিয়ে সুবিধা-সুযোগের হেতুভূত বস্তুর উপর মনের সবটুকু প্রীতি ঢেলে দেওয়া হয়। নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থেই প্রচারের ঢক্কা-নিনাদ দ্বারা শেষোক্ত বস্তুকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তোলা হয়, এবং তদ্বাবদে দশের নিকট আত্মশ্লাঘা প্রচারের সুযোগ লওয়া হয়। হিন্দী বনাম মাতৃভাষা বাংলার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এমনতরো অবাঞ্ছিত অবস্থার যে সৃষ্টি হবে না, সে কথা জোর করে কেউ বলতে পারে না। এমনিতেই আমাদের মাতৃভাষার পিছনে সংগঠন-বল কম, তার উপর বাংলা দেশ

দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের জোর আরও কমে গিয়েছে, এমন অবস্থায় হিন্দী উড়ে-এসে জুড়ে-বসে আমাদের মনোযোগের একটা মোটা অংশ গ্রাস করে বসলে অচিরকালের মধ্যে অবস্থা কী দাঁড়াবে ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

সম্প্রতি রাঁচীতে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য-সম্মেলনে বাংলার কোন এক সুপরিচিত অধ্যাপক-সাহিত্যিক এরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, এখন থেকে বাঙালী সাহিত্যিকদের হিন্দী এবং বাংলা এই দুই ভাষাতেই সাহিত্যচর্চা করতে চেষ্টিত হওয়া উচিত। উক্ত সুবিজ্ঞ অধ্যাপকের অভিপ্রায় সাধু হলেও সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে দুই ভাষার আশ্রয় নেওয়ার যে কতকগুলি বিপদ আছে তা তাঁকে স্মরণ করতে বলি। মানুষের সময় সীমাবদ্ধ, উদ্যম ততোধিক। মাতৃভাষা ভাল করে আয়ত্ত করতেই এক-এক জন লেখকের গোটা জীবন কেটে যাবার দাখিল হয়, তার উপর যদি আবার তাঁকে ভাষান্তর আশ্রয় করে সাহিত্য-চর্চা করতে বলা হয়, তা হলে তাঁর উপর নিতান্তই জুলুম করা হয়। হিন্দীকে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের ভাষারূপে প্রয়োগের অর্থ বুঝি, এমন কি পাশাপাশি অঞ্চলের ভাষা হিসাবে হিন্দী সাহিত্যের প্রয়োজনানুরূপ খোঁজ-খবর রাখার যুক্তিটাও অবোধ্য নয়। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না থেকে কেউ যদি আবার বলে, বাংলা ভাষার পাশে পাশে হিন্দীকেও সাহিত্য-চর্চার ভাষা করতে হবে, তা হলে বাঙালী লেখকদের উপর বড় বেশী দাবী করা হয়। প্রথমতঃ লেখকদের শক্তি ও উদ্যম সীমাবদ্ধ বলেই তাঁদের পক্ষে এ দাবী যথাযথ ভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। বাঙালী লেখক সম্প্রদায়ের একাংশ যে অনুপাতে হিন্দী-চর্চার দিকে ঝুঁকবে, সেই অনুপাতে বাংলা ভাষা দুর্বলতর হবে। দ্বিতীয়তঃ, যে কথা একটু আগে বলা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করি। আমাদের লেখকদের মধ্যে সকলেই কিছু আদর্শনিষ্ঠ লেখক নন। অধিকাংশেরই মানসিক গঠনের ভিতর বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধি একটা প্রধান অংশ জুড়ে আছে। একবার এঁরা হিন্দী সাহিত্য চর্চার দ্বারা বৈষয়িক সমুন্নতির স্বাদ পেয়ে বসলে মাতৃভাষার জন্যই মাতৃভাষার চর্চা আর কেউ করবেন বলে মনে হয় না।

তা হলে বাংলা ভাষার অবস্থাটা কী হবে? আমাদের চোখের উপরই হয়তো আমরা দেখব, একে একে বাংলার লেখকগণ মাতৃভাষার চর্চা ত্যাগ করে সকলে হিন্দী ভাষার আশ্রয়ী হয়েছেন এবং হিন্দী সাহিত্যের চর্চার দ্বারা হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

না, বাংলা সাহিত্যের পাশে পাশে হিন্দী সাহিত্য চর্চার যুক্তিটা কোনক্রমেই প্রণিধানযোগ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের উপরই আমরা প্রয়োজনানুরূপ মনোযোগ দিতে পারি না, তার উপর আবার হিন্দী! কে যথাযথ ভাবে বাংলা ভাষার চর্চা করেন তার ঠিক নেই, এদিকে আবার হিন্দীকে আসনের একাংশ ছেড়ে দেবার যুক্তি দেখানো হচ্ছে। বাংলা ভাষার অবস্থা এমন সুরক্ষিত নয় যে, তার ভাগ্য নিয়ে হেলাফেলার বিলাস আমরা করতে পারি। অবশ্য এ কথা মানব যে, ভাষান্তরের চর্চার দ্বারা প্রকারান্তরে স্বভাষারই উন্নতি সাধিত হয়, কিন্তু এই উন্নতির পিঠে অন্য দিক দিয়ে আমাদের কতখানি ক্ষতি সইতে হতে পারে সে হিসাবও এ প্রসঙ্গে করণীয়। বাংলা ভাষা বর্তমানে পূর্বকথিত দ্বিবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এই অবস্থায় বাংলা ভাষাকে রক্ষা করবার জন্যই আমাদের সবটুকু মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। হিন্দী ভাষার প্রতি নবার্জিত অনুরাগ বশে আমবা যদি সে মনোযোগের একটা মোটা অংশ উক্ত নূতন ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে ব্যয় করতে আরম্ভ করি, তা হলে বাংলা সাহিত্যের দ্রুত অধোগমন রোধ করা কঠিন হবে। একাধিক ভাষা-সাহিত্যে নৈপুণ্য অর্জনের আদর্শ শ্রেয়ঃ তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু বাংলা ভাষার উপর উক্ত এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের ভর সওয়াবার সময় এটা নয়, এইটেই শুধু বলবার। রাষ্ট্রীয় গরজে হিন্দীকে বড় জোর আমরা ব্যবহারিক প্রয়োজনের ভাষা করে তুলতে পারি, কিন্তু তাই বলে অপ্রয়োজনের ভাষা, অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষাও হিন্দী হোক, এ দাবী গ্রাহ্য নয়। এ দাবী অংশতঃ মেনে নিলেও বর্তমান অবস্থায় বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে তা আত্মঘাতী হবে।

জানি এ প্রসঙ্গে ইংরেজী ও বাংলা ভাষা পাশাপাশি চর্চার নজীর অনেকেই তুলবেন। ইংরেজী ও মাতৃভাষা যুগপৎ চর্চা করেছেন এমন দু-চার জন

লেখক আজকের বাংলা দেশে পেলেও পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ, উনিশ শতকে এ রেওয়াজ কতকটা ব্যাপক ভাবেই প্রচলিত ছিল বলা যায়। কিন্তু সেখানেও দেখতে পাই, ভাষা-চর্চার ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতা কখনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির সহায়ক হয় নি। বাংলা সাহিত্যকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টির দানে যাঁরা নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলে অখণ্ড অভিনিবেশের সহিত কেবল মাত্র বাংলা ভাষারই চর্চা করেছেন। অবশ্য মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র, বাংলার এই দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকে ইংরেজী রচনার প্রতি ঝুঁকেছিলেন, তবে তাঁদের এই ইংরেজী-মনস্কতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নি। ইংরেজী সাহিত্যানুশীলনের উপর ন্যস্ত তাঁদের প্রারম্ভিক কালের আগ্রহ শেষ জীবন অবধি অক্ষুণ্ণ থাকলে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তার ফল খুব সুখকর হত বলে মনে হয় না। এদিকে রবীন্দ্রনাথেরও ইংরেজী-পরাঙ্মুখতা সুবিদিত। কবির ইংরেজী রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম না হলেও বাংলার তুলনায় যৎসামান্য। মাতৃভাষায় রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ সুবিশাল। কবি ছিলেন মুখ্যতঃ মাতৃভাষামনস্ক লেখক। প্রমথ চৌধুরী ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইংরেজী রচনার সংখ্যা অঙ্গুল্যগ্র-গণনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর শরৎচন্দ্র তো মনে-প্রাণে আগাগোড়াই ছিলেন বাংলাভাষী লেখক।

ভাষা-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত মনোযোগের অসুবিধা তো আছেই, এ ছাড়া হিন্দীর বেলায় আরও অসুবিধা আছে। পূর্বে যে কথা একবার বলেছি, সে কথা পুনরায় বলি: ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দীর তুলনা হয় না। হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে বলেই এখন থেকে সবাইকে কোমরের রসি সজোরে বেঁধে হিন্দী সাহিত্য-চর্চায় লেগে যেতে হবে, হিন্দী সাহিত্য সম্পর্কে এমন বীরপূজার মনোভাব না থাকাই ভাল। অন্ততঃ, বাঙালীর এ মনোভাব শোভা পায় না।

সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, ভাষা শিক্ষা আর সাহিত্যানুশীলন এক বস্তু নয়। সাহিত্যে কুশলতা অর্জনের জন্য গোটা জীবনের প্রস্তুতি দরকার, ভাষা শিক্ষার

বেলায় তা না হলেও চলে। ব্যবহারিক এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বাঙালী হিন্দী শিক্ষা করতে হয় করুন, কিন্তু দোহাই, সে ভাষাকে অনুপাত-অতিরিক্ত মর্যাদা দেবেন না। তা হলে বাংলা সাহিত্যের বিপদ হবে। হিন্দী ভাষা-চর্চাকে তার যথাযোগ্য স্থানে সীমাবদ্ধ রেখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চায় সবটুকু উদ্যম আরোপ করাই হবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালী লেখক-সম্প্রদায়ের প্রধান করণীয়। বাংলা সাহিত্যের আত্মরক্ষার এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

বাংলা গদ্যরীতি

বর্তমান নিবন্ধে আমরা বাংলা সাহিত্যের ভাষাসমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। বাংলা সাহিত্যের বস্তুবিচার না করে আমরা এই-যে তার আপাতগৌণ প্রকাশভঙ্গির সমস্যা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি সেটি কারও কারও চোখে বিসদৃশ মনে হতে পারে। দ্রব্যের গুণাগুণ পিছনে ফেলে রেখে দ্রব্যাধারের আকার-আয়তন, বর্ণ, গঠনবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যখন কারও মনোযোগ অধিকার করে নেয় তখন সে কাজের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেওয়া সাধারণ বিচারে সত্যই একটু কঠিন। কিন্তু আমরা অহেতুক ভাষাপ্রসঙ্গের অবতারণা করি নি। বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি, প্রবণতা, তার আদর্শ, তার বস্তুবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে এ পর্যন্ত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভাষাবিচার আলোচকদের হাতে যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছে কিনা সন্দেহ। সাহিত্যের এই বিভাগের আলোচনা এখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত রয়েছে বললে মোটেই সত্যের অপলাপ করা হয় না।

আরও এক কারণে ভাষাপ্রসঙ্গের উপর জোর দিতে চাই। গদ্যের ভাষা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমাদের একটি নিজস্ব মত আছে, এবং যতদূর জানি, সে মত বাংলার অধিকাংশ সাহিত্যিক ও লেখকের পরিপোষিত অভিমতের প্রতিকূল। গোড়াতেই এতৎসম্পর্কিত বক্তব্য সূত্রাকারে নিবেদন করে নেওয়া ভাল।

সূত্রটি হচ্ছে এই যে, গদ্যের ভাষায় অর্থের যাথাযথ্যটাই হল আসল কথা; ভাষার সুষমা, সৌন্দর্য, মাধুর্য এগুলির বিচার পরে। এ সম্বন্ধে আমার "বাংলা সাহিত্যের ভাষাবিচার" নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, সে সকল কথার পুনরুক্তির আবশ্যকতা দেখি না।* তবে

* লেখকের 'বাংলার সাহিত্য' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

একটি কথা বার বার বলবার প্রয়োজন আছে যে, আমরা বাংলা ভাষার ব্যবসায়ীরা এতাবৎ গদ্যকে কান্তি ও লাবণ্যমণ্ডিত করবার জন্য যে পরিমাণ উদ্যম ও মনোযোগ ব্যয় করেছি, গদ্যকে যথার্থ অর্থবোধক করে তুলতে তার সিকির সিকি শ্রমও ব্যয় করি নি। ফলে বাংলা গদ্যের ভাষায় ভাবের অসংলগ্নতা, যুক্তির দৌর্বল্য, চিন্তার অস্বচ্ছতা পদে পদে চোখে পড়ে। শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে এক ধরনের যথেচ্ছাচারী মনোভাবই যে এই বিপত্তির মূলে সেটি সামান্য বিশ্লেষণে প্রমাণ করা যায়। কোন্ শব্দ কী অর্থ বহন করে, সমার্থবোধক একাধিক শব্দের ভিতর কোন্ শব্দ কোন্ প্রসঙ্গে সমধিক গ্রাহ্য, কোথায় বাক্যে ছেদ টানা দরকার, বাক্যসমূহকে পর পর কী ভাবে সাজালে যুক্তির শৃঙ্খল অখণ্ড থাকে, ন্যূনতম সংখ্যক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা কেমন করে মনোগত ভাব পরিস্ফুট করতে হয়, শব্দবিন্যাসের প্রক্রিয়ায় অন্বয়ঘটিত প্রমাদ এড়াবার উপায় কী—এ সকল বিষয়ে আমাদের ভিতর যথোচিত সচেতনতার অভাব। এই অভাব থেকে আমাদের গদ্যের ভাষায় নানারকম উচ্ছৃঙ্খলতার সূত্রপাত হয়েছে। সেই উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করতে হলে সাহিত্যের ভাষাবিচার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আপাতবিচারে ভাষার প্রতি এই গুরুত্ব-আরোপ অনুপাত-অতিরিক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে এর বিশেষ সার্থকতা আছে বলে মনে করি।

সমালোচনার ভাষা নমনীয় এবং সহনীয় করবার একটা স্বীকৃত রীতি এই যে, নিন্দোক্তির সঙ্গে আত্মপক্ষকেও জড়িয়ে নিতে হয়। দোষটা তখন আপন পর সকলকে সমানভাবে আঘাত করে বলে কারও বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ থাকে না। অধমকে তাড়না উত্তম পুরুষের আশ্রয়ে সব চাইতে মোলায়েম ভাবে, কাজে কাজেই সব চাইতে ফলপ্রদ ভাবে, নিষ্পন্ন হয়। উত্তম পুরুষ এখানে শুদ্ধমাত্র স্বপক্ষকেই বোঝাচ্ছে না, আক্ষরিক অর্থেও উত্তম পুরুষদের বোঝাচ্ছে। ভাষার যে উচ্ছৃঙ্খলতার কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার কবল থেকে আমাদের দেশের অতি প্রথম শ্রেণীর লেখকও মুক্ত নন। পদ্যব্যবসায়ীরা তো স্বভাবতঃ বটেই, গদ্যব্যবসায়ীরাও কাব্যের সংস্কার দ্বারা

এমন শোধনাতীত ভাবে আচ্ছন্ন যে গদ্যকে যথার্থ অর্থপ্রকাশক যুক্তির ভাষা করে তুলতে এখনও আমাদের বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একবার 'সবুজ পত্রে'র পাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা আর 'সীতারামে'র ভাষা পাশাপাশি রেখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, শেষোক্ত গ্রন্থের ভাষা প্রথমোক্ত গ্রন্থের ভাষা অপেক্ষা সহজ, প্রাঞ্জল, স্বাভাবিক, সুতরাং উৎকৃষ্টতর। দুর্গেশনন্দিনীর উদ্ধৃত অংশবিশেষের ভাষায় তিনি ব্যাকরণগত ত্রুটি, ভাষার কৃত্রিমতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার নজীর আবিষ্কার করেছিলেন। সে আবিষ্ক্রিয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রকে, বলা বাহুল্য, খাটো করবার মনোভাব ছিল না; ছিল সত্যপ্রতিষ্ঠার একান্ত নিস্পৃহ কামনা। প্রমথ চৌধুরীর অভিমত এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষারও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিণতি সাধিত হয়েছিল। এই পরিণতি অস্পষ্ট কাব্য-কুয়াসা থেকে প্রাঞ্জলতায় পরিণতি, আড়ম্বরপ্রিয়তা থেকে সারল্যে পরিণতি, কৃত্রিমতা থেকে স্বাভাবিকত্বে পরিণতি। অভিমতটির সত্যতা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতির তুলনামূলক আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ভাষাবিচারের যে সূত্রের সন্ধান পাই সেটি সমগ্র ভাবে সকল সাহিত্যের বেলায়ই প্রযোজ্য। কথাটা আমাদের বারংবার অনুধাবন করা দরকার, ভাষাদেহ যত পরিণতি লাভ করে ততই তার অঙ্গ থেকে বাহুল্য আভরণ ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। মণ্ডনশিল্পের বিবর্তন হতে হতে ভূষণের বিরলতা সৌন্দর্যবৃদ্ধির পক্ষে আজ একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভাষার বেলায়ও এই উপমা অনায়াসে প্রয়োগ করা চলে। সৌন্দর্যের পরিচয় স্তূপীকরণে নয়, বাহুল্যবর্জনে। উপকরণস্বল্পতার মধ্যেই সুরুচির নিঃসংশয় প্রমাণ। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় পৌঁছতে আমাদের গদ্যসাহিত্যের এখনও অনেক বিলম্ব। আজও পর্যন্ত আমরা অলঙ্কারসজ্জায় আদিমমানবসুলভ আতিশয্যের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারলুম না, ভূষণবিরলতা পরেব কথা। ভাষাদেহকে অযথা সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে গিয়ে আমরা তার উদ্দেশ্য প্রায়শ আবৃত করছি। দেহের উপর অলঙ্কারের বোঝা চাপাবার দুরন্ত নেশায়

লজ্জানিবারণের একান্ত প্রয়োজন ভুলে যাওয়া হচ্ছে। এর ফল এক এক সময় বাংলা সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক রকমের লজ্জাকর হয়ে উঠছে। জানি, আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ভাষাপ্রয়োগে যথেচ্ছাচারের দোষে দোষী। তবে আমাদের সাফাই এই যে, আমরা জানি যে আমরা দোষী; অনেকেই এ সম্বন্ধে নিরেট অচেতন। আমরা আর কিছু পারি না পারি, এ বিষয়ে লেখকদের চেতনা জাগ্রত করবার চেষ্টা করতে পারি। ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতনতা যে ত্রুটি শোধনের পথ বহুলাংশে সুগম করে সে তো আপ্তবাক্যের সামিল।

বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা অপরিহার্য, এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমিত প্রতিভার বলে বাংলা গদ্যকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই। আমরা আজ যে ভাষায় চিন্তা করি, যে ভাষায় কথা বলি, যে ভাষায় লিখি সে তো রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা। পিতৃঋণ অস্বীকারের চেষ্টা পাতকের সামিল, কাজেই সে পথ ত্যাজ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে সত্য কথা বলবারও অকুণ্ঠ সাহস থাকা দরকার। পিতৃশোণিত দেহে ধারণ করেও যেমন সত্যের প্রয়োজনে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আত্মস্থ করেও রবীন্দ্রনাথের খাঁটি মূল্যবিচার সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ভঙ্গি সহস্রবার তারিফ করেও আমরা বলব, যুক্তিনিষ্ঠা সে গদ্যের আদত কথা নয়। যুক্তিশৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতাকে যদি সুচারু গদ্যেব প্রধান নিরিখ ধরে নিই, রবীন্দ্রগদ্য সে দাবী কিছু পরিমাণে অতৃপ্ত রাখে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ছিলেন কবি, তারপর আর সব-কিছু। তাঁর কবিধর্মিতার দ্বারা তার গদ্য আগাগোড়া অনুলিপ্ত। এই গদ্য সৌন্দর্যের আফিমের নেশায় মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, পাঠকের চিন্তাকে উচ্চকিত করে না। রবীন্দ্রনাথের গদ্য নিঃসন্দেহে চিন্তাসমৃদ্ধ, কিন্তু সে চিন্তাধারার মধ্যে কোন ধারাবাহিক ক্রম নেই। যুক্তিশৃঙ্খলার দ্বারা সে গদ্যভঙ্গি নিয়ামিত নয়। যুক্তির কঠোর অনুশাসনজাত নিয়মবন্ধনের অধীন নয় বলেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য এত ভাষণমুখর, উচ্ছ্বসিত,

পূর্বাপর সঙ্গতিবিহীন। স্বতোবিরোধের দৃষ্টান্তে রবীন্দ্র-রচনা পূর্ণ। স্বতো-বিরোধিতা মহৎ প্রতিভার ধর্ম হতে পারে ('I contradict myself, because I am great'—Whitman), কিন্তু আমরা যে গদ্যের আদর্শ পাঠকদের সামনে ধরে দিতে চাই সে গদ্যের লেখকের পক্ষে স্বতোবিরোধিতা গুণ নয়, বিচ্যুতি। ভাষা ব্যবহার ও শব্দ প্রয়োগে ব্যয়কুণ্ঠার নীতি সজ্ঞানতঃ না মানা পর্যন্ত স্বতোবিরোধজনিত বিচ্যুতি এড়ানো যায় না, তা যত বড় প্রতিভাই কেউ হোন না কেন।

উপরের মন্তব্যক্রম থেকে এমন যেন কেউ মনে না করেন যে রবীন্দ্রগদ্যের ভিতর যুক্তির উপাদান নেই। আছে, তবে সেটি মহৎ প্রতিভার অচেতন লীলার দান, সজ্ঞান প্রয়াসজাত বস্তু নয়। কবির যুক্তিবোধ কবির বিরাট প্রতিভার মধ্যে পরোক্ষভাবে অনুস্যূত, তার প্রত্যক্ষগোচরতা কম। বিশিষ্ট গদ্যলেখকেরা তাঁদের ভাষাকে পাঠকের নিকট স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ করে তুলতে যে সজ্ঞান চিন্তা-সংযমের আশ্রয় নিয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার ভঙ্গি সে জাতের নয়। তাঁর গদ্যের সৌন্দর্য অগোচর প্রেরণার উৎস থেকে অচেতন ধারায় উচ্ছ্রিত; যে ব্যক্তি সেই সৌন্দর্য পান করতে উন্মুখ তাকে উৎসারিত জলধারার সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে, খাল কেটে বাঁধ বেঁধে সে জল পাঠকের মনের জমিতে পাঠাবার ব্যবস্থা রবীন্দ্রগদ্যে নেই। রবীন্দ্রগদ্যে জল-সেচের দায়িত্ব পাঠকের, লেখকের নয়। এটিকে আমরা রবীন্দ্রগদ্যের একটি অপূর্ণতা বলে মনে করি। সৌন্দর্যসৃষ্টির বেলায় প্রেরণার স্বতঃস্ফূর্তি ও অচেতন স্বচ্ছন্দতা বড় জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু যুক্তিপ্রধান গদ্যে সে নিয়ম খাটে না। সেখানে অর্থের যথাযাথ্য ও স্পষ্টতা কান্তি ও লাবণ্যের চাইতে সমধিক গ্রহণীয় আদর্শ। সৌন্দর্য বাদ দিয়ে অর্থের স্পষ্টতা তবু ভাল, কিন্তু কোন অবস্থায়ই অর্থব্যক্তির আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে সৌন্দর্য অনুসরণ করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ বহু দিন পূর্বে 'সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছিলেন,

"গদ্যে একটা পদের সহিত আর একটা পদকে বাঁধিয়া দিতে হয়, মাঝে ফাঁক রাখিবার জো নাই, পদের মধ্যে কর্তা-কর্ম ক্রিয়াকে এবং

পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্ত-মধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়। ছন্দের একটা অনিবার্য প্রবাহ আছে; সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যায়; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভার সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়;—সেই পদব্রজ বিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চলা অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টলমলে হইয়া থাকে।··· ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং পদের প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে।" ("বাংলা জাতীয় সাহিত্য")

কবিকথিত গদ্যের এই রীতি কবি স্বীয় রচনায় বোধ হয় সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথেব গদ্যে কাব্যের ভঙ্গি স্পষ্ট; উপরের উক্তিতে যাকে তিনি কবিতার লক্ষণ বলেছেন সেই ছন্দোবদ্ধতা, নৃত্যপরতা, স্বতঃস্ফূর্তি সবই তাঁর গদ্যদেহে ধরা-ছোঁয়া ভাবে বর্তমান; "নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভার সামঞ্জস্য করিয়া" চলা কবিকৃত গদ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নয়। আমাদের সাহিত্যের খুব কম লেখকেরই সে বৈশিষ্ট্য আছে। সমগ্র উত্তরব্রিটিশ বাংলা-সাহিত্যের পরিধিতে যুক্তিপ্রধান অথচ প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনাকুশলতার দুইটি মাত্র সার্থক দৃষ্টান্ত আমাদের মনে আসছে—বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তামূলক গদ্যের ভাষা যুক্তিপ্রধান, শাণিত-বুদ্ধিদীপ্ত; প্রাঞ্জল; অপিচ সুগভীর কৌতুকবোধের ঝিলিক দ্বারা উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রগদ্যে শেষোক্ত লক্ষণ ছাড়া অন্য লক্ষণগুলি তেমন প্রকট নয়। প্রথম এবং মধ্য বয়সের রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রাঞ্জলতার আদর্শ অনুসরণ করেছেন—তাঁর এই ধারার শ্রেষ্ঠ রচনার আদর্শ হল 'জীবনস্মৃতি'র গদ্য। কিন্তু যখন থেকে তিনি 'সবুজ পত্র'-প্রবর্তিত নব্য ভাষারীতির আন্দোলনের আওতায় এলেন তখন থেকে তাঁর ভাষায় ভঙ্গির প্রাধান্য দেখা দিল। স্বাভাবিক চলতি ভাষার নামে অনেক সময়

কৃত্রিমতার লক্ষণমণ্ডিত গদ্য তাঁর লেখনীমুখে নির্গত হয়েছে। রচনা চলতি ভাষাশ্রিত হলেই যে তা সাধু ভাষার চাইতে প্রাঞ্জল হয় না বরং অস্পষ্টতর হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের রচনা থেকে এ কথার প্রমাণ দেওয়া চলে। 'মানুষের ধর্ম,' 'কালান্তর' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং শেষ বয়সের অন্যান্য গদ্যরচনা যে ভাষায় রচিত হয়েছে তার মধ্যে অস্পষ্টতা ও কৃত্রিমতা এক আধারে কিয়ৎ পরিমাণে জড়িয়ে আছে। ম্যানারিজ্‌ম্‌-দোষে এ ভাষা দাগী। গল্পোপন্যাসের গদ্যে প্রকাশ পেয়েছে অতিবিদগ্ধ, অতিমার্জিত, এবং সেই কারণে অস্বাভাবিক এক ভাষাভঙ্গি। চিঠির ভাষায় অনবদ্য হিউমারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হয়েছে 'কলকাতাই' আঞ্চলিকতা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিশেষ কথ্য ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় 'যোগাযোগ,' 'শেষের কবিতা,' 'মালঞ্চ,' 'চার অধ্যায়' এবং 'তিন সঙ্গী'র গল্পগুলি লিখেছেন স্টাইলের বিচারে তা পরম রমণীয়, কিন্তু গল্পোপন্যাসের সহজ ভাষা এ নয়, সে কথা স্বীকার করা ভাল। সম্ভবতঃ কাহিনীর উপজীব্য বিষয়বস্তুর কৃত্রিমতা তাঁর ভাষাভঙ্গিকে এমনতরো করে থাকবে, কিংবা এর অন্য কোন হেতু আছে। তবে উত্তরজীবনে চলতি ভাষার আবরণে তিনি যে অস্বাভাবিকত্বের প্রশ্রয় দিয়েছেন সে কথা চিহ্নিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে তাঁর প্রবন্ধের ভাষায় এই অস্বাভাবিকত্ব প্রকট। 'মানুষের ধর্মে'র ভাষা বিমূর্ত চিন্তাপ্রণালী ও কাব্যিকতার এক সংমিশ্রণ। ভাষার দ্ব্যর্থব্যঞ্জনার এর চাইতে ভাল দৃষ্টান্ত আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যাবে? নমুনা দেখাতে পারতুম, কিন্তু সমগ্র বইটি যেখানে আদর্শবাদী ভাবের কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন এবং উপনিষদোক্ত ভূমানন্দের কীর্তনে মুখর, সেখানে বিশেষ করে বেছে নমুনা দেখাবার সার্থকতা আছে বলে মনে করি না।

চলতি ভাষারীতির অন্যতম প্রধান প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শক্তিশালী গদ্যলেখক, তবে সত্যের খাতিরে মানতেই হবে, তাঁর ভাষারীতিও অতিমাত্রায় ভঙ্গিসর্বস্ব। ভঙ্গি বাদ দিলে বীরবলী গদ্যের বিশেষ কিছু থাকে না। বীরবলী গদ্যের উপর গভীর বিষয়ের ভর কোনদিন সয় নি, এবং দেখা গেছে, প্রমথ

চৌধুরী মহাশয়কে আদর্শ ধরে নিয়ে পরবর্তী কালে যে সব লেখক আমাদের দেশে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁদের কেউ চিন্তাগাম্ভীর্য আয়ত্ত করতে পারেন নি। বিষয়ভেদে রচনারীতি গম্ভীর কিংবা হালকা হতে পারে প্রমথ-শিষ্যদের লেখা পড়লে সে কথা মনে হওয়ার যো নেই; কেন না, তাঁদের সব লেখাই চটুল, অতি গম্ভীর বিষয়ও তাঁদের রচনাগুণে (দোষে?) হালকা রসের আতিশয্যে জব্‌জবে হয়ে ওঠে। রচনারীতিকে প্রাঞ্জল করবার চেষ্টায় ভাষায় লঘুরসের মিশাল দিতে তাঁরা সদা ব্যগ্র। কিন্তু এ প্রয়াসের ফল কদাচ সুখকর হয়।

ভাষার প্রাঞ্জলতার আমরা পক্ষপাতী, প্রসাদগুণও সহস্রবার কাম্য; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা মানব, বিষয়ের গুরুত্বলঘুত্বভেদে প্রাঞ্জলতার তারতম্য হয়ে থাকে। বিষয় যতই দুরূহ হোক-না কেন, তা জলের মত বুঝতে পারা চাই—এতটা প্রত্যাশা করলে লেখকের উপর অনুচিত দাবী করা হয়। পাঠকের শ্রমবিমুখতাও তাতে অন্যায় রকমের প্রশ্রয় পায়। রচনার অর্থব্যক্তি সম্পাদনে দু পক্ষেরই কর্তব্য আছে—পাঠক মানসিক হাত-পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে আর প্রাঞ্জলতার সবটুক দায় লেখককে ঘাড় পেতে নিতে হবে, এতটা আশা করা বোধ করি অন্যায়। প্রমথশিষ্যরা সুবোধ্যতার নামে বড় বেশী হালকা ফুরফুরেপনার ধার ঘেঁষে যাচ্ছেন, তাতে না সাহিত্যের কল্যাণ, না তাঁদের স্বকীয় কল্যাণ।

বাংলা ভাষায় ইংরেজী ভাষাভঙ্গির প্রভাব আসা উচিত কি না এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত এই যে, এই প্রভাব আসা উচিত। তাতে সাময়িক ভাবে হয়তো স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খলতাজনিত কিছু আতিশয্য ঘটতে পারে, আতিশয্যের ফলে দেখা দিতে পারে ভাষাবিকার; কিন্তু পরিণামে এতে বাংলা ভাষার কল্যাণ হবে। আর কিছু হোক না হোক, ইংরেজীর প্রভাবে বাংলা গদ্যের কাব্যমনস্কতা দূর হবে। ওইটেই একটা মস্ত লাভ। কাব্য-কুয়াসা দূর হওয়ার সঙ্গে দেখা দেবে বৈজ্ঞানিক রীতিসম্মত বাক্যগঠনের সুস্থ অভ্যাস, শব্দব্যবহার সম্বন্ধে সচেতনতা, বাহুল্যবর্জনের প্রবণতা। অর্থের

যাথাযথ্য যদি গদ্যের সর্বাধিক অভীপ্সিত আদর্শ হয়ে থাকে, ওই পথেই সেই আদর্শসিদ্ধির পথে পৌঁছনো যাবে, অন্য পথে নয়। কেন না, ইংরেজীতে বাক্যগঠনের একটা বৈজ্ঞানিক মান নিরূপিত হয়ে গেছে। বাংলায় এখন পর্যন্ত তেমন কিছু হয় নি। ইংরেজীর কাছ থেকে এ বিষয়ে পাঠ নিলে আমাদের কল্যাণ বই অকল্যাণ হবে না। ইংরেজী সাহিত্যেও বৈজ্ঞানিক ভাষাভঙ্গি একদিনে গড়ে ওঠে নি, দীর্ঘকালীন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছনো গেছে এবং এখনও বিবর্তন চলছে। আজকের ইংরেজী গদ্যের চেহারা আর উনিশ শতকীয় ইংরেজী গদ্যের চেহারায় আকাশ-পাতাল তফাত। কার্লাইলের জাঁকালো গদ্যের পাশে রাসেলের পরিচ্ছন্ন যুক্তিময় গদ্য অথবা মেরিডিথ কিংবা টমাস হার্ডির উপন্যাসের ভারবহুল গদ্যের পাশে আলডুস্ হাক্সলির উপন্যাসের সুমার্জিত সুকুমার গদ্য যেন দুই বিপরীত ভাষাজগতের স্বাদ-গন্ধ বয়ে আনছে। যাট-সত্তর বছরের সাধনায় ইংরেজী ভাষাশরীরের যদি এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন নিষ্পন্ন হয়ে থাকে তবে বাংলা ভাষাতেই বা কেন তাদৃশ পরিবর্তন সাধন করা যাবে না? হয়তো এ ব্যাপারে ইংরেজীর তুলনায় আমাদের বেশী সময় লাগবে। কিন্তু তাতে বাঞ্ছিত পরিবর্তনপ্রয়াসে হাত দিতে বাধা কোথায়? বরং বাংলা গদ্যের আড়ম্বরপ্রিয়তা কাব্যাচ্ছন্নতা যুক্তিভার-অসহতা বিচার করলে এ বিষয়ে আমাদের অগৌণে অগ্রণী হওয়া উচিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষাবিভাগে সর্বাগ্রে সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, অন্যবিধ সংস্কার আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে।

বাংলার প্রবীণ ভাষাবিদ্দের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজী আদর্শ অনুসরণের বিরোধী। তাঁদের যুক্তি এই যে, বাংলা ভাষারীতির একটা নিজস্ব ঢঙ, একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে; ইংরেজীর সংস্পর্শে বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে। ভাষার ক্ষেত্রে এবংবিধ রক্ষণশীলতার অর্থ বোঝা যায় না। ভাষা সকল সময়েই বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রয়োজনতঃ উপকরণ আহরণ করে থাকে, তার ফলে তার সমৃদ্ধিও ঘটে থাকে। ইংরেজীর প্রভাবে বাংলা ভাষার

যদি দৃষ্টিগ্রাহ্য সমুন্নতি ঘটে তবে কেন আমরা সেই উৎসের দ্বার রুদ্ধ করব? তথাকথিত বিজাতীয় ভাষা বলেই কি ইংরেজীর প্রতি এই বিমুখতা? এ কথা বহুবার বহু কথনে পুরনো হয়ে গেলেও পুনরুক্তির যোগ্য যে, শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'বিজাতীয়' বলেই কোন-কিছু অগ্রাহ্য হয় না। তথাকথিত বিজাতীয় প্রভাবের ভিতর মহত্ত্বের অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া গেলে তাকে জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে নেওয়াই পন্থা। যাই হোক, নূতন পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণের অভিযান ভাষাসংস্কার দিয়ে শুরু হোক, বর্তমান নিবন্ধের মাধ্যমে তারই নান্দী আমরা গেয়ে রাখলুম।

জনপ্রিয় সাহিত্য

একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, 'অমুক লেখক খুবই জনপ্রিয়,' 'অমুক লেখকের লেখার চাহিদার অন্ত নেই'। ভাবখানা এই যে, সাহিত্য-কর্মের গুণাগুণ বিচারে পাঠক-সাধারণের ব্যাপক অনুমোদন লাভই হচ্ছে আসল কথা, আর সব বিচার বাহ্য। যে লেখকের রচনার চাহিদা যত বেশী, সেই লেখক শুধুমাত্র সেই নজীরেই যেন সাহিত্যের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন।

বিষয়টি পরীক্ষার যোগ্য। 'জনপ্রিয়তা' বলতে আমরা কী বুঝি, জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হওয়া উচিত কি না, হলেও কতদূর পর্যন্ত সেই আদর্শ আমরা মানব—এ সমস্ত প্রশ্নের বিচার স্বভাবতঃই এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। প্রশ্ন কটি নেড়ে-চেড়ে দেখা যেতে পারে।

প্রথমে জনপ্রিয়তার স্বরূপ-নির্ণয়ের সমস্যা। কোন্ লেখক জনপ্রিয়, আর কোন্ লেখক জনপ্রিয় নন? অধিকসংখ্যক পাঠকের সানুরাগ অনুমোদনের তিলক দ্বারা যে লেখকের ভাগ্য-ভাল দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে চর্চিত, তিনিই কি জনপ্রিয় লেখক? আর, যে লেখকের ভাগ্যে এই ব্যাপক অনুমোদন জুটল না, যাঁর রচনা আগাগোড়া একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল, তিনি কি সেই কারণেই অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন? জনপ্রিয়তার এইরূপ সাদামাঠা, অ-জটিল ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ; কিন্তু মনে হয় সাহিত্য-বিচারে এ-জাতীয় ব্যাখ্যা খাটে না। সাহিত্যক্ষেত্রে 'জনপ্রিয়তা' কথাটি আরও নানা বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেই সম্পর্ক মনে না রেখে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হলে ভুল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় বলে আমাদের ধারণা।

যে যে বিষয়ের সঙ্গে জনপ্রিয়তার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তার মধ্যে শিক্ষা প্রধান। বস্তুতঃ শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অতি নিগূঢ়। যে দেশের শিক্ষাপরিস্থিতি যেমন, সে দেশের সাহিত্যিক পরিস্থিতিও তদ্রূপ হয়ে থাকে; শিক্ষার মান যেখানে নীচু, সাহিত্যের এবং সাহিত্যবিচারের মানও সেখানে নীচু। আবার তার বিপরীতটাও সমান সত্য। তবে এখানে শিক্ষার ব্যাপ্তির চাইতে শিক্ষার গভীরতার উপরই অধিক জোর দেওয়া উচিত। যে দেশের অধিকাংশ লোক লেখাপড়া জানে অথচ যে দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রচলন কম, সে দেশে সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার আশা করা যায়, কিন্তু সেখানকার সাহিত্যানুভূতির মান আশানুরূপ উঁচু না-ও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত স্বতঃই আমাদের মনে পড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ শিক্ষিতের হার খুব বেশী। উপরন্তু সেখানকার অধিবাসীদের কারিগরী বিদ্যার্জনের প্রতি উৎসাহ অতি প্রবল। কিন্তু উচ্চশিক্ষার মান সে দেশে খুব গভীর নয়। উচ্চশিক্ষা বলতে এখানে সেই শিক্ষাই বোঝাচ্ছে যার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বভাবের অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিসমূহের এককালীন সুসমঞ্জস বিকাশ সাধিত হয়। কারিগরী শিক্ষায় কিংবা অন্যান্য বৃত্তিগত শিক্ষায় এ-জাতীয় সুযোগ সামান্যই লভ্য। কেন না, বৃত্তিগত শিক্ষার মূল লক্ষ্য একটা বিশেষ বিষয়ে চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জন, ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু বিকাশসাধন নয়। শেষোক্ত লক্ষ্য একমাত্র কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান (উচ্চতর বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞান নয়), ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির যথাযথ অনুশীলনের দ্বারাই আয়ত্তগম্য হওয়া সম্ভব, কারিগরী শিক্ষায় সে জিনিস আয়ত্ত হয় না। অথচ মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তিগত শিক্ষারই জয়জয়কার। সেখানকার বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই একটা নির্দিষ্ট আবশ্যিক শিক্ষা গ্রহণান্তে কারিগরী বিদ্যার প্রতি ঝোঁকে, উচ্চশিক্ষা কেবলমাত্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।

মার্কিন শিক্ষাপরিস্থিতির এই বৈশিষ্ট্য তদ্দেশীয় সাহিত্যিক পরিস্থিতিকে স্বতঃই প্রভাবিত করেছে। জনশিক্ষার ব্যাপ্তির কারণে সে দেশে প্রতি বৎসর শত শত নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়, কোনও বই জনসাধারণের ভাল

লেগে গেলে সে বই লক্ষ লক্ষ বিক্রি হতে থাকে, মাসে মাসে তার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, অচিরেই সে বই 'বেস্ট-সেলার' আখ্যা লাভ করে মার্কিন সাহিত্য-জগতের অগণিত পুস্তকরাশির ভিতর বিশেষ মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হয়ে পড়ে। পুস্তকের কৌলীন্য সেখানে প্রায়শঃ বিচার হয় পুস্তকের বিক্রয়-সংখ্যার মাপকাঠিতে, পুস্তকের অন্তর্নিহিত গুণের কারণে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের রায়ে কৌলীন্যভূষিত, 'বেস্ট-সেলার'-আখ্যাপ্রাপ্ত কিছু কিছু বই নেড়েচেড়ে দেখবার আমাদের সুযোগ হয়েছে। সাহিত্যরসগ্রহণক্ষমতাকে তার চূড়ান্ত উদারতার সীমায় টেনে নিয়ে গিয়েও আমরা বুঝতে পারি না এ সকল বই কোন্ গুণে মার্কিন জনসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদরের কারণ হয়। যে গ্রন্থে রসসৃষ্টির প্রয়াস নেই, চিন্তার বা ভাবুকতার খোরাক নেই, নেই উচ্চ বা পরিশীলিত কল্পনার কোনরূপ পোষকতা, যা শুধু ঘটনাবলীর কুশলী কিন্তু অলঙ্কাররিক্ত বিবৃতি মাত্র, সে গ্রন্থ কেমন করে ব্যাপক সমাদরলাভে ধন্য হয় আমাদের তা ধারণায় আসে না।

জনপ্রিয় সাহিত্যের এটা হল চূড়ান্ত বিসদৃশ রূপ। এই অত্যধিক জনপ্রিয়তার দ্বারা সাহিত্যের মান উর্ধ্বগামী না হয়ে ক্রমশঃ বরং অধোগামী হতে থাকে। সকল সাহিত্যেরই এই বিসদৃশ অবস্থার কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের সাহিত্যের পরিস্থিতি অবশ্য অতটা বিসদৃশ নয়, তা বলে তার সাম্প্রতিক গতি-প্রবণতা দেখে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়াও চলে না। অন্ততঃ এটা তো স্পষ্টই চোখে পড়ছে, সাহিত্যের স্বকীয় মূল্যকে পিছনে ফেলে রেখে তথাকথিত জনপ্রিয়তার আদর্শ ক্রমেই বাংলা সাহিত্যে প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করছে। ঠিক মার্কিনী জনপ্রিয়তার নমুনা হয়তো একে বলা চলে না, কিন্তু সেই দিকেই যে সাধারণের রুচির মোড় ফিরছে এই লক্ষণ অতি স্পষ্ট। এতে আশঙ্কিত হবার কারণ আছে। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার নগণ্য, ব্রিটিশ-শাসনে নানা কারণে আমাদের লোকশিক্ষা

ব্যাহত হয়েছিল, তার জের আজও আমাদের বয়ে চলতে হচ্ছে। এটা মস্ত বড ক্ষতি সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ক্ষতির পিঠে আমাদের জাতীয় চেতনার ভাণ্ডারে একটা লাভের অঙ্ক বরাবর ছিল। সেটি এই যে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের ভিতর সাধারণবুদ্ধি (common sense) বিস্ময়কর এবং রসবোধ সহজাত। আমাদের সাধারণ জনগণের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানের বিস্তার না থাকতে পারে, এমন কি সেই অধিবাসী-সংখ্যার মোটা অংশের ভিতর অনক্ষরতার অভিশাপ আজও বদ্ধমূল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিসদৃশ অবস্থার মধ্যেই সাধারণ জনতার প্রতীক এদেশীয় যে-কোন ব্যক্তিমানুষ অত্যাশ্চর্যরূপে সহজ প্রজ্ঞার অধিকারী। একটা প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব অত সহজে বিনষ্ট হয় না, আমাদের দেশে হয়ও নি। ভারতের জনমানস ক্ষীণভাবে হলেও সুনিশ্চিতভাবে বহু প্রাচীন গৌরবের সংস্কার আজও নিজের ভিতর বহন করে চলেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সংস্কারগুলির মধ্যে আছে সহজ রসবোধ, সৌন্দর্যপিপাসা, দার্শনিক ভাবুকতা, যে-কোন বস্তু বা বিষয়ের বহিরঙ্গ ভেদ করে তার অন্তরস্থ সারগ্রহণের ক্ষমতা। এই সকল বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্য-প্রভাবে জাতীয় চেতনার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, অনক্ষরতার মালিন্য তার উপর সামান্যই দাগ কাটতে পারে। সত্য বটে অনক্ষরতার দ্বারা ভারতীয় সাধারণ মানুষের বৈষয়িক জীবন পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, আধুনিক জীবনাদর্শ কিংবা আধুনিক জীবনযাত্রাপদ্ধতির সঙ্গে সে পুরোপুরি খাপ খেয়ে চলতে পারে নি, তার মানসিক কৌতূহল এর দ্বারা বহুগুণে খর্বতাপ্রাপ্ত হয়েছে,— কিন্তু কিছুই তার সহজ জ্ঞানের সংস্কারকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। এটা আত্মপ্রসাদের কথা নয়, ঐতিহাসিক তথ্যের কথা। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্করহিত অনক্ষর কিংবা সামান্য অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন একজন সাধারণ ভারতীয় প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ কৃষকের সঙ্গে আলাপ করে দেখুন, তার সহজ জ্ঞানগর্ভতায় আপনি অবাক্ হয়ে যাবেন। তার সহজ রসবোধের মুখোমুখি হয়ে আপনি শিক্ষিত শহুরে মানুষ স্বীয় চিত্তদৈন্য সম্পর্কে অগোণে অস্বস্তিকর-রূপে সচেতন হয়ে উঠবেন। সাধারণ ভারতবাসী অনক্ষর হতে পারে, তাই

বলে অগভীর নয়। জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি কোনও একরকম করে তলিয়ে বোঝবার ক্ষমতা সে রাখে।

সাধারণ ভারতবাসীর এই সহজ জ্ঞানের সংস্কার তাকে শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে বরাবর গভীরত্বের অভিমুখী করে তুলেছে, বাইরের চটক দেখে সে কখনও ভোলে নি। মধ্যযুগীয় সাধকদের ভাবসমৃদ্ধ সহজ বাণী, তুলসী-রামায়ণের সরল সৌন্দর্যমণ্ডিত অপূর্ব অর্থান্বিত দোঁহা, চৈতন্য-চরিতামৃতের ভাবগাম্ভীর্য, বাংলা বৈষ্ণব ও মঙ্গল-কাব্যগুলির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব, কীর্তন ও বাউলের রসঘনতা, নটরাজ মূর্তির ধ্যানময় রূপ কিংবা মন্দিরগাত্রে খোদিত অসংখ্য মূর্তিচিত্রের তাৎপর্যময়তা, ইলোরা-অজন্তার চিত্রাবলীর শান্ত সৌন্দর্য—এগুলির অনুধাবন ও রসগ্রহণ খুব সহজ কাজ নয়। অথচ যাদের আমরা আজকের মানদণ্ডে অশিক্ষিত মূর্খ বলি তারাই ছিল এই সকল শিল্পসৃষ্টির প্রকৃত সমজদার। ভারতীয় সংস্কৃতির দীর্ঘকাল-বাহিত প্রভাবের বশে অতি দুরূহ তত্ত্বের অর্থও তারা কোন একরকম করে বুঝত; যে সৌন্দর্য অনুধাবনে বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন হয় বিশেষ শিক্ষা এবং অভ্যাস ব্যতিরেকেই সে সৌন্দর্য তাদের মোটামুটি অধিগম্য ছিল। শিক্ষা আর অভ্যাসের অভাব তারা সহজবুদ্ধির দ্বারা পূরণ করত।

ভারতীয় চেতনার অঙ্গীভূত এই সহজজ্ঞানের সংস্কার শিল্পসাহিত্যের মূল্যায়নে এই সেদিনও আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। বস্তুর বা বিষয়ের বহিরঙ্গের চটক দ্বারা ভারতীয় মনকে বিভ্রান্ত করা কিছুদিন আগে পর্যন্ত কঠিন ছিল। দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আজিও বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ; কিন্তু তা সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির রসগ্রহণে তেমন বাধা হতে পারে নি, তার কারণ দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের বশে শিল্প-সাহিত্যাদর্শের একটা উচ্চমান সেদিন অবধি ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে সজীব ছিল। অক্ষরজ্ঞানের অভাব সহজজ্ঞানের দ্বারা পূরণ হয়েছে। ভারতীয় মানসের অভ্যস্ত ভাবুকতা, চিন্তাপ্রবণতা সাহিত্যরসপিপাসুর রসপিপাসা নিবারণে সবিশেষ সহায়ক হয়েছে। আমরা যারা শহরে বাস করি তারা

শিক্ষার গর্ব করি, মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির খাত-বেয়ে-আসা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির গর্ব করি ; কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, শিল্প-সাহিত্যের মূল্যায়নে আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শের দ্বারাই মুখ্যাংশে চালিত এবং সে আদর্শের অনেকখানিই সংস্কারার্জিত। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা থেকে আমরা অনেক নূতন নূতন ভাব আত্মসাৎ করেছি, আধুনিক হবার তাগিদে তাদের জীবনদর্শন স্বকীয় করে তোলবার চেষ্টা করেছি, হয়তো আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের জীবনযাত্রার আদর্শকেও নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে তুলেছি ; কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে, আমাদের রসগ্রহণের মান কিঞ্চিৎ আলাদা। সেখানে আমরা পরমুখাপেক্ষী নই, উত্তরাধিকারসমৃদ্ধ জাতীয় চেতনাই এ বিষয়ে আমাদের প্রধান নিয়ন্তা।

কিন্তু হালে এই অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির মূল্যনিরূপণে সহজজ্ঞানের সংস্কার ত্যাগ করে আমরা মার্কিন জনপ্রিয়তার আদর্শ অনুসরণে বড় বেশী উঠে-পড়ে লেগেছি। তা যদি না হয়, তবে সস্তা চটুল সারবিহীন সাহিত্যের কাটতি দিন দিনই বেড়ে চলেছে কী কারণে! জনমানসের উপর সৎসাহিত্যের প্রভাব খর্ব হয়ে চমক-লাগানো (**sensational**) ও চটকদার (**spectacular**) সাহিত্যের প্রভাব বর্ধমান হচ্ছে কেন! সাহিত্যক্ষেত্রে নিষ্ঠার আন্তরিকতার সততার দাম কমে আসতে শুরু করেছে, তার জায়গায় আশু-সাফল্যের বিজয়কেতন সগর্বে উড়ছে। মার্কিন মুলুকের ন্যায় আজকাল আমাদের দেশেও গ্রন্থের স্বকীয় মূল্যের দ্বারা গ্রন্থের বিচার হয় না, পরন্তু প্রচারবাহুল্যের দ্বারা গ্রন্থের মূল্য স্থিরীকৃত হয়। যে বই যত বেশী সংস্করণ-সংখ্যার গৌরব করতে পারে, সে বইয়ের মর্যাদা তত বেশী। অন্তঃসারশূন্য সাহিত্যসৃষ্টিতে দেশ ভরে উঠবার উপক্রম হয়েছে।

বলা হবে, বই ভাল না হলে লোকে সে বই অধিক সংখ্যায় কিনবে কেন, সুতরাং পুস্তকের উৎকর্ষনির্ণয়ে বিক্রয়সংখ্যার আধিক্যের প্রশ্নটি কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। এ কথায় সায় দেওয়া যায় না। গ্রন্থের মূল্যবিচারে

বিক্রয়সংখ্যা বড় কথা নয়, পাঠকসাধারণ কী মনোভাব নিয়ে বই কেনে সেইটিই আসল। এমন যদি হয় যে, পাঠকসাধারণ অগভীর বিষয় ছাড়া কিছু পড়তে ভালবাসে না, রচনার কলাকারু আর ভাষারীতির উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করে না, শুধু জীবনের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত আর সাদামাঠা একটা গল্প পেলেই খুশী থাকে, রচনাব ভিতর স্বীয় স্বভাবের তারল্যের কিংবা রুচির স্থূলতার সমর্থন দেখতে পেলে অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়ে ওঠে, সেই ক্ষেত্রে তাদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর মূল্য আরোপ করা যায় না। তদুপরি সমাজে সেই শ্রেণীর হাতেই যদি ক্রয়-ক্ষমতা বেশী থাকে যাদের সাহিত্যবোধ দুর্বল, রুচি স্থূল, তবে তো বিপত্তির চরম। ভাবে লক্ষণে মনে হয় এ জাতীয় বিপত্তির দ্বারা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য কবলিত হবার উপক্রম হয়েছে। লোকে যেমনভাবে খেলোয়াড় আর সিনেমা-তারকাদের নিয়ে মাতামাতি করে, কিছু সংখ্যক 'জনপ্রিয়' গ্রন্থকার সম্পর্কে পাঠক-মহলের মনোভাব প্রায় তদ্রূপ হয়ে উঠেছে। প্রকাশকবৃন্দ পাঠকসাধারণের এই রুচির নিম্নগামিতায় সায় দিয়ে চলেছেন, তাতে অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। প্রকাশকবৃন্দের ভিতর অধিকাংশই হলেন ব্যবসায়ী, সাহিত্যের কল্যাণের বড় একটা ধার তাঁরা ধাবেন না। সৎসাহিত্যের প্রচার যদিও তাঁদের কর্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ, ব্যবসায়িক সাফল্যের নীতির প্রতি আভূমি নত হতে গিয়ে সে কর্তব্য তাঁরা বহুদিন শিকায় তুলে রেখেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্যে গ্রন্থের এত প্রচার ছিল না, কিন্তু সৎসাহিত্যের প্রচার ছিল। তৎকালীন লেখক, প্রকাশক এবং সাময়িক-পত্রের সম্পাদকবৃন্দ সাহিত্যকে কেবলমাত্র জনবিনোদনের উপায় জ্ঞান করতেন না, পরন্তু বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণের পরিপোষক জ্ঞান করতেন। জাতিগঠনে, জাতীয় রুচির পরিশীলনে, জাতীয় আচার-আচরণ ও সদ্ধর্মের পরিবর্ধনে শিল্প-সাহিত্যের যে একটা বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা আছে এই নীতি তাঁরা মানতেন এবং সেইভাবেই তখনকাঁর সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হত। তারপর ধীরে ধীরে অবশ্য অবস্থার অবনতি হয়েছে, তবে কিছুদিন আগে পর্যন্তও বাংলার সাহিত্যজীবনে এই নীতির

প্রাধান্য ছিল, এ আমাদের নিজেদের কৈশোর-যৌবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। এখনকার তুলনায় আমাদের কৈশোর ও যৌবনে গ্রন্থের সংখ্যা অনেক কম ছিল, আজকালকার মত সে সময় মাসিকপত্রেরও এত ছড়াছড়ি ছিল না; কিন্তু দেশের ভাবজীবনের ভিতর সুনিশ্চিত একটা উৎকর্ষের আদর্শ বিদ্যমান ছিল। আমাদের যৌবনে সস্তা খেলো সাহিত্য কাকে বলে আমরা জানতাম না। তখন বুদ্ধি অপরিণত ছিল, অনেক গভীর বিষয়েরই যথার্থ মর্মগ্রহণ আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অসম্ভব ছিল, কিন্তু সেই অপরিণত বুদ্ধির সম্বল নিয়েই কেমন করে যেন আমরা কেবলমাত্র সৎসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন, ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র—বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত বাংলা সাহিত্যের এই বিভিন্ন দিক্‌পালদের রচনা আশ্রয় করে আমরা অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছি। আজকালকার তরুণ সাহিত্যপ্রয়াসীদের মত ভূমিষ্ঠ হবামাত্রই 'আধুনিক' সাহিত্যের পিছনে আদাজল খেয়ে লাগি নি। আধুনিক সাহিত্যকে নিন্দা করবার মনোভাব থেকে এ কথা বলছি না, বলছি শুধু এইটি বোঝাতে যে, ঐতিহ্যজ্ঞানবিরহিত সাহিত্যসৃষ্টি কোন সময়েই সুফলের কারক হতে পারে না, উল্টো তার ফলে আগাছারই সৃষ্টি হয়, যেমন আজকাল প্রায়শঃ হচ্ছে। তথাকথিত জনপ্রিয়তার ফোঁটাতিলক কপালে চড়িয়ে কত অসার গল্প যে সাহিত্যের অসতর্ক প্রহরা উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই।

আমার মনে হয় 'যুগপ্রভাব' (spirit of the times) কথার উপর আপাততঃ অতিরিক্ত ঝোঁক আরোপিত হওয়ার জন্যই সাহিত্যে এ রকম বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হতে পেরেছে। কিছুদিন আগেও বাংলার সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় যুগ-প্রভাবের আদর্শের এমন জয়জয়কার ছিল না। যুগপ্রভাব অবশ্য মান্য, তাতে সন্দেহ কি। সাম্প্রতিক কালের পরিধির ভিতর বেঁচে থেকে আমরা অসাম্প্রতিক সাহিত্যের চর্চা করব এ হতে পারে না। আমরা আধুনিক*; সুতরাং

আমাদের সাহিত্যও আধুনিক। কিন্তু এই নজীরে ঐতিহ্যের প্রতি পিঠ দিয়ে থাকার অর্থ হয় না। যে আধুনিক সাহিত্য দেশের ধারাবাহিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় সে আধুনিক সাহিত্য অশ্রদ্ধেয়। সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, তাঁর সাহিত্যানুশীলনের পক্ষে যুগপ্রভাবের চেতনাই যথেষ্ট, ঐতিহ্য-চেতনা কিছু নয়, তা হলে বলতে হয় তিনি এক মস্ত ভ্রান্তির স্বর্গে বিরাজ করছেন। তেমন লেখকের কলম থেকে সস্তা আর সারবিহীন সাহিত্যেরই শুধু জন্ম হতে পারে, সংসাহিত্য কদাচ নয়।

বাংলা সাহিত্যের জনৈক খ্যাতনামা আধুনিক লেখক তাঁর কোন ইংরেজী সমালোচনা-গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, **'Popularity is malodorous'**, অর্থাৎ কিনা জনপ্রিয়তা বস্তুটি দুর্গন্ধবাহী। লেখকের মতে, যে গ্রন্থ জনপ্রিয় তার উৎকর্ষ সম্পর্কে সেই মুহূর্তেই কিছু-না-কিছু সন্দেহ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এই যুক্তি অনুসরণ করে জনপ্রিয়তার নজীরে তিনি শরৎ-সাহিত্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রতি লেখকের বিরূপতার যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি না, তবে শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে উল্লিখিত মন্তব্যটিকে যদি সাধারণভাবে বিচার করা যায়, তার সারবত্তা কতকটা মানতেই হয়। অন্ততঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনেক রচনা সম্পর্কে মন্তব্যটি যে বিশেষভাবে প্রযোজ্য সে তো অতি প্রত্যক্ষ।

আসলে খোদ্ জনপ্রিয়তা বস্তুটি খারাপ নয়, জনপ্রিয়তা মাত্রই আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য নয়। যে জনপ্রিয়তার আদর্শের পিছনে জাতীয় ঐতিহ্য-চেতনায় পুষ্ট গণ-মানসের ব্যাপক সমর্থন আছে, জাতির সনাতন ধ্যান-ধারণা, রুচি ও বিশ্বাস যে জনপ্রিয়তার ভিতর সার্থক রূপ পেয়েছে, তেমন জনপ্রিয়তাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখব আমাদের সাধ্য কি! কিন্তু যে জনপ্রিয়তা ভুঁইফোঁড়, যে জনপ্রিয়তার করণ-কারণের সঙ্গে সস্তা মার্কিনী রীতিপদ্ধতির অস্বস্তিকর সাদৃশ্য চোখে পড়ে, তেমন জনপ্রিয়তাকে আমরা সন্দেহের চক্ষে না দেখেই পারি না। সাহিত্যের মূল্যবিচারে আমরা বিদেশী

রুচির মুখে ঝাল খেতে আদৌ রাজী নই, এ বিষয়ে জাতীয় রুচিই আমাদের পথপ্রদর্শক। আমাদের আদর্শ সাহিত্য হচ্ছে রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য ও নাটক, বিভিন্ন পুরাণ ও সংহিতা ও লোকগাথা, সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, গোটা উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্য এবং এ যুগের প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র এবং তাঁদের রচনার ধারাবাহী শক্তিলক্ষণাক্ত পরবর্তী সাহিত্য। আধুনিক বাংলার যে সাহিত্যপ্রয়াস এ-দেশীয় সাহিত্যের এই ক্রমবিন্যস্ত ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সহিত সঙ্গতিযুক্ত নয় তাকে আমরা বীতস্পৃহার চক্ষে দেখতে বাধ্য। আমরা বিশুদ্ধ সাহিত্যই রচনা করি আর সমাজ-সচেতন গণতান্ত্রিক সাহিত্যই রচনা করি, এই কথাটি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার, সৎসাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে জাতীয় রীতিনীতির জ্ঞান, মাতৃভাষার সম্যক্ জ্ঞান অপরিহার্য এবং এ দুটির কোনটিই ঐতিহ্যজ্ঞান ব্যতিরেকে অধিগম্য হয় না। বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে যিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন-না কেন, শুদ্ধমাত্র সেই পুঁজির উপর নির্ভর করে জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। 'জাতীয়' কথাটা আজকাল প্রগতিবানদের চোখে suspect, সন্দেহের স্থল, সুতরাং সে প্রসঙ্গ না হয় বাদ দেওয়া গেল, সাধারণভাবেই বলতে পারি যে, স্বীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য ও ভাষারীতির সঙ্গে সম্যক্ ঘনিষ্ঠতা ব্যতিরেকে কোন রকম উৎকৃষ্ট সাহিত্যেরই জন্মদান সম্ভব নয়। বিদেশী ভাষা, সাহিত্য, ভাবধারার জ্ঞান অগ্রাহ্য তা বলি না, বরং তাব বিপরীত, তবে স্বসাহিত্য আর স্বভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনেই শুধু এই জ্ঞানের সার্থকতা। যে বিদেশী জ্ঞান দেশীয় সাহিত্য-চেতনার সহিত সংযুক্ত নয়, স্বসাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে নিয়োজিত নয়, কেবলমাত্র স্বীয় সীমাবদ্ধ পুঁজির উপর নির্ভর করে সাহিত্যরচনায় ব্রতী, সে জ্ঞান অসার্থক, তজ্জাত সাহিত্যকর্মও সমান বন্ধ্যা।

অথচ তথাকথিত জনপ্রিয়তার মোহে সাম্প্রতিক বাংলার কিছু কিছু লেখক আজকাল এই ধরনের অসার্থক আদর্শকেই বরণ করে নিয়েছেন বলে মনে হয়। কলেজ-পড়ুয়া যুবক সম্প্রদায়ের একাংশের কাছ থেকে হাততালি

পাবার দুর্নিবার তাগিদে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের অভ্যস্ত রীতিনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করে একেবারে ষোল-আনা বিদেশী আত্মপ্রকাশভঙ্গির দ্বারস্থ হয়েছেন। এর ফল বাংলা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না। পাঠকদের মধ্যে যাঁদের বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান আছে অথচ যাঁরা জাতীয় কল্যাণাদর্শে বিশ্বাসী, তাঁরা এই সকল রচনাপ্রয়াসের প্রেরণার উৎসস্থলের সন্ধান রাখেন, তাঁদের পরিবেশিত ভাবধারা বুঝতেও পারেন, কিন্তু মাতৃভাষার পরিপ্রেক্ষিতে কোনক্রমেই সে সব সৃষ্টিকে মর্যাদার আসন দিতে রাজী নন। তাঁদের এই বিমুখতার কারণ বোধ্য এবং সমর্থনের যোগ্য। চটুলমনা তরুণদের দ্বারা সাহিত্যের রুচি নির্ণীত হলে সে বড় ভয়ের কথা।

অন্যপক্ষে আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁরা জাতীয় সংস্কৃতিরও তোয়াক্কা রাখেন না, বিদেশী ভাবধারারও ধার ধারেন না, তাঁরা জাতীয় জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটিসমূহের উপর সাহিত্যের খোলস চড়িয়ে রচনা পরিবেশনে তৎপর। এঁদের রচনায় না আছে বস্তুজ্ঞানের পরিচয়, না বা ভাষাজ্ঞানের। আর শোভনতা আর শালীনতার বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। অথচ আশ্চর্য, দেশে এঁদের রচনার পোষকতার অভাব নেই। আজকাল শিল্পপ্রসারের কল্যাণে দেশে এক শ্রেণীর সঙ্গতিবান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা জীবনযাত্রায় বিদেশী রীতিনীতি অনুসরণের পক্ষপাতী এবং আধুনিকতার বাতিকগ্রস্ত। এই-সব ধনিক-বণিকশ্রেণীর লোক সাহিত্যপ্রীতিকে একটা ফ্যাশান বলে মনে করেন এবং নিজেদের কৌলীন্যবৃদ্ধির উপায় হিসাবে সাহিত্যের প্রতি উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন।

সাহিত্যের প্রতি ধনিক-বণিকের এই উৎসাহশীলতায় আশঙ্কার কারণ ছিল না, যদি দেখা যেত তাঁরা জাতীয় সংস্কৃতির আদর্শে আস্থাবান এবং প্রধানতঃ ওই মনোভাবের কারণে সাহিত্যকে আনুকূল্যদানে প্রয়াসী। সেই ক্ষেত্রে তাঁদের সাহিত্যমনস্কতা আশঙ্কার বস্তু না হয়ে বরং সাগ্রহ অভিনন্দনেরই কারণ হ'ত। কিন্তু তা তো নয়, তাঁরা যে সব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অসার চাকচিক্যের বেদীমূলে মাথা মুড়িয়ে বসে আছেন, জাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ-

গুলিকে আত্মস্থ করবার তাঁদের অবকাশই বা কোথায়, সামর্থ্যই বা কোথায়! সাহিত্যের প্রতি তাঁদের উৎসাহ অন্তরের টানে উপজিত হয় নি, উপজিত হয়েছে তথাকথিত আধুনিকতার প্রতি মোহবশতঃ। শিল্পসাহিত্যের প্রতি উৎসাহ আধুনিকতার একটি লক্ষণ বলে কথিত, প্রধানতঃ এই বিশ্বাসের বশেই তাঁরা শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন অনুমান করা চলে। যেখানে সাহিত্য বিষয়ে এমন তরল মনোভাবের আধিক্য সেখানে ধনিক-বণিকের পোষকতায় কতটুকুই বা সুসার হতে পারে! হয় নি যে তার প্রমাণ তো নিত্যই চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি। সস্তা খেলো সাহিত্যের বেনো জল ঢুকে সাহিত্যের চলমান অনাবিল স্রোত ঘোলাটে হয়ে ওঠবার উপক্রম হয়েছে। সাহিত্যের কল্যাণকামী ব্যক্তি এই অবস্থায় আশঙ্কিত না হয়ে পারেন না।

আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণবিচার

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে পাঠকমহল থেকে অনেক সময় এরকম অভিযোগ শোনা যায় যে, আধুনিক বাংলা গ্রন্থাদিতে রসের একান্ত অভাব, পক্ষান্তরে আধুনিক রচনামাত্রই মননশীলতার দ্বারা অল্পবিস্তর ভারাক্রান্ত। আধুনিক লেখায় হৃদয়সংবেদনকে অতিক্রম করে মননক্রিয়ার প্রভাব প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বড় হয়ে উঠতে দেখা যায়, ফলে লেখা জমে না, বর্ণিত কাহিনী বা বিষয় নীরস বোধ হয়, লেখায় মনঃসংযোগ করতে আয়াসের প্রয়োজন হয়। আয়াস মানেই স্নায়ুর উপর পীড়ন, সুতরাং রচনার সুখপাঠ্যতারূপ সদ্‌গুণ আধুনিক সাহিত্য-জগৎ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। আর, মননশীলতাও যে সব সময় সত্যকার মননশীলতা, তা-ও নয়। প্রায়শঃ ওটি একটি ঠাট। রচনার ভিতর মননশীলতার আমেজ ঢোকাতে না পারলে রচনা প্রগতিশীল বলে গ্রাহ্য হবে না—এই আশঙ্কা থেকে সেই কৃত্রিমতার জন্ম। যেখানে লেখক যথার্থই মননশীল সেখানেও পাঠকের অসুবিধা বড় কম নয়। পরের মননক্রিয়া অনুধাবন বা অনুসরণ করতে হলে নিজেরও খানিকটা মননশীল হওয়া দরকার। অধিকাংশ পাঠকই এ দায় পোয়াতে নারাজ। সাহিত্যকে তাঁরা অবকাশরঞ্জনের উপায়রূপে পেতে চান। সে ক্ষেত্রে তাঁদের উপর যদি শ্রমশীলতার ভার চাপানো হয় তাঁরা তা সইবেন কেন! চিন্তার অনুশীলন তাঁরা চান না, তাঁরা চান আনন্দ। পাঠকমনের এই সহজ আনন্দপ্রিয়তা আধুনিক সাহিত্যের দ্বারা কতদূর পরিতৃপ্ত হয় বা আদৌ পরিতৃপ্ত হয় কি না সেটি ভেবে দেখা দরকার।

অভিযোগটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। অভিযোগটির মধ্যে সত্য কিছু আছে কি না বিশ্লেষণের আলোকে তা ধরা পড়বে।

এ কথা খুবই সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসাদি পাঠ করে আমরা যে আনন্দ পাই আধুনিক সাহিত্যের অন্তর্গত গল্প-উপন্যাসাদি

পড়ে সে আনন্দ পাই না। আধুনিকদের লেখায় ঘটনার প্রাধান্য এত কম এবং সেই অনুপাতে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য এত বেশী যে, লেখার সরসতা প্রতি পদে ব্যাহত হয়ে তাকে অত্যন্ত আয়াসপাঠ্য করে তোলে। পক্ষান্তরে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-সাহিত্যে আয়াসপাঠ্যতা নেই বললেই চলে। তাঁদের রচনায় এমনি একটা সহজ গতিবেগ আর স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি আছে যে, পাঠককে রচনার ক্রম বা ঘটনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করতে মোটে ভাবতে হয় না, পাঠকের অদম্য কৌতূহলই তাঁর মনকে মুদ্রিত অক্ষরের প্রবাহের উপর দিয়ে অবাধে চালিয়ে নিয়ে যায়। তদবস্থায় পাঠক বুঝতেও পারেন না যে তিনি কোন অনুশীলনের কাজে নিরত আছেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য পাঠের বেলায় এই অনুশীলনের কথা প্রতি পদক্ষেপে মনে হয়। মনে না হয়ে উপায় নেই, কারণ আধুনিক সাহিত্যের পাঠক্রিয়া প্রায় সর্বক্ষেত্রে চেষ্টাযুক্ত, অতএব সজ্ঞান।

কিন্তু এখানে একটি কথা আছে। উপরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গল্পোপন্যাসাদির পাঠযোগ্যতা সম্পর্কে যে সকল উক্তি করা হল তাদের যে ত্রুটি স্বরূপেই ধরে নিতে হবে এমন কোন কথা নেই; তাদের আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যরূপেও গণ্য করা যেতে পারে। আধুনিক বাঙালী মানসিকতার বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে উপরিউক্ত লক্ষণগুলিকে বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করা ছাড়া বুঝি গত্যন্তর থাকে না। এ কথা বিশেষ ভাবে বলা দরকার, আজকের দিনের বাঙালী লেখক যে মন নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখছেন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের আমলের বাঙালী মন থেকে তা অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এমন কি, শরৎচন্দ্রের মানসিকতা থেকেও এ মন পৃথক। কালক্রমের দিক থেকে শরৎচন্দ্র আধুনিক গোষ্ঠীর লেখকদের নিকটতম পূর্বাচার্য বটে, কিন্তু যে সকল ধ্যানধারণার দ্বারা শরৎচন্দ্রের মানসিকতা তৈরী হয়েছিল সে সকল ধ্যানধারণা আধুনিক মানদণ্ডে কতকাংশে কালবারিত হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের প্রভাবপরিধিকে পিছনে ফেলে আধুনিক সাহিত্য বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে।

এ রকম হওয়ার একটা প্রধান কারণ, গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ভিতর এমন সমস্ত বিপর্যয়ের আঘাতে বাঙালী মানস আন্দোলিত-উপদ্রুত হয়েছে যা তৎপূর্ববর্তী কালকে কদাপি স্পর্শ করে নি। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উনবিংশ শতাব্দীর প্রসারমান ঔদার্যবাদের আবহাওয়ার দ্বারা পুষ্ট হয়েছেন। জীবনের প্রতি অপরিসীম আশা ও বিশ্বাস তাঁদের অন্তঃপ্রেরণার মূলে নিরন্তর সক্রিয় ছিল। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত আদর্শবাদী। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শেষ জীবনে এই আদর্শবাদের বিপর্যয় বাঙালী জীবনে প্রত্যক্ষ করে গেছেন, কিন্তু যে মন নিয়ে তিনি এই ভাঙন লক্ষ করেছেন সেটি উনিশ শতকীয় ঔদার্যবাদী মন। কবির জীবনলালিত আশাবাদ যুদ্ধপরবর্তী ঘটনাবলীর দ্বারা আহত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর ভিতর মানবজাতির প্রতি বিশ্বাস জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। আর শরৎচন্দ্রের বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি যদিও বিশ শতকের লেখক আর তাঁর বেশির ভাগ ভাল বই-ই প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে প্রকাশিত হয়েছে; তা হলেও এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, মানসিক গঠনের দিক থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথেরই ধারাবাহক। আধুনিক কালোচিত মননলক্ষণ তাঁর রচনায় একপ্রকার অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্রের বেলায় এটা আশীর্বাদই হয়েছে বলতে হবে; কারণ, তিনি যদি এখনকার কালের ছাঁচে তৈরী হতেন আর তাঁর লেখা এ কালের রচনার মত প্রধানতঃ মননলক্ষণাক্রান্ত হত, তা হলে সারা বাংলার চিত্তজয়ী লেখকের শিরোপা তাঁর ভাগ্যে জুটত কিনা সন্দেহ। শরৎচন্দ্র মনস্তাত্ত্বিক লেখক এটা একটা কথার কথা। যাঁরা শরৎচন্দ্রের রচনায় মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য দেখতে পান তাঁরা আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত নন বলেই মনে হয়। আসলে শরৎচন্দ্রও ছিলেন তাঁর পূর্বসূরীদের মত ঘটনাপ্রধান লেখক—এবং আদর্শবাদী লেখক। তিনি সাধারণ দৈনন্দিন জীবন থেকে ঘটনার উপাদান সংগ্রহ করলেও সমাজ-সচেতন বাস্তববাদী লেখক তাঁকে বলা যায় না; মূলতঃ আদর্শবাদীর চোখ দিয়েই তিনি সকল উপাদান লক্ষ ও আহরণ করেছিলেন। তাঁর মন ছিল

অপূর্ব দরদে ভরা। এই সকল বিবিধ বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে তাঁর রচনা এক অদ্ভুত রসরূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের স্টাইলের যে জাদু, সে জাদু ঘটনার বিস্তারে, আদর্শবাদের রূপায়ণে; মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ততটা নয়।

কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী যুগে যে সকল লেখক রচনানিরত আছেন তাঁদের চেহারাই আলাদা। যুদ্ধ এবং যুদ্ধজনিত বিচিত্র সংঘাতের ফলে তাঁদের মন থেকে আশা আর আদর্শবাদ মুছে গেছে। সনাতন মূল্যবোধগুলি সুস্থ জীবন যাপনের পক্ষে অত্যাবশ্যক জেনেও তাঁরা আর তাদের আঁকড়ে ধরে থাকতে পারছেন না; ইতিমধ্যে তাঁদের মনের উপর দিয়ে এমন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে যে, বিশ্বাস আর নিষ্ঠার পুরাতন ভূমিচিহ্নগুলি তাঁদের মনের সীমানা থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম। নৈরাশ্যের দ্বারা তাঁরা সতত পীড়িত; জীবনকে বিশ্বাস করতে, ভালবাসতে প্রতি পদে তাঁদের ভয়, পাছে তার ফলে জীবনকেও হারান, নৈরাশ্যবাদমথিত স্বকীয় মনোবিলাসকেও হারান। আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কেবলি ব্যর্থতা দেখে দেখে সাফল্য কামনা করবার শক্তি তাঁদের অন্তর্হিত হয়েছে। একান্ত করে কিছু চাইতে তাঁদের সহস্র দ্বিধা, পাছে ওই চাওয়ার দ্বারা তাঁরা তাঁদের জীবন-বিধাতার কাছে মস্ত অপরাধ করে ফেলেন। ক্রমাগত নৈরাশ্য আর অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় লালিত হওয়ার দরুন যুদ্ধোত্তর মানুষের মনে এক ধরনের অপরাধচেতনা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। অপরাধ না করেও তাঁদের মনে হয় তাঁরা অপরাধী; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের চেতনাকে স্ফীতায়িত করে তাঁরা জীবন থেকে স্বস্তি-সুখ মুছে ফেলেছেন। সৌন্দর্যের প্রতি স্পৃহা আছে, কিন্তু জোর করে সৌন্দর্যের দিকে পিঠ দিয়ে রাখা হয়েছে। অসৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণবশতঃ মোটেই নয়, পক্ষান্তরে নিজেকে পীড়ন করবার অসুস্থ উত্তেজনায় হতাশা-কবলিত আধুনিক মানুষ কুশ্রীতাকে জীবনের সহচর করেছেন। আত্মপীড়নের মধ্যে যেমন বেদনা আছে তেমনি এক প্রকার সুখও আছে।

এমন যে অবস্থা এর মধ্যে আদর্শবাদ টিঁকে থাকতে পারে না। আর আদর্শবাদ শিথিল হওয়া মানেই হল মানুষের আবেগজীবনের পরিধি সঙ্কুচিত

হওয়া এবং সেই অনুপাতে চিন্তাপ্রবণতার অভ্যাস বিস্মৃত হওয়া। স্কেপটিসিজমই বলুন আর সিনিসিজমই বলুন, মানুষকে তা সহজ আনন্দের স্বাদ ভুলিয়ে দেয়। সিনিক মন চিন্তাকুলতার দ্বারা সতত পীড়িত এবং সেই কারণে অন্তর্মুখী। ক্রমাগত বেদনার আর ব্যর্থতার আঘাতে তার স্ফূর্তি নষ্ট হয়েছে, পরন্তু ভাবুকতা আর চিন্তাপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা তার নেই, আনন্দকে সে চেয়েও পায় না। অভিমানবশতঃ বিষাদকেই সে আপনার বলে জেনে নিয়েছে। বিষাদেই তার বিলাস, আর তদনুপাতে আনন্দের প্রতি চেষ্টাসঞ্জাত বিতৃষ্ণা। সিনিক মনের ধারণা, আনন্দ হাসি গান প্রভৃতি সুস্থ প্রাণের লক্ষণগুলি চটুল ব্যাপার; চটুলতার মধ্যে সিনিক মানুষ নেই। সিনিক মানুষ আশ্চর্য সীরিয়স্। বয়সোচিত যৌবনধর্মে তাঁর আস্থা নেই; জন্মাবধি তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ। বয়স কাঁচা হলেও চিন্তা করতে করতে তাঁর মন পেকে গেছে। এমন লোকের নিকট পারিপার্শ্বিক জীবন ও প্রকৃতির কোন আকর্ষণ নেই, নিজেকে আর নিজের মনকে নিয়েই তিনি সমধিক ব্যস্ত। এরূপ অবস্থায় বস্তুজগৎ সম্বন্ধে অচেতনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা অপরিহার্য।

সমাজে যখন এইরকম অবস্থা দেখা দেয়, সাহিত্য থেকে আনন্দ অন্তর্হিত হয়। সাহিত্য তখন হয়ে পড়ে মূলতঃ মনস্তত্ত্বপ্রধান, চিন্তান্বিত, মনোনিবদ্ধ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও হয়েছে সেই দশা। আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে রস-রসিকতা অন্তর্ধান করেছে; তার জায়গা জুড়ে বসেছে মননশীলতা। কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্তই মননশীলতার ঠাট। অবশ্য হাল আমলের সকলের লেখাই যে রসিকতাবর্জিত এমন বললে ভুল বলা হবে, তবে মোটামুটি ভাবে এইটেকে আধুনিক সাহিত্যের একটা লক্ষণ মনে করা যেতে পারে। বস্তুজগৎ থেকে আধুনিক লেখকেরা দৃষ্টি গুটিয়ে এনেছেন বলে তাঁদের রচনায় ঘটনার সমারোহের একান্ত অসদ্ভাব, তাঁরা সেই শূন্য স্থান পূরণ করেছেন নিজের এবং অপরের অন্তর্জীবনের চিত্রায়ণ দ্বারা। বহির্জগৎ থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহৃত হয়েছে বলে মনের গহনে তা প্রসারিত হয়েছে। আত্মবিশ্লেষণ আর অপরের মনোবিশ্লেষণে আধুনিক সাহিত্য ভারাক্রান্ত।

আধুনিক সাহিত্যের এই যে লক্ষণ, এর ভালমন্দের চুলচেরা বিচার ভিন্ন উপলক্ষে করা যাবে। আপাততঃ কথা হচ্ছে, বিশ শতকের প্রথম দুই দশক উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাঙালী সমাজ-জীবন নানাদিক থেকে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তাতে বাঙালী লেখক সম্প্রদায়ের মনের গড়ন বদলে গেছে। আর শুধু বাঙালী লেখকই বা কেন, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধোত্তর সাহিত্যিককুল একই সমস্যার দ্বারা পীড়িত। তাঁদের জীবনে আশা গুঁড়িয়ে গেছে, সুতরাং সাহিত্যেও আশা বেঁচে নেই। আশা নেই, সুতরাং আনন্দও নেই। চলতি কথায় আমরা যাকে বৈঠকী আবহাওয়া বলি সে জিনিস বহুদিন হল আমাদেব সমাজ থেকে লোপ পেয়েছে। ফলে সাহিত্যেও সে ভাবটুকু আর নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সমাজে বড় বড় চিন্তার আন্দোলন জন্ম নিয়েছে সত্য, কিন্তু তার পাশে পাশে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে চলেছে বৈঠকী গালগল্পের স্রোত। একদিকে সমাজনেতারা দেশের ও ব্যক্তিজীবনের উন্নতির চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে সামাজিক বৈঠক মজলিশ আদিতে আলাপ-আলোচনা গালগল্পের মধ্য দিয়ে লঘু পরিহাসতারল্যের স্রোত বইয়ে দিয়েছেন। সর্বব্যাপী সরসতার আবহাওয়ার মধ্যে নবজাগৃতির আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হয় নি এই জন্যে যে, তখন অনেকেরই জীবনে অনর্জিত সম্পদের সুযোগ-সুবিধা ছিল। যে অর্থকৃচ্ছ্রতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে পদে পদে খণ্ডিত করে আজকের তুলনায় তার পরিসর তখন নিতান্তই ছিল সংকুচিত। অনর্জিত সম্পদজনিত নিরুদ্বেগ যেখানে সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য স্তরে বিশেষভাবে বিদ্যমান, সেখানে চিত্তের স্ফূর্তি খুব গুরুতর কারণ ব্যতিরেকে ম্লান হতে পারে না। কিন্তু আজকের সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। সমাজদেহে অর্থকৃচ্ছ্রতার অভিশাপ আজ একান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষের মন নামক বস্তুটি প্রচণ্ড অর্থকৃচ্ছ্রতার ভারে নুইয়ে-নেতিয়ে পড়েছে। হাসিখুশি, গালগল্প সমাজজীবন থেকে অন্তর্হিত হবার উপক্রম। শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ শ্রীমতী রাণী চন্দের বাচনিক 'ঘরোয়া' বইতে বলেছেন, আজকের মানুষের মনে শখ নেই, সব-কিছুর মধ্যেই আজ লোকে 'শিক্ষা' খোঁজে। ছেলেদের গল্প,

তাতেও শিক্ষার গন্ধ না থাকলে চলে না। এ রকম হবার কারণ এই যে, আজকের দিনের মানুষের জীবন নানা গুরুতর সমস্যার দ্বারা পীড়িত, ব্যতিব্যস্ত। শৌখীন হবার ইচ্ছা থাকলেও সেই ইচ্ছার পরিতৃপ্তির সুযোগ এ সমাজে অনুপস্থিত। ফলে মানুষের গুরুগম্ভীর না হয়ে উপায় নেই, সাহিত্যের মধ্যেও তাই গাম্ভীর্যেরই প্রাধান্য। সাহিত্য যে ক্রমশঃ প্রচারমূলক বা 'শিক্ষা'-মূলক হচ্ছে এই কারণের মধ্যেই তার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে। তার ওপর এসেছে পশ্চিম থেকে নূতন নূতন মননপ্রধান ভাবপ্রবাহ—প্রগতিশীল আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত নূতন নূতন চিন্তার আন্দোলন। বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক অনৈশ্চিত্য ও নানা বিক্ষোভ-সংক্ষোভ এই সকল ভাবপ্রবাহকে ক্রমেই জনমনে দৃঢ়প্রোথিত করে দিচ্ছে। সংকট যত তীব্র হচ্ছে তত মানুষের চিন্তাপ্রবণতা বাড়ছে। আর যেহেতু শিল্পী-সাহিত্যিকের মন স্বভাবতঃই গ্রহিষ্ণু সেই কারণে তাঁর মনেই যে এই প্রভাব সব চাইতে কার্যকরী হচ্ছে সে কথা না বললেও বোধ হয় চলে।

সুতরাং সব দিক থেকেই আধুনিক শিল্পমানসকে একটি স্বতন্ত্র মানসিকতা বলা চলে। নূতন যুগের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা—যার অধিকাংশই তিক্ত ও আশাভঙ্গকারী—এর গাঢ় কালিমা লেগেছে এই মনের উপর; এ মনকে কোনক্রমেই পুরাতন মানসিকতার সঙ্গে এক করে দেখা চলে না। উনিশ শতকীয় বাঙালী শিল্পিমানস স্বচ্ছন্দ আশাবাদের আবহাওয়ায় লালিত ও পুষ্ট হয়েছে; পক্ষান্তরে, যুদ্ধোত্তর সাহিত্যিকদের মন গড়ে উঠেছে সর্বব্যাপী নৈরাশ্যের আবহাওয়ার মধ্যে। একের দৃষ্টি বহির্মুখী; অপরের অন্তর্মুখী। বহির্মুখীনতা ঘটনাশ্রয়ী; অন্তর্মুখীনতা আত্ম-আশ্রয়ী। আত্ম-আশ্রয়ী সাহিত্য মনস্তাত্ত্বিক ও কতকটা দার্শনিকভাবাপন্ন না হয়ে যায় না। এই কথা যদি মনে রাখি, আধুনিক সাহিত্যের ঘটনাবিমুখতা তথা অতিরিক্ত চিন্তাপ্রবণতাকে আর দোষ বলে স্বীকার করা যায় না; তাদের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

উপরে শুধু প্রথমযুদ্ধপরবর্তী সমাজের অবস্থাটাই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমযুদ্ধপরবর্তী অবস্থার চিত্রণ আংশিক চিত্রণ মাত্র। এর সঙ্গে দুইযুদ্ধমধ্যবর্তী বৎসরগুলির নানাবিধ সংকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশবিভাগ, জাতীয় গবর্নমেণ্টের কুশাসন, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি বিপর্যয়-গুলিকেও হিসাবের মধ্যে লওয়া উচিত। সবগুলি অবস্থা এক সঙ্গে বিচার করলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লক্ষণ-নির্ণয়ে আর ভ্রান্তির অবকাশ থাকে না।

সংবাদ-সাহিত্য

বাংলা দেশে সংবাদপত্রের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার ভিতর একটি নির্দিষ্ট ক্রমপরিণতি ধারা লক্ষ করা যায়। এই পরিণতি দেশের বৃহত্তর রাষ্ট্রিক-সামাজিক অবস্থার ক্রমপরিণতি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ দেশের ভিতর যে সময়ে যে অবস্থা ছিল, অনিবার্য ভাবে সংবাদপত্রের উপর তার প্রতিফলন ঘটেছে এবং তদনুযায়ী সংবাদপত্রের রূপ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ কথা কি দৈনিক, কি সাপ্তাহিক, কি অন্যবিধ সংবাদপত্র সকলের সম্বন্ধেই সমান খাটে। তবে দৈনিক সংবাদপত্র প্রচার ও প্রতিপত্তির দিক থেকে সব চাইতে অগ্রগামী বলে তার ভিতরই ক্রমপরিণতির রূপটুকু সব চেয়ে সুচিহ্নিত ও প্রত্যক্ষ। সংক্ষেপে এই রূপের বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতীয় নেতৃবর্গের নিকট এ দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ভারতবিভাগের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব সাধিত হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার আগে পর্যন্ত বাংলা তথা যে কোন সাধারণ ভারতীয় সংবাদপত্রের রূপ ছিল আন্দোলনমূলক **(agitational)**। অবাঞ্ছিত বিদেশী শাসনের অবসান এবং জাতীয় মুক্তি ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই সারা ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা আবর্তিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে ভারতীয় সংবাদপত্রের দান অনেকখানি। এ দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আনুপূর্বিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হলে দেখা যাবে, এ আন্দোলনের ইতিহাসে ভারতীয় সংবাদপত্র একটি বড় জায়গা জুড়ে আছে—ত্যাগব্রতী দেশকর্মী ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অন্যান্য যোদ্ধাদের তুলনায় এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের দান কোন অংশে ন্যূন নয়। সরকারের ধামা-ধরা মুষ্টিমেয় সংখ্যক ভাড়াটে সংবাদপত্র বাদে স্বাধীনতা-পূর্ব অধ্যায়ে দেশে যত সংবাদপত্র ছিল সব যেন একটি সংবাদপত্রে সংহত হয়ে জাতীয়

মুক্তি-সংগ্রামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। নির্ভীকতায় ও স্পষ্টবাদিতায়, এক সুমহান আদর্শের মর্যাদা রক্ষার জন্য ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারে ও লাঞ্ছনাবরণে ভারতীয় সংবাদপত্র আজ এক গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যের অধিকারী। স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত অবস্থায় এই ঐতিহ্য যাতে রক্ষা পায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

একটু অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভারতীয় সংবাদপত্রের আন্দোলনমূলক অধ্যায়েরও আবার দুটি ভাগ। প্রথম দিকের সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদের অংশ কম ছিল, পক্ষান্তরে প্রতিবাদমূলক রচনাংশের আধিক্য ছিল। বিশেষ বিশেষ অন্যায় ও অবিচারমূলক ঘটনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠের তীব্র প্রতিবাদে তদানীন্তন সংবাদপত্রগুলি মুখর ছিল। 'হিক্‌স বেঙ্গল গেজেট' থেকে শুরু করে 'বেঙ্গল জার্নাল', 'ক্যালকাটা জার্নাল', 'বেঙ্গল গেজেট', পুরাতন পর্যায়ের 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ' এবং তারও পরে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাসমূহকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বিদেশী নীলকরদের অত্যাচার এক সময়ে বাংলার চাষী-জীবনে কী বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল সে কথা সকলেই জানেন। তৎকালীন কতকগুলি পত্রিকার মূল আলোচ্য বিষয়ই ছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং এ বিষয়ে জনমতকে সচেতন করে তোলা। এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলির মধ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে অগ্রগণ্য বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যান্য ধরনের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনেও সে সময়কার অমৃতবাজার পত্রিকা একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সংবাদপত্রের ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র পরিচালনার পুরাতন ধারণা আজ বহুলাংশে বর্জিত। পুরাতন কালের সংবাদপত্রগুলি আক্ষরিক অর্থে সংবাদপত্রই ছিল বটে, তবে পরবর্তী কালের সংবাদপত্রের মত তাদের পরিধি সুবিস্তৃত হতে পারে নি। প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের ঝোঁক গিয়ে পড়ত স্থানীয় ঘটনাদির উপর এবং তাদের কেন্দ্র করেই পত্রিকাগুলির সংবাদ ও মন্তব্য (news & views) মুখ্যতঃ পরিবেশিত হত। তখন সংবাদের

নিজস্ব মূল্য যত না ছিল তার চেয়ে মন্তব্যের খোরাক রূপে তাদের সার্থকতা ছিল বেশী। সংবাদের জন্য সংবাদ নয়, মন্তব্যের জন্যই সংবাদ—এই রকমের একটি সংস্কার প্রথম যুগের প্রায় সকল সংবাদপত্র-পরিচালকের মধ্যে বলবৎ ছিল বলে মনে হয়। পরে অবশ্য এই ধারণার পরিবর্তন হয়। জ্ঞানের প্রসার তথা দৃষ্টির ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে যখন থেকে সংবাদপত্রের পরিধি বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠল তখন থেকে সংবাদ সম্বন্ধীয় পূর্বধারণারও দ্রুত বদল হতে লাগল। সংবাদ পূর্বে যেখানে ছিল মন্তব্যের উপকরণ মাত্র, সে স্থলে সংবাদের নিজস্ব মূল্যের ধারণা গড়ে উঠল এবং বিচিত্র ও ভূরিপরিমাণ সংবাদ পরিবেশনেই যে সংবাদপত্রের আসল সার্থকতা এই সংস্কার সংবাদপত্র জগতে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করল। সেই সঙ্গে মন্তব্য-নিরপেক্ষ ভাবে সংবাদ যাচাই-বাছাইয়ের একটা রেওয়াজও পাঠকসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকল।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের সংবাদপত্রের এইটিকে দ্বিতীয় অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই অধ্যায়েই হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, সঞ্জীবনী, বাংলার কথা, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, নবপর্যায় বন্দেমাতরম, কেশরী, প্রত্যহ, মাতৃভূমি, কৃষক, স্বরাজ, ভারত প্রভৃতি পত্রিকার উদ্ভব। এই সব পত্রিকার মধ্যে অনেকগুলিরই আজ অস্তিত্ব নেই, তবে বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর আজও সগৌরবে তাদের পূর্ব-ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

বাংলা দেশের ইংরেজী দৈনিক পত্রিকাগুলিকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি, তার কারণ দেশের জনসাধারণের বৃহত্তম অংশের ভিতর সংবাদপত্রের প্রভাব বাংলা পত্রপত্রিকাগুলির দ্বারাই প্রধানতঃ নিরূপিত হয়, এ ক্ষেত্রে ইংরেজী পত্রিকাগুলির পোষকতা সামান্য। ইংরেজী পত্রিকাগুলির প্রচার মাত্র শহরের বুদ্ধিজীবী মহলের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, সেই তুলনায় বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিপত্তি অনেক বেশী। বাংলা সংবাদপত্র লোকশিক্ষার একটি প্রধান বাহন। এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতিতে বাংলা সংবাদপত্র যে কত বড় জায়গা জুড়ে আছে তার সঠিক পরিমাপ বোধ করি এখনও হয় নি। সংবাদপত্রে পরিবেশিত সব সংবাদ ও মন্তব্যই যে গ্রাহ্য

এমন কথা বলি না—জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভাল দিক যেমন অনেক আছে তেমনি মন্দ দিকও কিছু কিছু আছে। বিশেষতঃ স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতিতে শেষোক্ত বিষয়ে খুবই সতর্ক হবার কারণ দেখা দিয়েছে। তা হলেও সব জড়িয়ে জনজীবনের উপর সংবাদপত্রের প্রভাব অশেষ হিতকারী। বিশেষ, বাংলা সংবাদপত্রগুলি এই ক্ষেত্রে সবিশেষ কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। দেশের জনজীবনের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সংবাদপত্রের যোগ নিগূঢ়। সর্বাংশে না হলেও মুখ্যাংশে বাঙালী গণজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ, দাবী-দাওয়া বাংলা সংবাদপত্রের দর্পণে প্রতিফলিত। এ ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ও ঝোঁকের তারতম্য থাকতে পারে—থাকাই স্বাভাবিক, সমাজজীবনে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান যেমন শ্রেণীস্বার্থ-নিরপেক্ষ হতে পারে না, তেমনি সংবাদপত্রের পক্ষেও শ্রেণীস্বার্থ-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়, প্রতিটি সংবাদপত্রই কোন-না-কোন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি—তবু এই সহজাত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই বাংলা সংবাদপত্রগুলি যে জনসেবার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা তুলনাহীন। আজ সরকারী স্তরে দেশের সর্বত্র সাধারণ ভাবে লোকশিক্ষার, বিশেষভাবে পূর্ণবয়স্কের শিক্ষার যে তোড়জোড় শুরু হয়েছে, বাংলা সংবাদপত্রগুলির সহায়তা ব্যতিরেকে সে অভিযানের সাফল্য কল্পনা করা যায় না।

এক দিকে বাংলা সংবাদপত্র লোকশিক্ষার সহায়ক, আবার অন্য এক দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা সংবাদপত্র বাংলা সাহিত্যেরও সহায়ক বটে। বাংলা সংবাদপত্র যেন বাংলা সাহিত্যের অগ্রাভিযানের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলবার চেষ্টা করছে এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ধ্যানধারণা ও আদর্শগুলিকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে তুলতে চাইছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য মূলতঃ সহজ, স্বচ্ছন্দ চলতি ভাষার আশ্রয়ী ; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যটিকে সংবাদপত্রের ভাষারীতির অঙ্গীভূত করবার ধীর অথচ সুনিশ্চিত প্রক্রিয়া এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। সংবাদপত্রগুলি জনজীবনের সমতল স্তরে যতই নেমে আসবার চেষ্টা করছে

ততই সেগুলি পুরাতন সাধুভাষার কৃত্রিম, আড়ষ্ট খোলস ত্যাগ করে সহজভাষী হয়ে উঠতে চাইছে। চলতি ভাষার আশ্রয়ে প্রকাশিত রচনাদির দেখা মেলা আজ আর সংবাদপত্র জগতে দৈব সংঘটন নয়; চলতি ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে পুরাতন সংবাদপত্রের কর্তাদের অলিখিত নিষেধাজ্ঞা ক্রমেই শিথিল হতে চলেছে। সাধু ভাষার দুর্গে চলতি ভাষার আক্রমণের প্রথম আভাস আমরা পাই 'প্রত্যহ' নামক অধুনা-লুপ্ত ক্ষুদ্রাবয়ব দৈনিক পত্রিকায়; তারপর 'যুগান্তর' এই সূত্রটিকে বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরেছে। এখন সবগুলি পত্রিকাতেই চলতি ভাষার ছড়াছড়ি। শুধু যে রবিবারের সাময়িকী অর্থাৎ সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রগুলিতেই চলতি ভাষার ব্যবহার চোখে পড়ে তা-ই নয়, সংবাদপত্রের মূল অঙ্গ অর্থাৎ সংবাদ অংশের মধ্যেও চলতি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটছে। 'যুগান্তর' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একাধিক রিপোর্টই আজকাল চলতি ভাষায় লেখা হয় দেখতে পাই। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে এটি যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ আকস্মিক ঘটনা নয়। দেশের পরিবর্তিত রাষ্ট্রিক অবস্থা জনজীবনের অন্য অনেক বিভাগের মত এই বিভাগেও তার সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে সংবাদপত্রের রূপের বদল হয়েছে। এই রূপবদলের প্রক্রিয়াটি একটু সবিস্তারেই বর্ণনা করি।

স্বাধীনতা-পূর্ব অধ্যায়ে স্বতঃই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মূল উপজীব্য ছিল রাজনীতি। সংবাদপত্রের এই অতিরিক্ত রাজনৈতিক মনস্কতার মূলে ছিল আমাদের পরবশতা। বৈদেশিক শাসনের নাগপাশে জর্জরিত ভারতীয় মানসের পক্ষে সে সময় রাষ্ট্রিক মুক্তির উপায় চিন্তা করা ছাড়া আর কোন চিন্তা সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রনৈতিক অধীনতার গ্লানি আমাদের চিন্তা ও কল্পনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ছিল যে আমাদের সমগ্র উদ্যম নিয়োজিত হয়েছিল একটিমাত্র চেষ্টায়—ভারতের মুক্তিবিধান। ফলে রাজনীতি আমাদের চিন্তায় অনুপাত-অতিরিক্ত প্রাধান্য লাভ করেছিল।

সংবাদপত্রে রাজনীতির এই প্রাধান্য বেশী চোখে পড়ত এই কারণে যে, সংবাদপত্র ছিল জাতীয়তাবাদী মুক্তি-সংগ্রামের এক মুখ্য হাতিয়ার। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতিটি আলোড়ন-বিলোড়নের ছন্দের সঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্র আগাগোড়া সমতালে পা ফেলে চলেছে এবং সেই আন্দোলন যাতে শক্তিশালী হয় সর্বপ্রকারে তার চেষ্টা করেছে।

জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক কংগ্রেসের প্রতি নৈতিক ও সক্রিয় উভয়বিধ সমর্থন জ্ঞাপনে সংবাদপত্রগুলির তরফে কখনও ক্লান্তি দেখা যায় নি। এবং সকলের সঙ্গে মিলে সংবাদপত্রগুলিও জাতীয় দুর্দৈবজনিত দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছিল। রাজনীতির কারণে ভারতীয় সংবাদপত্র-গুলির লাঞ্ছনার পরিমাণ বড় কম হবে না। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, বাহুল্যবোধে প্রসঙ্গটিকে আর টেনে বাড়াব না।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর স্বতঃই রাজনীতির পূর্বপ্রাধান্য কমে গেছে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অধ্যায় শেষ হয়েছে, অন্যবিধ রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি সমগ্র দেশকে যে ভাবে একসূত্রে আবদ্ধ করেছিল স্বভাবতঃই শেষোক্ত রাজনীতির বেলায় সে-জাতীয় একপ্রাণতা সম্ভব নয়। জাতীয় মুক্তি প্রয়াসের সমসূত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সাধারণ ভূমিতে এসে মিলিত হয়েছিল, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের পর এখন সে সব পার্টি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে। ফলে একদা-সমস্বার্থবদ্ধ সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রভাব সংবাদপত্রগুলির উপরও এসে পড়েছে। আজ আর নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক খবর ছাপলে সংবাদপত্রের চলে না, নেতাদের ফলাও-করে-ছাপানো বিবৃতির পূর্ব-আকর্ষণও আর নেই। মাত্র দশ বছর আগেও যে রাজনীতি নামাবলীর মত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা আষ্টেপৃষ্ঠে জুড়ে ছিল তাকে আজ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অধিকার ভাগ করে নিতে হচ্ছে। কংগ্রেস আজ অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি রাজনৈতিক দল, ফলে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সঙ্গে কংগ্রেসের সমার্থকতা ও সমপ্রাণতা ঘুচে

গেছে। সংবাদপত্র জগতে এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেই শূন্যতা ভরে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের সমাবেশের দ্বারা। সংবাদপত্রে আজ সাংস্কৃতিক সংবাদ, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র কথা, প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রাধান্য পাচ্ছে। যে সকল বিষয়ের সমাবেশ কিছুকাল আগেও সংবাদপত্রে অভাবিত ছিল আজ তা অবলীলাক্রমে সংবাদপত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করা হচ্ছে। দশ-পনেরো বছর আগেকার সংবাদপত্রের সঙ্গে আজকের সংবাদপত্রের চেহারার অনেকখানি তফাত।

এ সবই সম্ভব হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অবস্থার ক্ষেত্র-পরিবর্তনের ফলে। যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' বাংলা দেশের সংবাদ-পত্রজগতে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস আন্দোলনের মুখ্য ধারক ও বাহক ছিল, সেই দুটি পত্রিকায় রাজনীতি ছাড়াও আজ অন্য অনেক বিষয়েরই আলোচনার সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। নব নব বিষয়ের সংযোজনায় 'যুগান্তর'-এর উদ্যম বিশেষ ভাবে পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিধিবদ্ধ একটি পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে যুগান্তর আজ লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি এবং লোকসঙ্গীতের পরিচয় ও ব্যাখ্যামূলক আলোচনাকে বিশেষ মর্যাদার স্থান দিয়ে চলেছে। সঙ্গীত-সম্মেলন ও চিত্রপ্রদর্শনীগুলির বিস্তারিত বিবরণদানেও যুগান্তর অতি উদার। এ সব কারণে শিল্পামোদী মহলে যুগান্তর পত্রিকার জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে আনন্দবাজার পত্রিকাও পিছিয়ে পড়ে নেই। নিত্য নব নব বিষয়ের যোজনার দ্বারা এই বহুলপ্রচারিত পত্রিকাটিও তার জনপ্রিয়তার পরিধির ক্রমবিস্তার সাধন করে চলেছে। এক বিষয়ে এই দুটি পত্রিকার উদ্যম বিশেষ লক্ষণীয়। সংবাদ প্রদানের গতানুগতিক বিশুষ্ক ভঙ্গী ত্যাগ করে আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর আজ সজ্ঞানতঃ চিত্তাকর্ষক অর্থাৎ সাহিত্যসম্মতভাবে সংবাদ প্রদানের নীতি অবলম্বন করেছেন। সংবাদপত্রের রিপোর্ট হলেই যে তা গোমড়ামুখো, কণ্ঠগম্ভীর হতে হবে এই নীতি আজ উভয়তঃ পরিত্যক্ত। পরিষদীয় কার্যক্রমের আলোচনায়,

রাজনৈতিক নেতৃবর্গের চরিত্র-ব্যাখ্যানে, কল্যাণী কংগ্রেসের বিবরণ দানে, নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় ও ঘটনার উপস্থাপনে এবং সর্বশেষে 'টুকরো খবর' পরিবেশনায় আমরা প্রতিবেদকদের লেখনীর এই সরস ভঙ্গী লক্ষ করেছি। এ জাতীয় প্রয়াসের সব কটি ফলই যে সমান সুখকর হয়েছে এমন কথা বলতে পারব না—কোন কোন ক্ষেত্রে রসসৃষ্টির অত্যুগ্র চেষ্টায় রিপোর্ট প্রগল্‌ভতার ধার ঘেঁষে গেছে—তবে এর ফলে সংবাদপত্র যে পূর্বের তুলনায় সাহিত্যের নিকটতর হয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে বাংলা দৈনিক পত্রিকার আর একটি সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে চাই। সেটি তার নিয়মিত প্রকাশিতব্য রচনা (**feature**) নীতির প্রবর্তনা। এই নিয়মিত সংযোজনমূলক রচনাগুলিতে শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার প্রাধান্য স্বতঃস্বীকৃত। রাজনীতির স্থান এখানে গৌণ। এই পর্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রে যে সকল রচনা পাঠকসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাদের মধ্যে যুগান্তরের ছিন্নমূল মানুষ ও জীবনের আলেখ্য 'ছেড়ে আসা গ্রাম' (বর্তমানে গ্রন্থাকারে সংকলিত), ভারতের নানা প্রান্তের সাধারণ মানুষের কাহিনী 'সাধারণ মানুষ', 'কালপেঁচার নক্সা' ও 'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন,' 'প্রাসাদপুরী কল্‌কাতা' ও 'গ্রন্থবার্তা'; আনন্দবাজার পত্রিকার 'পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমা', 'মনীষী জীবনকথা', 'রাজধানীর ডাকে', 'কমলাকান্তের আসর', 'নগর সংকীর্তন' ও 'সাহিত্য জগৎ'; অধুনাবিলুপ্ত সত্যযুগ পত্রিকার 'গড়ে তোলা গ্রাম' ও ছাত্রসমস্যার আলোচনাদি; এবং বসুমতীর 'পাঠাগার' ও কল্‌কাতার পথঘাটের পরিচয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পর্যায়ের রচনাবলীর পরিমাণ ও রূপবৈচিত্র্য দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ

নানা বিপর্যয়ের ফলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ অনেক দিন থেকেই বিকার-দশা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও তার কাঠামোটি ঠিক আছে। এখনও আমাদের সমাজের উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্পসাহিত্যগত তৎপরতা—এ সবই মধ্যবিত্ত সমাজের করধৃত। সত্য বটে শ্রমিক শ্রেণী পূর্বের তুলনায় আজ বহু গুণে বেশী জাগ্রত, সঙ্ঘবদ্ধ এবং তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তিও দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে বর্ধমান; তৎসত্ত্বে এ কথা মানতেই হয় যে, তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার মত অবস্থা সৃষ্টি হতে এখনও ঢের বিলম্ব। এমন কি আমাদের দেশে আদৌ সে অবস্থা কখনও সৃষ্টি হবে কি না সে বিষয়ে এক-এক সময় সন্দেহ জাগে।

সন্দেহ, কেন না আমাদের সমাজের গড়ন ঠিক ইউরোপীয় সমাজের গড়নের মত নয়। ইউরোপীয় জনসমাজ শিল্প-বিপ্লবের অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, কাজেই সে দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাধিনায়কত্ব (ডিক্টেটরশিপ্ অব দি প্রোলেটারিয়েট) কল্পনা করা সম্ভব ; বস্তুতঃ ইউরোপীয় বামপন্থী বস্তুবাদী দার্শনিকেরা বিগত শতাব্দীতে তেমন কল্পনাই করেছেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজ শিল্পবিপ্লব তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত কৃষি-সভ্যতার সব কটি স্তরই ভাল করে অতিক্রম করে নি। এ দেশে শিল্পায়িতকরণ প্রয়াস এবং কৃষি-ব্যবস্থা গায়ে গায়ে মিশে আছে। বড় বহরের শিল্পগুলির পাশে পাশে এখনও কুটির-শিল্প বহাল তবিয়তে টিকে আছে এবং দূর ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে। কৃষি-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অঙ্গ জমিদারী প্রথা রদ হয়েছে, কিন্তু জমিদারী মনোভাব দূর হয় নি। শহর-অঞ্চলগুলিতে কল-কারখানার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এদিকে গ্রামীণ সমাজের ভিতর সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থাপ্রসূত সনাতন রীতির্নীতি পূর্বের ন্যায় বলবৎ। বাস্তব অবস্থার চাপে পড়ে ভূমিহীন কৃষক-সমাজের একটা অংশ

শ্রমিক শ্রেণীর কোঠায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে, এদিকে সাধারণ কৃষক সমাজের মধ্যে ধনকৌলীন্য, আভিজাত্য এবং তথাকথিত বনেদিয়ানার মোহ অতি প্রবল। ভারতীয় শ্রমিক সমাজ ও কৃষক সমাজ তাদের পারস্পরিক অনগ্রসরতার দ্বারা দুই দুইকে পিছনে টেনে রেখেছে, এ কথা বললে মোটেই বাস্তব সত্যের অপলাপ করা হয় না।

এই যে বিসদৃশ পরস্পরবিরোধী অবস্থা, এই অবস্থার জাঁতাকলে পড়ে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা হয়েছে কিম্ভূত। ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজ প্রত্যক্ষতঃ সেই দেশের শিল্প-বিপ্লবের ফলে উপজাত। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শহর-অঞ্চলগুলির পরিস্ফীতি ঘটে এবং নানা নূতন নূতন বৃত্তির উদ্ভব হওয়ায় স্বভাবতঃই বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রয়োজন দেখা দিল এবং সে সমাজ অচিরেই একটি শক্তিশালী শ্রেণীরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ইউরোপীয় সমাজের নানাবিধ সমুন্নতি বিধানে তথাকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভূমিকা সুবিদিত। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ ঠিক ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মত নয়। ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের মাটির সঙ্গে বিশেষ কোন যোগ নেই, আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের আছে। মুখ্যতঃ নাগরিক আবহাওয়ার আওতায় সৃষ্ট বিভিন্ন নূতন বৃত্তির প্রয়োজনে এ সমাজ তৈরী হলেও গ্রাম-সমাজের সঙ্গে এ সমাজের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। বাঙালী তথা ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের আয়ের একটা অংশ বরাবর গ্রামীণ কৃষি-ব্যবস্থার খাত বেয়ে এসেছে। বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর তেমন লোকের সংখ্যাই বেশী যাদের গ্রামঘরে কিছু-না-কিছু জমি-জিরাত আছে। মধ্যবিত্তরা জীবিকার সূত্রে শহর-অঞ্চলে বাস করে, কিন্তু বাড়তি আয়ের সূত্রে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে তাদের সকলেরই নাড়ীর যোগ বিদ্যমান। আধুনিক কালোচিত শিল্প-সভ্যতা মধ্যবিত্ত সমাজের জন্ম দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মনের পরতে পরতে কৃষির সংস্কার ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। যে ব্যবস্থা সুনিশ্চিতভাবে একটি উদ্বৃত্ত আয়ের উপর নির্ভরশীল, সে ব্যবস্থা কখনও উক্ত আয়ের সুবিধাভোগীর নিকট অরুচিকর বা অবাঞ্ছনীয় ঠেকতে পারে না।

এই কারণে ইউরোপীয় বস্তুবাদী বিজ্ঞানের ভাষ্য অনুসারে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজকে ঠিক মধ্যবিত্ত সমাজ বলা চলে না। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্মকালের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব যদিও কিছু পূর্বে সংসাধিত হয়েছে, তা হলেও এই সমাজের চেহারার মধ্যেও কৃষি-শিল্প-বিমিশ্র আধা-খেঁচড়া ভাব সমভাবে বিদ্যমান। তার উপরকার নাগরিক পালিশের তলায় অন্তর্লীন স্রোতের মত গ্রামীণ সংস্কার সতত প্রবহমান। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে আমাদের নাগরিক মধ্যবিত্তরা নাগরিক সভ্যতাসুলভ সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য আর রীতিপ্রকরণ আয়ত্ত করেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। তাদের নাগরিকতার তলায় তলায় কৃষিসভ্যতাসুলভ সংরক্ষণশীলতা ও স্থূলতার প্রবল আধিপত্য। আধুনিকতা আর রক্ষণকামিতার সংমিশ্রণে আমাদের বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষ কিম্ভূত এক-একটি জীব।

আরও একটি কারণে এ দেশীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এবংবিধ দো-আঁশলা মানসিক গঠন হয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের মধ্যবিত্তরা নামেই মধ্যবিত্ত, পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্টাণ্ডার্ড অব্ লিভিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নিম্নমধ্যবিত্ত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ের উপায় দুটি—বৃত্তিজাত আয় আর ভূমিজাত আয়। ইউরোপীয় মধ্যবিত্তের আয়ের উৎস মাত্র একটিই—বৃত্তি। তৎসত্ত্বেও ইউরোপীয় মধ্যবিত্তের উপার্জনক্ষমতা সমধিক এবং সে-কারণ তাদের জীবন-যাপনের মানও উচ্চতর। দুই সূত্র থেকে আহৃত উপার্জনের অঙ্ক একত্র করলেও এ দেশীয় মধ্যবিত্তের আয় ওদেশের একজন গড়পরতা সাধারণ মধ্যবিত্তের আয়ের তুল্য হবে না। আয়ের তারতম্যের অর্থই হচ্ছে জীবিকার তারতম্য এবং দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য। জীবনযাত্রা যেখানে সচ্ছল সে স্থলে দৃষ্টিভঙ্গিও উদার এবং আধুনিক হতে বাধ্য। এই কারণে দেখতে পাই, পাশ্চাত্ত্যবাসী মধ্যবিত্তের পক্ষে নাগরিকতা তথা বৈদগ্ধ্য তথা আধুনিকতার লক্ষণগুলি যে পরিমাণ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছে, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের পক্ষে তেমন হয় নি। ভারতীয় মধ্যবিত্তের গাত্রচর্ম খানিকটা আঁচড়ালেই বোঝা যাবে, তার মানসিকতায় পরিবারকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই অদ্যাবধি প্রাধান্য।

এ কথা যে নেহাত কথার কথা নয়, পরন্তু বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তার প্রমাণ হাতের কাছেই রয়েছে। আমরা সদ্য-অনুষ্ঠিত শারদীয় দুর্গোৎসবের কথা বলছি। শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান কারক অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা হল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বিশেষতঃ সর্বজনীন পূজা-অনুষ্ঠানগুলির ব্যাপক উৎসব-সমারোহের মূলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রয়াসকেই প্রধানতঃ সক্রিয় দেখতে পাই। আগে গ্রামাঞ্চলের দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে মুষ্টিমেয় সঙ্গতিবানেরাই ছিলেন অনুষ্ঠানের নায়ক। গ্রামের জমিদার বা তৎস্থানীয় অভিজাত ধনী দোল-দুর্গোৎসব করতেন; সেই উৎসব-অনুষ্ঠানের আনন্দের পংক্তিভোজে সর্বসাধারণের পাত পড়ত। এখন পূজার উৎসবের চেহারা বদলেছে। যা ছিল ব্যক্তিগত ব্যবস্থাধীন ব্যাপার তা এখন সাধারণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূজা-অনুষ্ঠানের মধ্যেও গণতান্ত্রিকতার পর্ব সূচিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানে এবং শিল্পবিপ্লবের সূচনায় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তচ্যুত হয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের করায়ত্ত হয়েছিল; ধর্মের ক্ষেত্রে এ যেন তেমনি একটি ব্যাপার। ভারতীয় সমাজে অভিজাত সম্প্রদায়ের পূর্বক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসব-ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। পূর্বের তুলনায় সে সম্প্রদায়ের উৎসাহ-উদ্যম বহুলাংশে স্তিমিত। কিন্তু প্রকৃতিতে শূন্যাবস্থা যেমন বেশী দিন টিকতে পারে না, এ ক্ষেত্রেও পারে নি। অভিজাত সম্প্রদায়ের ত্যক্ত দায়িত্বের ভার স্বতঃই এখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করেছে। বাঙালী মধ্যবিত্তরাই এক্ষণে বাংলার ধর্মানুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা।

মধ্যবিত্ত তথা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের দ্বারা কলকাতা শহরে বহুসংখ্যক সর্বজনীন দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এ সকল অনুষ্ঠান 'সর্বজনীন', সুতরাং তাতে সর্বশ্রেণীর হিন্দুরই স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগ থাকা আবশ্যক। স্বেচ্ছাসম্মত

গণ-সহযোগের ভিত্তিতে পরিচালিত হলে তবেই শুধু কোনও অনুষ্ঠান বা আয়োজন সর্বজনীন আখ্যা লাভ করতে পারে। কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ করেছি, এখানেও দলাদলি, ঈর্ষা, লোভ, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মোহ, রাজনৈতিক বিসংবাদ। অর্থাৎ গ্রাম-ঘরে ক্ষুদ্র সীমার ভিতর যে সঙ্কীর্ণতা নিবদ্ধ ছিল তা এখন শহর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আত্মবিকাশের ব্যাপকতর ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। সর্বজনীন পূজা-উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামীণতা শহর অঞ্চলে জাঁকিয়ে বসেছে।

এ-জাতীয় ব্যাপার কেন ঘটে পূর্বেই তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে করি। অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্তের দো-আঁশলা স্বভাবই তার কারণ। বাঙালী মধ্যবিত্ত প্রত্যক্ষতঃ বাস করে শহরে, ভিতরে ভিতরে সে গ্রামীণতার সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন। শহরের অধিবাসী হয়েও সে পল্লীমায়ের আঁচলধরা। কথাটাকে সদর্থে গ্রহণ করা যেত—অনেকে সদর্থেই গ্রহণ করবেন বলে মনে হয়, কারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত যে আজও পল্লীর সঙ্গে যোগ হারায় নি সেটি অনেকের নিকট বাঙালী মধ্যবিত্তের একটি অতিরিক্ত গুণরূপে পরিগণিত হওয়াই স্বাভাবিক,—কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বুঝি আর সদর্থক মনে করার যো নেই। নানা লক্ষণদৃষ্টে মনে হয়, বাঙালী মধ্যবিত্তের অগ্রসর ভূমিকা, প্রগতিশীল ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বাঙালী জীবনের নানা দিকে নবজাগরণের সূত্রপাত করেছিল, শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, ধর্ম ও আত্মোপলব্ধির সাধনায় যে মধ্যবিত্ত সমাজ বাংলার মরা গাঙে বান ডাকিয়েছিল, সেই মধ্যবিত্ত সমাজ এক্ষণে ক্ষয়িত-শক্তি, স্তিমিতপ্রভ। এখন পুরাতন কীর্তির রোমন্থন করাটাই তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এ সমাজ নিতান্ত আত্মরক্ষাতৎপর ও পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। অতিরিক্ত পরিবারকেন্দ্রিকতা সর্বাবস্থায়ই সঙ্কীর্ণতার দ্যোতক। চার দেয়ালের ভিতর আবদ্ধ স্বীয় ক্ষুদ্র সংসারের ভালমন্দ ভাবতেই যার সমস্ত

সময় কেটে যায় তার দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনও সত্যিকার উদারতার স্পর্শসৌভাগ্য ঘটতে পারে না। অতিরিক্ত পরিবারকেন্দ্রিকতারই অপর নাম স্বার্থপরতা। সেই স্বার্থপরতার অপবাদ বর্তমান বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের উপর আরোপ করা যেতে পারে বলে মনে করি। এককে দাবিয়ে, একের স্বার্থ পদদলিত করে অপরের প্রতিষ্ঠালাভ প্রয়াসের নীতি এ সমাজে দূষ্য নয়, কারণ এ সমাজের মাথাওয়ালা প্রত্যেকেরই নিকট নিজ নিজ সংসারটিই হল সকল চিন্তাভাবনা অধ্যবসায়ের কেন্দ্রবিন্দু। সকলেই অল্পবিস্তর মূলনীতি বলে ধরে নিয়েছে এ কথা যে, নিজ নিজ সংসারকে পাকেচক্রে রক্ষা করাই হল আসল কাজ, বাদবাকী সংসারগুলি জাহান্নমে গেলেও ক্ষতি নেই। এই অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতার মনোভাবের পরেও যে সংসারগুলি জাহান্নমে যায় না তার হেতু এই যে, সকলেই আত্মসচেতন এবং নিজ নিজ পরিবার-সংসারকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টায় নিয়োজিত। 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' নীতির প্রতি এমন অখণ্ড শ্রদ্ধার মনোভাব আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিটি মাথাওয়ালা প্রবীণ লোক অহংবোধের ক্ষুরে মাথা মুড়োবার জন্য মাথা পেতে বসে আছেন। সত্য বটে মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণ সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আদর্শবাদের অনেকখানি পোষকতা আছে; তারা তাদের অভিভাবকদের মত ঠিক অহংসর্বস্ব নয়। দেশের বৃহত্তর গণজীবনের সঙ্গে সহানুভূতির সূত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার গণ্ডী উত্তীর্ণ। শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালনায় এবং সাধারণভাবে বামপন্থী রাজনীতির নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এখনও মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজের ভূমিকাটাই প্রধান। বাংলা দেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সূত্র আজও মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত তরুণরাই ধারণ করে আছেন। কিন্তু মন্তব্যটুকু শর্তবিরহিত নয়। মধ্যবিত্ত তরুণ যতদিন বয়সে তরুণ থাকেন ততদিনই তাঁর এই আদর্শবাদ; কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি সংসারের জোয়ালে নিজের ঘাড়টি জুতে দেন, অমনি তাঁর চেহারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি তখন আর-দশজন প্রবীণ মধ্যবিত্তের মতই পরিবারগতপ্রাণ, বিষয়ী,

সংসারনিবিষ্ট মানুষ। পারিবারিক স্বার্থের টানে আদর্শবাদের আকর্ষণ ক্ষয় পেতে পেতে এক সময়ে তা বিনিঃশেষে মুছে যায়, এককালীন রোমাণ্টিক অধুনা গৃহস্থ কাজেই বিষয়াসক্ত তরুণের মনে পুরাতন উদ্দীপনার স্ফুলিঙ্গমাত্রও আর অবশিষ্ট থাকে কি না সন্দেহ। যুবক গৃহস্থ যতই সংসারে প্রবেশ করেন ততই তাঁর মন কঠিনত্ব প্রাপ্ত হতে থাকে, এক সময়ে মানসিকতার ভিতর ঔদার্যের বাষ্পও আর থাকে না।

শতকরা নিরনব্বুইটি ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণ মনের পরিণতি দাঁড়ায় এই। এর ফল বৃহত্তর জাতীয় জীবনের উপর কতটা ক্ষতিকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মধ্যবিত্ত সমাজকে আজও আমরা সকল কাজের পুরোভাগে দেখতে ভালবাসি এবং এখন পর্যন্ত সকল কাজের পুরোভাগে থাকার একটা ঠাট সে খাড়া রেখেছে। তবে মনে রাখতে হবে সেটি মাত্র ঠাটই, তার বেশী কিছু নয়। মধ্যবিত্ত সমাজের উপর ন্যস্ত প্রত্যাশার পূরণ করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ হাঁপিয়ে উঠেছে। পুরাতন নজীরের বশে আজও আমরা আশা করে আছি, মধ্যবিত্ত সমাজ রাজনীতিতে, সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কারে, সমবায়মূলক কর্মপ্রয়াসের ক্ষেত্রে তার চরম কুশলতা প্রদর্শন করে সকলের উপর অগ্রপ্রাধান্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, কিন্তু এই আশার মর্যাদা মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বারা আজ যথাযথভাবে রক্ষিত হওয়া সম্ভব কি না সন্দেহ। বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল ভূমিকা নিঃশেষিতপ্রায়। উনিশ শতকে আরব্ধ সর্বতোমুখী প্রগতির আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করবার ক্ষমতা মধ্যবিত্তের আর নেই, এখন পুরাতন ঐতিহ্যকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে মাত্র। আগুন নিবে গেছে; এক্ষণে শুধু দগ্ধাবশেষকে খুঁচিয়ে স্ফুলিঙ্গসৃষ্টির প্রয়াস। পুরাতন কীর্তির অঙ্গাররাশির উপর অধুনাকার মধ্যবিত্ত সমাজের টলটলায়মান প্রতিষ্ঠা।

তিনটি মূল কারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য দায়ী।—এক, তথাকথিত ভদ্রত্বের চেতনা; দুই, casteism বা জাতিভেদ-চেতনা; তিন,

অতিরিক্ত পরিবারকেন্দ্রিকতা বা সংসারমনস্কতা। তিনটি কারণ সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে।

মধ্যবিত্ত সমাজ নিম্নবিত্ত তথা শ্রমিক সমাজের সঙ্গে পাছে এক হয়ে মিশে যান সেই ভয়ে সর্বদাই তটস্থ। তাঁরা তাই তথাকথিত নিম্ন সমাজের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্যরেখাটিকে সুচিহ্নিত করতে সদাব্যস্ত। এ ব্যাপারে 'ভদ্রত্ব' তাঁদের সহায় আর তারই জন্য ভদ্রত্বের বেদীমূলে তাঁরা সকলেই গললগ্নীকৃত-বাস। ভদ্রত্ব বলতে এখানে আচরণের শীলতা, বিনয়, সদ্ধর্ম ইত্যাদি বোঝাচ্ছে না—এ সকল গুণ সব সম্প্রদায়ের দ্বারা সর্বাবস্থায়ই অনুশীলিতব্য—ভদ্রত্ব বলতে এখানে নেহাতই জামা-কাপড়ের ভদ্রতাকে বোঝাচ্ছে। আর এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভদ্রতাকেই আঁকড়ে আছেন মধ্যবিত্ত সমাজ। কাপড়ে-চোপড়ে সাজে-সজ্জায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে নিজেদের শ্রেণীস্বরূপকে আলাদা করে দেখাবার তাড়নায় মধ্যবিত্ত সমাজ গলদ্‌ঘর্ম। এত করেও যে সব সময় ভোল বজায় রাখতে পারেন তা নয়, তবু ধোপধোরস্ত জামা-কাপড়ের শীর্ষে ভদ্রতার বিজয়বৈজয়ন্তী ওড়াবার চেষ্টার বিরাম নেই। সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শকে তাঁরা মাত্র পুথিকেতাবের পাতায় স্বীকার করেন; এদিকে বাস্তব জীবনের সজ্জায় ও আভরণে ঘটাপটার আদর্শেরই সমধিক জয়জয়কার। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই সজ্জামোহ এসেছে অভিজাত সম্প্রদায়ের দেখাদেখি, কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়কে যা মানায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে তা মানায় না। সমাজে সজ্জাপারিপাট্যের এবং সেই সূত্রে নিজ নিজ সঙ্গতি বিঘোষণের একটা সংস্কার প্রচলিত আছে বলেই খেয়ে না খেয়ে সেই রীতির পায়ে কুর্নিশ জানাতে হবে এমন কোন কথা নেই। অভিজাত সমাজ আর বিত্তবান সমাজের পক্ষে যা নেহাতই বিলাসচর্চা, মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে তা প্রায় প্রাণঘাতী ব্যাপার। তবু সংস্কার এমনি বালাই যে, সকল রকম অসুবিধা সহ্য করেও তাকে আঁকড়ে থাকতে হবে তবু নতুন কিছু করা চলবে না। মার্ক্সীয় বিজ্ঞানের গ্রন্থাদিতে দেখতে পাই, মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে সেখানে দ্বিধাবিভক্ত বলা হয়েছে; মধ্যবিত্তের এক চোখ নীচু তলায়, আর এক চোখ উপর-তলায় নিবদ্ধ। যখন

যে দিকে কাত হলে সুবিধা, সুযোগ বুঝে মধ্যবিত্ত সমাজ সেই দিকেই কাত হন। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের রকম-সকম দেখলে মনে হয়, তাঁরা এক দিকে কাত হয়ে থাকাটাই তাঁদের চিরন্তন বিধিলিপি বলে জেনে নিয়েছেন, এবং সে এক দিক হল—উঁচু তলার দিক। বিশেষ, দেশ স্বাধীন হবার পর, কংগ্রেস শাসনক্ষমতা অধিকারের পর মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। ধনী সমাজের গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারলে তাঁরা আর কিছু চান না। মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যাঁরা নিজেদের টাই গোছের মনে করেন বড়লোকের সঙ্গে তাঁদের ঢলাঢলি লেগেই আছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তরুণবয়সীরা নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণীর দুঃখে যতই বিগলিত হোক, তাতে ওই সমাজের শাঁসালো, ভারিক্কি অংশের বিচলিত হবার কারণ নেই যতক্ষণ তাঁরা ধনী সমাজের নেকনজরে আছেন। ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতা একটি অপরাধ বলে গণ্য। অবহেলিত নির্যাতিত সমাজের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলবার অনুচিত আগ্রহে মধ্যবিত্ত সমাজের এই যে তথাকথিত ভদ্রত্ব জীইয়ে রাখবার প্রয়াস, এও এক ধরনের বিচ্যুতি বলে গণ্য হওয়া উচিত।

তার পরেই জাত্যভিমান, বর্ণচেতনার অভিমান। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস'-এ দেখিয়েছেন, বাঙালীর ভিতর casteism অমোচনীয়ভাবে বদ্ধমূল। সমস্ত রকমের উপর-পালিশ ভেদ করে বাঙালীর এই বর্ণাভিমান আজও অবধি টিকে আছে। এ কথার প্রমাণ আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের আচারে ব্যবহারে নিত্যই পাই। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদির ভেদচেতনা শোচনীয়ভাবে প্রকট। কোথায় শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এ সকল ভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে, তা নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই উক্ত ভেদচেতনার সমধিক প্রাবল্য। বিবাহ, চাকুরি, বন্ধু নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে বর্ণ মিলিয়ে জোট বাঁধবার প্রবৃত্তি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যত প্রবল এমন বোধ করি আর কোন সম্প্রদায়ের ভিতর নয়। জোট বাঁধবার প্রবৃত্তি খারাপ তা বলি নে, কিন্তু ,ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ কতকগুলি ভেদলক্ষণ

মিলিয়ে যেখানে এই মিলিত হবার প্রয়াস, সেখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেই হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সাধারণতঃ উপাধির রন্ধ্রপথেই এই সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির উপাধি ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্যক্তির প্রতি অপর পক্ষের মিত্রতা অথবা বিমুখতা অল্প-বিস্তর নির্ণীত হয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের ফলে যদি জানা যায় যে আলাপিতের উপাধি যথেষ্ট-পরিমাণ 'উচ্চ' কুলের জ্ঞাপক নয়, তথাকথিত কুলীন উপাধি-গুলির দু-এক ধাপ নীচের সারে তার অধিষ্ঠান, তা হলে জিজ্ঞাসাকারকের মনের কোণায় অজ্ঞাতসারেই বুঝি তাচ্ছিল্যের একটি ঝিলিক খেলে যায়। এটি কথার কথা নয়, যে কেউ চোখ না ঠেরে নিজের মনের মুখোমুখি দাঁড়াবেন, এ অভিযোগ স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। সাধারণের তুলনায় শিক্ষিতের মধ্যে এ বর্ণাভিমান আরও প্রবল। তার কারণ, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটাই এমন যে, তাতে শুধু ভেদচেতনা বৃদ্ধিই পেতে থাকে। সাধারণের নিকট যে ভেদরেখা অস্পষ্ট, শিক্ষিতের চোখে সে ভেদরেখা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষিতের বিকারগ্রস্ত দৃষ্টি যেখানে ভেদ থাকা উচিত নয় সেখানে ভেদ আবিষ্কার করে পুলকিত হয়। উপাধির ক্ষেত্রে আমাদের এ ভেদজ্ঞান মর্মান্তিকভাবে পরিস্ফুট। আমরা অতি সুসভ্য বিংশ শতাব্দীর মধ্যসীমা অতিক্রম করেছি, পদে পদে আধুনিকতার দোহাই দিই; উপাধির অত্যাচার সমাজদেহ থেকে আজও দূর হল না—এর চাইতে লজ্জাকর ব্যাপার আর কী হতে পারে?

অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারেই দেখি, সন্তান একটু বড় হতেই তার লেখাপড়ার জন্য অভিভাবক বিশেষ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং কন্যাসন্তানের বয়ঃপ্রাপ্তির সূচনায় তার বিবাহের জন্য টাকা জমাতে শুরু করেন। সন্তানের মঙ্গলকামনা পিতামাতামাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক, সুতরাং সেদিক থেকে এ অভ্যাসের বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, জোড়াতালি দেওয়া সামাজিক ব্যবস্থার আওতায় অভিভাবকের মঙ্গলকামনা আর কত-দূর ফলপ্রসূ হতে পারে? মধ্যবিত্ত ছেলের বাপ ছেলের লেখাপড়ার জন্য

এত যে করেন, সেই তো ছেলে এদেশ-প্রচলিত শিক্ষার প্রসাদে বড় হয়ে বাপেরই মত আর একজন ছাপোষা কেরানী হবে, তবে আর শিক্ষাদান ব্যপদেশে অত পাঁয়তারা কষা কেন। ধার-কর্জ করে, বাড়ী বন্ধক রেখে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চাই-ই চাই, এদিকে মেয়ে হয়তো পড়ল এক মগুপ, কুক্রিয়াসক্ত, অত্যাচারী স্বামীর পাল্লায়, নয়তো হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই জীবন গেল। গড্ডলিকাবাহী মধ্যবিত্ত সমাজ গতানুগতিকতাকে মানতে গিয়ে কষ্ট পাবে, তবু অভ্যাস বদলাবে না। যেমন তেমন করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো চাই, মেয়ের বিয়ে দেওয়া চাই, কিন্তু যে ব্যবস্থার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে পুত্রকন্যার শক্তি ও আয়ু অযথা ক্ষয়িত হচ্ছে সে ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা কারও মনে হয় না। নতুন করে সমাজকে ঢেলে সাজবার চিন্তা মধ্যবিত্ত মানসিকতায় অনুপস্থিত। পরিবর্তিত সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে সকলেরই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ অবারিত, সেস্থলে কেবলমাত্র অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে গতানুগতিক ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকা শোচনীয় অজ্ঞতার নামান্তর। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ এই অজ্ঞতার দ্বারা কবলিত, সেই কারণে তার এতাদৃশ দুর্গতি।

দুইটি শতক

দুইটি শতক। উনিশ ও বিশ। উনিশ শতকের বাংলা দেশ চোখে দেখি নি, তবে সে বিষয়ে নানা কথা বইয়ে পড়েছি। আর বিশ শতক তো আমাদেরই শতক—আমরা যারা বর্তমানে অস্তিত্ববান তারা এ শতকের আলো-হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়েই বড় হয়েছি। সত্য বটে গোটা উনিশ শতক অতিক্রান্ত এবং তার স্মৃতি আমাদের মনোজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, সেই তুলনায় বিশ শতকের স্বরূপ এখনও পুরোপুরিভাবে জানা হয় নি। বিশ শতকের অর্ধপথের কিছু বেশী মাত্র আমরা অতিক্রম করেছি। কিন্তু তাতে দুইয়ের তুলনামূলক বিচারে কিছু বাধা হবে বলে মনে করি না। কেন না যে শতকে আমরা বেঁচে আছি তার করণকারণ জানবার পক্ষে তার অর্ধায়ুর সীমা লঙ্ঘন করাটাই যথেষ্ট, বাকী জীবনে সে আর আমাদের জন্য এমন কি নতুন বিস্ময়ের চমক জমিয়ে রেখেছে! তা ছাড়া একের সমগ্র আর অপরের অর্ধ তুল্যমূল্য না হলেও এটি ভুললে চলবে না যে, উনিশ শতক আমরা একালের লোকেরা কেউ চাক্ষুষ করি নি, কিন্তু বিশ শতক আমাদের চোখের সামনে অতিমাত্র বাস্তব সত্যরূপে নিয়ত প্রতিভাত। উনিশ শতকের পাশ কাটানো যায়, বিশ শতক অনতিক্রম্য। সুতরাং গোটার পিঠে আধাই এ ক্ষেত্রে গোটার সমমর্যাদার দাবীদার।

আলোচনাটাকে আমি সেকাল আর একালের তুলনামূলক আলোচনার পর্যায়ে ফেলতে চাই না। তা হলেই পাঠক বলবেন, ওঃ, লেখকের অভিপ্রায়টা বুঝেছি। সেই তো নতুন কালকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করে পুরাতন দিনকে মোহময় প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হবে—এ আর বেশী কথা কী, এ তো যুগ যুগ ধরেই হয়ে আসছে। কে না জানে যে, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, আর দূরের চিত্র সর্বদাই অধিক মনোরম?

সংশয়বাদীদের জানিয়ে রাখি, ঠিক ওভাবে দুই শতকের তুলনামূলক বিচার করবার জন্যে এ রচনা নয়। নতুন দিনের সব কিছুই খারাপ আর যে কাল বিগত হয়েছে তার সব ভাল—এ জাতীয় মনোভাবকে যাঁরা প্রশ্রয় দেন, লেখক তাঁদের দলে নন। তা ছাড়া তিনি একালেরই মানুষ, উনিশ শতকের আলো বাতাস গ্রহণ করবার তাঁর সুযোগ হয় নি। প্রবীণেরা যখন একালের হালচাল দেখে ব্যথিত হন এবং বিগত কালের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, বুঝতে হবে সে বিগত কাল কিছু পরিমাণে হলেও তাঁরা নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা দুটি অভিজ্ঞতারই শরিক, কাজেই একের পিঠে অপরের গুণাগুণ বিচারে সমর্থ। কিন্তু বর্তমান লেখকের জীবনে তেমন সুযোগ ঘটে নি। তিনি উনিশ শতককে আভাসে অর্থাৎ দূর থেকে মাত্র দেখেছেন। উনিশ শতক সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা, সেটি একান্ত ভাবেই পুস্তকলব্ধ। কাজেই বিশ শতকের আপাত-অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকের মনোরম স্মৃতি স্মরণ করে আর যিনিই হা-পিত্যেশ করুন, সমসাময়িক সমাজের একজন হিসাবে বর্তমান লেখক অন্ততঃ তা করতে পারেন না।

তবে তুলনামূলক বিচার অন্যভাবেও করা যায়। এক-এক যুগের এক-একটা বিশেষ প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সেই যুগের ইতিহাস আলোচনা করলেই সেটি ধরা পড়ে। এই মানদণ্ডে যদি আমরা উনিশ আর বিশ শতকীয় বাংলা দেশের তুলনা করি, তা হলে মোটা কয়েকটি তথ্য সহজেই পেতে পারি।

প্রথম তথ্য যেটি চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই যে, উনিশ শতক মুখ্যতঃ আত্মচেতনার যুগ, আর বিশ শতক গণচেতনার যুগ। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের দ্বারা দেশ নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এঁদের কেউ সেই অর্থে জনতার নায়ক নন যে অর্থে আজকের দিনের নেতাদের আমরা জনতার নায়ক বলে থাকি। ডেমোক্রাসি কথাটা বহু পুরনো হলেও তার প্রচলন এবং প্রতিষ্ঠা বিশ শতকেই বিশেষভাবে হয়েছে। একালে আক্ষরিক অর্থে জনতার রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে। আগের কালের জনতা নেতাদের কথায় ওঠবোস করত, এখনকার কালের নেতারা

জনতার কথায় ওঠবোস করেন। উনিশ শতকের জননায়কদের মধ্যে যে চিত্তের বল ছিল এখনকার নেতাদের অনেকেরই তা নেই। আদর্শের জন্য সর্ববিধ ত্যাগস্বীকারের প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস ধীরে ধীরে দেশ থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে।

উনিশ শতকীয় চিন্তা ও কর্মনায়কদের এই সুগভীর আদর্শনিষ্ঠার মূলে ছিল তাঁদের আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা এক দিকে যেমন জাতির সেবা করতে চেয়েছেন, তেমনি অন্য দিকে স্বীয় নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ বিকাশ কামনা করেছেন। বস্তুতঃ তাঁদের আত্মোন্নয়ন-প্রয়াসের সহিত তাঁদের সমাজ ও জাতি-সেবামূলক তৎপরতার বিশেষ যোগ ছিল। প্রথমটিকে বাদ দিয়ে তাঁরা দ্বিতীয়টির কথা ভাবতে পারতেন না। অর্থাৎ তাঁদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা প্রলম্বিত (vertical) এবং বিলম্বিত (horizontal) দুই গতি অবলম্বন করেই বরাবর অগ্রসর হতে চেয়েছে। উচ্চ ভাবনা ও সৎ জীবনযাত্রার দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ না করা পর্যন্ত যে অপরের সেবা করার অধিকার জন্মায় না এ তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। কাজেই তাঁদের আত্মচিত্তশুদ্ধি এবং জাতীয় চিত্তশুদ্ধির সাধনা যুগপৎ অগ্রসর হয়েছে। তাঁরা ভগবানকে পেতে চেয়েছেন, নরনারায়ণেরও সেবা করতে চেয়েছেন। তাঁদের চোখে একটি অপরটির পরিপূরক ছিল।

কিন্তু এ যুগে অন্যচিন্তা-নিরপেক্ষ জাতিসেবার আদর্শ টাই বড় হয়ে উঠেছে। এখন আর আত্মোপলব্ধির কথা বড় একটা কেউ চিন্তা করেন না। সে প্রয়োজনও বোধ করেন না। তবু বরং বাংলার বাইরে আত্মোপলব্ধির আদর্শ সেদিন পর্যন্ত বলবৎ ছিল, বাংলায় সে পাট উঠে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিলক, গোখলে, গান্ধীর মত একাধারে আত্ম ও রাষ্ট্রোন্নয়ন প্রয়াসী নেতা যে দু একজন একালে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা উনিশ শতকেরই মানস-সন্তান, বিশ শতকের মানসিকতার সঙ্গে তাঁদের মেজাজের মিল নেই। বিশ শতকের নিজস্ব মেজাজ বলতে বুঝি প্রতিটি কাজকে প্রধানতঃ utility-র দিক থেকে বিচার করার এবং নীতিজ্ঞানকে

প্রাধান্য না দেওয়ার অভ্যাস। এই অভ্যাস যে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে শিকড় বিস্তার করে চলেছে তা একটু চোখ-কান খোলা রেখে চার দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়।

আসলে এই দুই যুগের মানসিকতার পার্থক্যের মূলে রয়েছে দুইটি বিসদৃশ সংস্কার। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, আর বিংশ শতাব্দীতে ধর্মের বদলে রাজনীতি আসর জাঁকিয়ে বসেছে। উনিশ শতকীয় নেতাদের মধ্যে ধর্মচেতনা যে পরিমাণ প্রবল ছিল রাজনৈতিক চেতনা তেমন ছিল না এটা যদি নিন্দনীয় হয়, তবে বিশ শতকের নায়কদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অনুপাতে ধর্ম-চেতনার স্বল্পতাও সমপরিমাণে নিন্দনীয়। সত্য বটে, প্রবল নীতিজ্ঞানযুক্ত রাজনৈতিক নেতা মহাত্মা গান্ধী একালের পটভূমিতেই তাঁর সকল আদর্শ প্রচার করেছেন, কিন্তু এই মহান নায়কের সদ্দৃষ্টান্ত যে আধুনিক বাঙালীর ভাবজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রমাণ পাই না। জানি এ কথা গৌরবের নয়—আত্মনিন্দা শাস্ত্রে পাপ বলে কথিত হয়েছে—তবু সত্যের খাতিরে আত্মধিক্কার অসার আত্মপ্রসাদের তুলনায় শতগুণে শ্রেয় আদর্শ বলে মানব।

উনিশ শতকের প্রধান প্রধান বাঙালীদের নীতিজ্ঞাননির্ভর আত্মোন্নয়ন-প্রয়াসকে আমি একটি বিশিষ্ট আদর্শের মর্যাদা দিতে চাই। এ কথা খুবই সত্য যে, বৃহত্তর রাজনীতির ধারণা অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে বেষ্টন করে জাতি-সেবার আদর্শ তখনও দানা বেঁধে ওঠে নি—তখনকার কর্মীদের দৃষ্টি মূলতঃ সমাজের উপরের কোঠাগুলিতেই নিবদ্ধ ছিল—কিন্তু এই অপূর্ণতার পিঠে তাঁদের এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাঁদের নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৎপরতাগুলিকেও বিশেষ মহিমায় ভূষিত করে তুলেছিল। সেটি তাঁদের অব্যভিচারী নীতিনিষ্ঠা। ভারতীয় সভ্যতার সনাতন নৈতিক মূল্যবোধগুলির প্রতি উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালীদের একান্ত অনুরাগ ও নিষ্ঠা তাঁদের চরিত্রকে যে গৌরব দান করেছে সে গৌরবের খানিকটা পেলেও আমরা বর্তে যেতাম।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। দৃষ্টান্তটি আপাতবিচারে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তার পিছনে কী বজ্রকঠিন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা লুকিয়ে আছে তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। ঘটনাটি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে ঘটেছিল, তাঁর 'আত্মচরিত'-এ সে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

একবার কোনও এক পতিতা নানাভাবে উপদ্রুত ও লাঞ্ছিত হয়ে উপায়ান্তর না খুঁজে পেয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারস্থ হয় ও তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করে। শাস্ত্রী মহাশয় মুহূর্তের জন্য দ্বিধা না করে তাকে স্বগৃহে স্থান দেন এবং তার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বভাবতঃই এই ব্যাপারে চারদিকে তুমুল কলরব ওঠে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় সমস্ত নিন্দাবাদ সহ্য করে স্বীয় সঙ্কল্পে অটল থাকেন। লোকের কথা গায়ে মেখে আশ্রিতকে ত্যাগ করে তিনি নিজেকে নীতিভ্রষ্ট হতে দেন নি।

আজকের দিনে এ জাতীয় সংঘটনের কথা আমরা ভাবতেও পারি না। তখনকার কালের তুলনায় বর্তমান দিনের মানুষ আমরা অনেক বেশী উদারভাবাপন্ন হয়েছি সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের এই ঔদার্য প্রায়শঃ বাস্তব জীবনের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের উদারতা একটা নিছক সদিচ্ছা বা ভাবাবেগ মাত্র। এই সদিচ্ছাকে কার্যে রূপান্তরিত করবার মত মনোবল আমাদের নেই। বিশ্বাসের বস্তুকে অভ্যাসে পরিণত করতে গেলেই আমাদের স্বভাবের অপূর্ণতা প্রকট হয়ে ওঠে। পুরাতন দিনের মানুষেরা তেমন ছিলেন না। তাঁরা যা ভাল মনে করতেন, নিন্দা গ্লানি সহ্য করে হলেও তাকে কার্যে রূপ দিতে চেষ্টিত হতেন। ব্রাহ্ম সমাজের একজন গোঁড়া নীতিনিষ্ঠ শুচিতাভিমানী আচার্যের মনে পতিতার সংস্রবে অবিমিশ্র ঘৃণা ছাড়া আর কোন মনোভাবেরই উদয় হতে পারে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল অন্যরূপ। শরণপ্রার্থীকে শরণ দান হিন্দুধর্মের এক মহান নীতি। হোক সে শরণপ্রার্থী নষ্ট ভ্রষ্ট পতিত, শরণদানকারীর পক্ষে তা বিচার্য নয়। দুর্বল যখন অত্যাচারের কবল থেকে অব্যাহতিলাভের আশায় শক্তিমানের দ্বারস্থ হয় শক্তিমানের নিকট দুর্বলের দুর্বলতাটাই তখন

একমাত্র পরিচয়, অন্য কোন পরিচয়ের প্রশ্ন তৎকালে অন্ততঃ ওঠে না। আবহমান কাল থেকে ভারতীয় সভ্যতার এই যে পরিকীর্তিত নীতি, এই নীতিই আলোচ্য ক্ষেত্রে শাস্ত্রী মহাশয়কে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করেছে। ঘৃণা করা সহজ, প্রেম দান করা কঠিন। কুৎসিতকে কুৎসিত বলেই যে তিনি এড়িয়ে চলেন নি, এটি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যপ্রবরের অসাধারণ চরিত্রবলেরই পরিচায়ক।

একালে এ জাতীয় সুদৃঢ় চরিত্রবলের প্রমাণ কদাচ দৃষ্ট হয়। বিশেষ, প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর থেকে মানুষের নীতিনিষ্ঠার আদর্শের ভিতর বড় রকমের ফাটল ধরেছে বলে মনে হয়। পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাঙালীর মনোজীবনে যে ক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে অদ্য আমাদের সমগ্র নীতিজীবনকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৫০-এর মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ইত্যাদি কতিপয় গুরুতর বিপর্যয় এর সঙ্গে মিলে ধ্বংসাবস্থাকে আরও বেশী ত্বরান্বিত করে তুলেছে। আজ আমরা যিনি যে-কাজই করি-না কেন, তার ভিতর আদর্শের পোষকতা সামান্য, পক্ষান্তরে স্বার্থচিন্তা অতীব বলবৎ। সত্য বটে, পাশ্চাত্ত্য ভাবের জগৎ থেকে আমরা একালের মানুষেরা অনেক নতুন নতুন চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করে আমাদের মনোজীবনকে সমৃদ্ধ করেছি, নূতন ভাবাদর্শের প্রসাদে পুরাতনকালীন অনেক গোঁড়ামি আমাদের মন থেকে খসে ঝরে গেছে, আমাদের সামাজিক দৃষ্টির পরিধি একালে অনেক বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা অনেক নতুন নতুন পথের নির্দেশ পেয়েছি, জনসহযোগের দ্বারা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Welfare State) গড়ে তোলার ধারণা উনিশ শতকে অজ্ঞাত ছিল বললেও চলে। কিন্তু এসব কোন সুবিধাই সুবিধা নয় যদি না সুদৃঢ় নীতির ভিত্তির উপর আমরা আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত করি। মানুষের স্বভাবের গোড়াতেই যদি গলদ থেকে যায় তবে চিন্তাসমৃদ্ধিতেই বা কী লাভ, আর কর্মপটুতায়ই বা কী লাভ। যে বিদ্যাবুদ্ধি মানুষকে নীতিজ্ঞানযুক্ত করে না, বরং উল্টো তাকে অনীতির যৌক্তিকতা উদ্ভাবনে সহায়তা করে, তেমন

বিদ্যাবুদ্ধি পর্বতপ্রমাণ আকারপ্রাপ্ত হলেও অমান্য। অথচ এক ধরনের ভ্রান্ত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে ঠিক এ জাতীয় নীতি-অসহ বিদ্যার্জনের দিকেই যেন আজকাল আমাদের সমধিক ঝোঁক পড়েছে। ঊনবিংশ শতকের বিদ্বান বাঙালীদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনাদর ছিল এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষারও দুটি দিক আছে। এক তার ব্যাপ্তির দিক, অপর তার গভীরতার দিক। আমরা এ কালের বিদ্যাপ্রয়াসীরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ব্যাপ্তির দিকটি নিয়েছি, উনিশ শতকীয় বাঙালীরা নিতেন তার গভীরতার দিক। তুলনায় তাঁরাই যে লাভবান হয়েছেন অনেক বেশী তা তাঁদের জীবনের ধারা পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়।

বাংলা দেশের উনিশ শতককে ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় ও ভিক্টোরীয় যুগের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই তুলনা মোটেই অকারণ নয়। একটি শতাব্দীর পরিসরের ভিতর এত অধিক জ্ঞানী-গুণী-কর্মীর সমাবেশ আর কোন কালে এ দেশে হয়েছে কিনা সন্দেহ। অথচ অবাক্ কাণ্ড এই যে, বাঙালী জীবনে এমন যে অত্যাশ্চর্য সংঘটন, তার সবটাই ঘটেছে পাশ্চাত্ত্য ভাবের সহিত স্পর্শজনিত প্রভাবের ফলে। স্বদেশীয় ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি বিষয়ে সম্যক্ চেতনাযুক্ত গ্রহিষ্ণু চিত্তের উপর নবাগত বিদেশী ভাবের আলো এসে যখন পড়ে তখন বোধ করি এ রকম কাণ্ডই ঘটে। আজ বিদেশী ভাবের প্রথম ধাক্কার আলোড়ন কেটে গেছে, কিন্তু পুরনো অভ্যাস যায় নি। আজও আমরা মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য ভাবের আলোর দ্বারা মনকে আলোকিত করতে সচেষ্ট। তবে মনের অন্ধকার ঘোচে না কেন? ঘোচে না এ কারণে যে, ভারতীয় সভ্যতার ধ্যানধারণায় অনুস্যূত নীতির সংস্কারের সঙ্গে আমাদের পুরাতন যোগ বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। তাই যতই প্রগতির সেবা করি আর আধুনিকতার বিগ্রহের বেদীমূলে অর্ঘ্য নিবেদন করি, কোন কাজই ঠিকমত হয়ে উঠছে না। আমাদের অধিকাংশ প্রয়াস নীতিভ্রষ্টতার চড়ায় ঠেকে বানচাল হয়ে যাচ্ছে। আমরা বামপন্থী রাজনীতি করি তাতে সন্নীতির প্রসঙ্গ কদাচ উল্লিখিত, সাহিত্য করি তাতে শ্লীল-অশ্লীল-নির্বিশেষে রসবন্যায়

টইটুম্বুর, আত্মশুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েই সকলে সমাজসেবায় দড়, এবং ব্যক্তিগত আচার-আচরণের ক্ষেত্রে স্বার্থবিনষ্টির ক্ষীণতম সম্ভাবনামাত্রে নীতিভাবনায় পরাঙ্মুখ। এই যেখানে অবস্থা, সে স্থলে জাতিকে ঠিক ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যে খুব দুরূহ কাজ তা বিশদ ভাষণের অপেক্ষা রাখে না।

বিশ শতকের প্রধান গলদ যদি আমরা দূর করতে সমর্থ না হই, বাকী ছেচল্লিশ বৎসরে জাতীয় সমুন্নতির সম্ভাবিত সর্বপ্রকার প্রয়াস সত্ত্বে উনিশ শতকের নাগাল কোন সময়েই আমরা পাব না।

বাংলার উনিশ শতকের ভাবধারা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা পর পর কয়েকটি ধারার সাক্ষাৎ পাই। এই ধারাগুলির একটা মোটামুটি হিসাব নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমে রাজা রামমোহন রায়। বাংলা দেশে ইংরেজ-অভ্যুদয়ের পরে এবং ইংরেজী ভাবাদর্শের সংস্পর্শে ও সংঘাতে যে নূতন যুগের সূত্রপাত হয় রাজা রামমোহন তার আদিপুরুষ। তাঁকে ভারতীয় নবজাগৃতি (রেনেসাঁ) আন্দোলনের প্রবর্তক বলা হয়। অভিধাটি অকারণ নয়। রাজা রামমোহন প্রাচীন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শে আস্থাশীল ছিলেন, উপনিষদের ভাবধারায় তিনি ভরপূর ছিলেন। কিন্তু সেখানেই তাঁর চিন্তা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের গহনে প্রবেশ করেছিলেন, সেখান থেকে বহু সম্পদ আহরণ করেছিলেন। পুরাতন ও নূতন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি একটি যৌগিক দর্শন ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিজ্ঞানের আলোকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মচিন্তাকে নূতন ভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। তাঁকে বলা হয় 'ভুক্তি-মুক্তি'র সাধক। অর্থাৎ প্রাচ্যের ত্যাগের আদর্শ যেমন তাঁর মনোজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি পাশ্চাত্ত্যের ভোগবাদকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। পাশ্চাত্ত্য জীবন থেকে তিনি বিশেষভাবে তার কর্ম ও গতির আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অতিরিক্ত অন্তর্নিবেশের অভ্যাসজনিত এক ধরনের স্থবিরত্ব আছে, এই স্থবিরত্বের সঙ্গে ইহবিমুখতা যুক্ত হয়ে তাকে আরও জড়ভাবাপন্ন করে তুলেছে। রাজা রামমোহন ইহকেন্দ্রিক পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদের দ্বারা ভারতীয় মনের এই সহজাত জড়তার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন। ভোগের আদর্শকে

তিনি মোক্ষের সাধনার অন্তরায় মনে করেন নি। রাজর্ষি জনকের মত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শই ছিল রামমোহনের চোখে শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ। ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের মধ্যে তিনি এই আদর্শটির প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন। ব্রাহ্মধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেকখানি পরিমাণ পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আছে; তবে এই পাশ্চাত্ত্যকরণ হিন্দুধর্মের বিরোধিতাপ্রসূত নয়, হিন্দুধর্মের যথোচিত সংস্কার ও শোধনের আগ্রহ থেকেই তার উদ্ভব। ইংরেজের অভ্যাগমনের ফলে বাংলা দেশের ভাবজগতে যে পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার পটভূমিতে বিচার করলে ব্রাহ্মধর্মকে আর ভুল বোঝার অবকাশ থাকে না।

রাজা রামমোহনের সমন্বয়পন্থী জীবনাদর্শ পরবর্তী বাঙালী মানসিকতায় দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে যাঁদের মধ্যে এই আদর্শ সার্থক রূপ পায় তাঁদের অগ্রগণ্য হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ গৃহীর আদর্শের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ নিরাসক্তির আদর্শের সমন্বয় বিধান করেছিলেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথে পাই সুগভীর জীবনপ্রীতির সঙ্গে ঈশ্বরোপলব্ধির সুসমঞ্জস মিলন। এক নিবিড় সৌন্দর্যস্পৃহার উৎস থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রীতি তথা প্রকৃতিপ্রেম উচ্ছলিত হয়েছিল। তা বলে জীবনপ্রীতির সঙ্গে কবির অধ্যাত্ম-চেতনার বিরোধ ঘটে নি। তিনি যেমন রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শময় পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যসম্ভার দু হাতে আহরণ করেছেন, তেমনি একই সঙ্গে 'জীবন-দেবতা'র ধ্যানে মগ্ন হয়ে ছিলেন। সৌন্দর্যের আকুতির সঙ্গে ভাগবত উপলব্ধির সমন্বয় ঘটানো অতি কঠিন ব্যাপার। হয়তো এজন্য কবিকে লোকচক্ষুর অগোচর অন্তর্জীবনে বহু বাধা সইতে হয়েছে, বিচিত্রপ্রকার দ্বিধা-সন্দেহ জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্বের দ্বারা তাঁর মন পীড়িত হয়েছে; কিন্তু বাহিরে সে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে নি। কবি এক আশ্চর্য নৈপুণ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরেন্দ্রিয়ের ধ্যানের ধনের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করেছিলেন। রামমোহনের ভুক্তি-মুক্তির আদর্শপ্রভাবেই এটি সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়।

অন্যপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একেবারে স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া মানুষ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্তর চেতনায় ভাগবত উপলব্ধি প্রগাঢ় ছিল কি ছিল না, অথবা সে অনুভূতি আদৌ ছিল কি না এ কথা জানবার উপায় নেই। কেন না জীবনের এই দিক সম্পর্কে তিনি কোনদিন কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নি। ঈশ্বর সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্রের এই নীরবতায় কেউ কেউ মনে করেন তিনি শূন্যবাদী ছিলেন। কিন্তু এ ধারণা প্রমাণসিদ্ধ নয়, নিছক অনুমানের উপর তার নির্ভর। তবে ঐশীবাদ তথা অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা যাই হোক না কেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বরচন্দ্র মূলতঃ মানবতাবাদী ছিলেন। তিনি জ্ঞানের রাজ্যে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছেন, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গভীর হৃদয়াবেগ তাঁর কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়াবেগের উৎস ছিল মানবপ্রেম। এই মানবপ্রেম ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে একটি স্বকীয় মহিমা দান করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে তুলনায় ঈশ্বরচন্দ্রকে লতাগুল্মের পাশে বনস্পতি আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডঃ জনসনের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। এই উভয় প্রতিতুলনারই মূলে রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ হৃদয়বত্তা। বস্তুতঃ এত বড় হৃদয়বান পুরুষ বাঙালী জাতির মধ্যে আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহ। কর্মজীবনে যিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠিন তিনিই আবার ছিলেন আর্ত পীড়িত নির্যাতিতের প্রতি ব্যবহারে কুসুমের মত কোমল। বাঙালী মাতৃসুলভ এই হৃদয়ের করুণাই ঈশ্বরচন্দ্রকে সর্বকালের জন্য জাতির বরেণ্য করে তুলেছে। পাণ্ডিত্য নয়, কর্মিষ্ঠতা নয়, বলশালিতা নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হল তাঁর হৃদয়ের এই বিশালতা। ঈশ্বরচন্দ্রের চাইতে পণ্ডিত, মনীষী, কর্মবীর বাঙালী জাতির মধ্যে আরও আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু হৃদয়বত্তায় তিনি আজিও অপরাজেয়। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এই মূল বৈশিষ্ট্যটি বুঝতে পারলে তাঁর কর্মধারার স্বরূপবিচার সহজতর হবে বলে মনে করি।

আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরচন্দ্রের সুবিদিত যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর হৃদয়বত্তার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এই বিভ্রান্তি আর থাকবে বলে মনে হয় না। আসলে যুক্তিনিষ্ঠা আর সত্যানুরাগ একই মানসিকতার এ-পিঠ ও-পিঠ। যিনি সত্যনিষ্ঠ তিনি স্বভাবতঃই যুক্তির সরণি অনুসরণ করে চলেন। যে সত্যানুরাগ ঈশ্বরচন্দ্রকে জ্ঞানের রাজ্যে যুক্তিবাদী হবার প্রেরণা দিয়েছে, সেই একই সত্যানুরাগ তাঁকে সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার সম্পর্কে অসহিষ্ণু করে তুলেছে। সত্যনিষ্ঠ মানুষের এক চোখে কল্যাণের প্রতি তৃষ্ণা, অন্য চোখে অন্যায় অবিচারের প্রতি সুতীব্র রোষ প্রকটিত। অন্যায় অবিচারের প্রতি এই প্রচণ্ড অসহযোগের মনোভাব থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে করুণার বন্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বালবিধবার উপর হিন্দু সমাজের অতিরিক্ত আচার-বিধির পীড়নের বিরুদ্ধে, বহুবিবাহের হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে স্বতঃই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়নিষ্ঠ মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এই বিদ্রোহেরই ন্যায়সঙ্গত পরিণাম হল বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, বহু-বিবাহ-নিরোধ আন্দোলন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষাসম্পর্কিত প্রয়াসকেও বুদ্ধিগত আন্দোলন অপেক্ষা হৃদয়গত আন্দোলন আখ্যা দেওয়াই সমধিক যুক্তিযুক্ত। বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষার সুযোগের অভাবজনিত বেদনাবোধই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যমকে প্রধানতঃ শিক্ষাখাতে চালিত করেছিল, এমন বললে ভুল বলা হবে না। একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি বালকবালিকাদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হয়েছিলেন।

এক দিক দিয়ে রাজা রামমোহনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের মিল আছে। সে হচ্ছে সংস্কারমুক্ত মননের অভ্যাস। রামমোহন স্বয়ং ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, অন্যপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের মানুষ এবং আজন্ম ওই আবহাওয়ায় বর্ধিত হওয়া সত্ত্বে গড়পরতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংরক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিকূল মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন নি। তদানীন্তন কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালেণ্টাইনের নিকট লিখিত পত্রে এবং কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর

নিকট প্রেরিত সুপারিশনামায় পণ্ডিতদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আপোসহীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এইখানেই শেষ নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু দর্শনকে জ্ঞানরাজ্যের শেষ কথা বলে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি হিন্দু দর্শনের পাশে পাশে পাশ্চাত্ত্য দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। এটিও তাঁর জ্ঞানরাজ্যে উদার-চিত্তভারই পরিচায়ক। রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাশ্চাত্ত্যমুখী মনোভাবকে আজকের দিনের মানদণ্ডে কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিজাতীয়তার লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তৎকালীন পরিবেশে বাঙালীর জড়তাগ্রস্ত সমাজজীবনকে কল্লোলিত করে তোলবার জন্য এই পাশ্চাত্ত্যমুখীনতার প্রয়োজন ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সে যুগে রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের মত মহাপুরুষের আবির্ভাব না ঘটলে বাঙালী সমাজের অসাড়তা কত দিনে ঘুচত বলা কঠিন।

মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরের মতই আর-একটি বিশিষ্ট আবির্ভাব। এ চরিত্রের গড়ন সম্পূর্ণ নিজস্বতামণ্ডিত। মধুসূদন আচার-আচরণে খ্রীষ্টান, কিন্তু তাঁর ভিতরের মানুষটি পূরাপূরি বাঙালী। তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বাঁধন-ছেঁড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাইকেল স্বজাতি ও স্বধর্ম-দ্রোহী হয়েছিলেন সত্য, তা বলে তাঁর অন্তর্জীবনে এ বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হয় নি। মাইকেলের গভীর কাব্যানুরাগ এবং ক্লাসিসিজম্-নিষ্ঠাই তাঁকে সেই বিপত্তি থেকে রক্ষা করেছিল। যে ক্লাসিক কাব্যসাহিত্যপ্রীতি মধুসূদনকে হোমার ভার্জিল দান্তে ট্যাসো শেক্‌স্‌পীয়র মিল্টন ইত্যাদি পড়বার প্রেরণা জুগিয়েছে, সেই অনুপ্রেরণার খাত বেয়েই তিনি বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস প্রভৃতির সমীপবর্তী হয়েছেন। সুগভীর কাব্যানুরাগ তাঁকে হাতে ধরে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত করেছে। আর তারই কল্যাণে তিনি তাঁর স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ জন্মার্জিত সংস্কারের দৃঢ়ভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি দ্বৈত ব্যক্তিত্ব আছে। মনস্তাত্ত্বিকেরা যা-ই বলুন, আমাদের বাহিরের আচার-আচরণ অন্তর্জীবনের

সঠিক প্রতিরূপ নয়। অন্ততঃ, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রভাবে, নানাবিধ সামাজিক ভাবসংঘর্ষের কারণে কোন কোন মানুষের মধ্যে এই দ্বিধাগ্রস্ততা—অন্তর ও বাহিরের এই বৈষম্য বিশেষরূপেই প্রকট হতে দেখা যায়। মধুসূদন এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত। ঘড়ির দোলকের মত দুই বিপরীত প্রবণতার মধ্যে তাঁর চিত্তবৃত্তি দোলায়মান। উনিশ শতকীয় বাংলার প্রারম্ভিক যুগের প্রচণ্ড ভাবসংঘাত মধুসূদনকে আচার-আচরণে করে তুলেছিল বিজাতীয়, কিন্তু কাব্যসাধনার মনোময় পথে বিচরণের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ফিরে পেয়েছিলেন। চরিত্রের এই দ্বিধাবিভক্তীকরণের ফলে মধুসূদনের জীবনে নিদারুণ সংগ্রামের পীড়ন দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই, তবে তাঁর জীবনের ও কাব্যের নাটকীয়তার ঐশ্বর্যের মূলও যে এইখানে সেও অতিশয় সত্য কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষায় ও অনুশীলনে পাশ্চাত্যের অনুসারী; মনোভাবে ভারতীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধাদির গঠন পাশ্চাত্য আদর্শাশ্রিত, কিন্তু তাঁর উপন্যাসের চরিত্র ও প্রবন্ধাদির বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বজাতিকেন্দ্রিক। জীবনের প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় হিতবাদ ও সাম্যবাদের আদর্শে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। তিনি সনাতন ভারতীয় হিন্দু আদর্শের একজন শ্রেষ্ঠ উদ্গাতায় পরিণত হন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, কিন্তু তাঁর এই জাতীয়তা সাম্প্রদায়িক মনোভাব-বিমুক্ত নয়। অন্যদিকে সামাজিক বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে তাঁকে মোটামুটি রক্ষণশীল বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাস শিল্প-সৃষ্টির অনবদ্য নিদর্শন, কোন কোন উপন্যাস রক্ষণশীলতাদোষদুষ্ট। ব্রহ্মণ্য সংস্কারের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংমিশ্রিত হলে যে ফল দাঁড়ায় তারই একটি শক্তিশালী প্রতীক হল বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র।

রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর চরিত্রের সঙ্গে এ চরিত্রের একটি প্রধান পার্থক্য হল, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে ভাব ও চিন্তাজগতের অধিবাসী, পূর্বোক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের ন্যায় কর্মক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ নয়। কোনরূপ সামাজিক

সংস্কারকার্যে বঙ্কিমচন্দ্র হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলে জানা যায় না। 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অমিত সংগঠননৈপুণ্য ও কর্মিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে এটিও তাঁর ভাবজীবনেরই একটি অঙ্গ। যে অর্থে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে ঐতিহ্যসচেতন হওয়া সত্বে বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়া যায় সে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ বিদ্রোহী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসাধারণ মেধা ও মনস্বিতা স্থিতাবস্থার (status quo) সংরক্ষণেই মুখ্যতঃ নিয়োজিত করেছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার মধ্যে আমরা পাই উপনিষদ্‌সুলভ আত্মসমাহিত তন্ময়তা। এ সাধনা বড় বেশী জ্ঞাননির্ভর, বড় বেশী শুষ্ক। দেবেন্দ্রনাথের অতিরিক্ত আভিজাত্যের সংস্কার ও মর্যাদাবোধ কোন সময়েই তাঁর সাধনাকে ভাবালুতামণ্ডিত হতে দেয় নি। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আত্যন্তিক হৃদয়াবেগজনিত গদগদ ভাব তিনি সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের আভিজাত্যবোধ এতই উগ্র ছিল যে, শোনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ মানসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আসেন, রামকৃষ্ণদেবের বিস্রস্ত বেশবাসদর্শনে দেবেন্দ্রনাথ প্রীত হন নি। এ থেকে এরূপ অনুমান করা অন্যায় নয়, দেবেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অভিজাত রুচিবোধের মানদণ্ডে ধর্মীয় ভাবসম্মোহন তেমন সঙ্গত বস্তু ছিল না। খুব সম্ভব বৈষ্ণবদের রোমাঞ্চিতকলেবর ধূলিধূসরিত প্রেমাকুলতার আতিশয্য দেবেন্দ্রনাথের বিচারপ্রবণ মনে একই প্রকার প্রতিকূল মনোভাবের সৃষ্টি করে থাকবে।

দেবেন্দ্রনাথের এই শুষ্ক, 'অভিজাত' ধর্মসাধনার আদর্শ স্বতঃই সাধারণের চিত্ত ভরে তুলতে পারে না। সাধারণ মানুষের মনকে ধর্মানুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হলে সর্বাগ্রে তাকে আবেগমথিত করা দরকার। আবেগের আন্দোলন ছাড়া জনচিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দেওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই মনোভাবের থেকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রের নব-বিধানের সূত্রপাত। আদি ব্রাহ্ম

সমাজের বিধিবিধান হৃদয়াবেগবর্জিত; নব-বিধানের ধর্মান্দোলনের মধ্যে ভাবানুভূতির প্রাবল্য অতি প্রত্যক্ষ। একদিকে কঠোর অনুশাসন ও শান্ত সমাহিতি; অন্যদিকে হৃদয়োচ্ছ্বাস। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কীর্তনানন্দের দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের শুষ্ক পঞ্জরের মধ্যে প্রাণের জোয়ার আনবার চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসবার পর কেশবচন্দ্রের মধ্যে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কেউ কেউ এ কথা স্বীকার করেন না, তবে ব্রাহ্মধর্মের পূর্বাপর ইতিহাস বিচার করলে ব্রহ্মানন্দের উপর রামকৃষ্ণদেবের অপরিমেয় প্রভাব মানতেই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ভক্তির তিনি মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ। ভগবৎচরণে আত্মসমর্পণের এমন নিবিড় আকৃতি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পর আর দেখা যায় নি। ভগবৎচেতনার সঙ্গে জীবচেতনার এই পরম একাত্মতার অনুভূতি থেকে তিনি পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রেম ও ঔদার্য। রামকৃষ্ণ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এটি তাঁর সাধনার বড় কথা নয়, বড় কথা হল তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্যক্‌দর্শী চক্ষে সকল ধর্ম সমান ছিল। আজকের দিনের হিংসা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় সর্বধর্মের সাম্যের বাণী কত মূল্যবান তা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব। জীবনের দিকে দিকে পরিদৃশ্যমান হিংসাকে শোধিত ও নিরাকৃত করা যায় একমাত্র সহনশীলতা ও প্রেমের দ্বারা। এই প্রেমের বাণীই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনার মূল বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ অভয় ও শক্তিমন্ত্রের উদ্‌গাতা। তিনি বেদান্তের আদর্শে ভারতবর্ষের জীবনকে পুনর্গঠিত করবার প্রয়াস করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের তিনি উত্তরসাধক। রাজনৈতিক নেতা না হয়েও এ দেশে সমাজবাদের বাণী তিনিই প্রথম প্রচার করেন, অবশ্য সূত্রাকারে। জাতীয়তা-যজ্ঞেরও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক। তিনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু সাধারণের জন্য কর্মযোগের আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে প্রচার করেছিলেন। সমাজ-সেবাকে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। এতে তাঁর

আধুনিক মানসিকতা প্রমাণিত হয়। ধ্যানের আত্মসমাহিত প্রশান্তি নয়, সংগ্রামকেই তিনি মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে নির্দেশ করে গেছেন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন পাশাপাশি মেলে ধরলে আমরা দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাই। একটির মূলাধার হল প্রেম, অন্যটির শক্তি। একদিকে মৈত্রী, ক্ষমা, বিনয়, দীনতা, আত্মঅবলুপ্তি; অন্যদিকে আত্ম-মর্যাদাবোধ, আত্মপ্রতিষ্ঠা, জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা, নির্ভীকতা। এই আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর সে বিচার অবান্তর, তবে সাংসারিক অভিজ্ঞতায় দেখতে পাওয়া যায়, সংসারে এই দুই আদর্শেরই প্রয়োজন আছে। একটিকে অপরটির পরিপূরক বলা যায়। প্রেমহীন শক্তি উদ্ধত সুতরাং অশ্রদ্ধেয়; অন্যপক্ষে শক্তিবিবর্জিত প্রেম ক্লীবত্বের নামান্তর। প্রেম দ্বারা শক্তি শোধিত কিংবা শক্তি দ্বারা প্রেম পরিপুষ্ট হলে তবেই শক্তি ও প্রেমের সার্থকতা।

সভ্যতা ও ভব্যতা

আমার সম্পর্কে অভিযোগ এই যে, সাহিত্য-প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে আমি বড় বেশী নীতিবাক্য আওড়াই। আমি মানুষটি সুনীতিবাদী জীব কিনা জানি না, তবে এটি ঠিক, সৎ সাহিত্যের সঙ্গে সন্নীতির সম্পর্ক আমি স্বীকার করি। সাহিত্যে কাকে শ্লীলতা বলে কাকে অশ্লীলতা এই নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই, তবে এ বিষয়ে বোধ করি মতদ্বৈধের কোন অবকাশ নেই যে সমস্ত সৎ সাহিত্যই মানুষের প্রবৃত্তিকে উর্ধ্বগামী করে। শ্লীলতা কিংবা শালীনতা কোনটাই সাহিত্যের লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হতে পারে না। মানুষের অনুভূতিকে মার্জিত করবার পক্ষে এদের যতখানি কার্যকারিতা ততটাই এদের সার্থকতা। সাহিত্যবিশেষ পাঠ করার ফলে পাঠকের মন উর্ধ্বগামী না হয়ে যদি নিম্নগামী হয় বুঝতে হবে সে সাহিত্য দোষদুষ্ট। তেমন সাহিত্য দৃশ্যতঃ হাজার শ্লীলতাগুণমণ্ডিত হোক না কেন, প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্যায়নে তা অশ্লীল। তেমনি এর উল্টোটাও সত্য। সাহিত্যের কোনও চিত্রিত বিষয় আপাতবিচারে 'অশ্লীল' আখ্যাপ্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু পাঠকচিত্তের উপর তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া যদি সুন্দর ও কল্যাণপ্রদ হয়, তবে তাকে আমরা সাহিত্যে পাংক্তেয় করে নিতে বাধ্য।

সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্তির এই উর্ধ্বগামিতার অথবা নিম্নগামিতার তত্ত্ব আমি স্বীকার করি। এই দিক দিয়ে যদি কেউ আমাকে নীতিবাদী বলতে চান তো 'মেনে নিই সে নিন্দার কথা।'

প্রবৃত্তির এই উর্ধ্বগামিতা আজ আমার বিশেষ আলোচ্য বিষয়। আমি গোড়ায়ই বলেছি, সৎ সাহিত্যমাত্রই মানুষের প্রবৃত্তিকে উর্ধ্বগামী করে। সৎ সাহিত্য পাঠের ফলে মানুষের মনে দয়া দাক্ষিণ্য স্নেহ মমতা কারুণ্য প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলির প্রভাব স্বভাবতঃই অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। এবং তদনুপাতে তার মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেয় অন্যায়-অবিচার, কুশ্রীতা ও

সর্বপ্রকার মিথ্যার বিরুদ্ধে তীব্র রোষ ও ঘৃণা। যে সাহিত্য শুধুমাত্র ঘটনার নিরপেক্ষ বিবৃতিদানেই সন্তুষ্ট, পাঠকের মনকে উচ্চদিকে চালিত করে না, রিয়ালিজমের নাম করে তাকে নিয়ে যতই উৎসাহ প্রকাশ করি না কেন, তেমন সাহিত্যের সার্থকতা সিদ্ধ নয়। সাহিত্য ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞান নয় যে তার ভিতর ভাবাবেগের স্থান থাকবে না; বস্তুতঃ ভাবাবেগই হল সাহিত্যের প্রাণ, আর পাঠকচিত্তে এই ভাবাবেগ সঞ্চারেই সাহিত্যের সার্থকতা।

এই কথা যদি স্বীকার করি তা হলে সেই সঙ্গে আর একটি কথা এসে পড়ে। সেটি এই যে, সাহিত্যপাঠের ফলে মনুষ্যস্বভাবের ঊর্ধ্বমুখী ঝোঁক শুধুমাত্র প্রবৃত্তি বা প্রবণতার সীমান্তেই আবদ্ধ থাকে না, তা আচরণের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সৎসাহিত্যপাঠজনিত প্রতিক্রিয়ার বশে দয়া দাক্ষিণ্য প্রীতি করুণা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি যে শুধু মনের ভিতরই লালিত হতে থাকে তা-ই নয়, সেগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চলন বলন আচরণের মধ্যেও সম্যক্ প্রকাশিত হয়। একটি লোকের কথাবার্তা ধরনধারণ এবং সাধারণ সামাজিক ব্যবহার দেখে বলে দেওয়া যায়, সে লোক সাহিত্যবুদ্ধিযুক্ত কি না, সংস্কৃতির আশীর্বাদপুষ্ট কি না। এমন যদি হয় যে, কোন ব্যক্তি আজীবন শিল্পচর্চা করল অথচ তার ব্যক্তিগত বা সামাজিক ব্যবহার নানা দিক থেকে দৈন্যযুক্ত রয়ে গেল তা হলে বুঝতে হবে তার উপর সাহিত্যপাঠের ফল ব্যর্থ হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে, সে ব্যক্তি যে জাতীয় শিল্পসাহিত্যের অনুশীলন করেছে তা আশানুরূপ উঁচুদরের নয় বলেই তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে আক্ষেপের কারণ থেকে গেছে। সে যাই হোক, এটি বোধ করি নির্ভয়ে বলা চলে যে সৎ সাহিত্য মানুষকে সদ্বুদ্ধিযুক্ত করে, তার বিপরীতে মানুষ ভ্রান্তবুদ্ধিকবলিত হয়।

মুশকিল হচ্ছে নন্দনবাদীদের (**aesthetes**) নিয়ে। তাঁরা সাহিত্যকে শুধু রসোপভোগের উপায়স্বরূপ জ্ঞান করেন এবং ওই উপভোগেই তাঁরা মগ্ন। সাহিত্যের কাছে তাঁদের দাবী ভোগের দাবী, মানসিক বিলাসের দাবী; এই

দাবী পরিতৃপ্ত হলে তাঁদের আর কিছু চাই না। সাহিত্য ভোগের বস্তু তাতে সন্দেহ কি, তবে মাত্র এইটুকুর মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ করে দেখলে তাকে বুঝি ঠিকভাবে দেখাই হয় না। নন্দনবাদীরা যেন সাহিত্যকে জীবনের সীমা থেকে দূরে সরিয়ে এনে তাকে একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে ভোগ করার পক্ষপাতী। সাহিত্যের রসভোগের দ্বারা তাঁদের জীবন আশানুরূপ সংস্কৃত হল কি না, জীবনের অযুত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হবার মত যথেষ্ট মানসিক বল, দৃঢ়তা, স্বভাবের মাধুর্য আর প্রীতিপূর্ণ মনোভাব তাঁরা সাহিত্য থেকে আহরণ করতে পারলেন কি না সেটা যেন তাঁদের আদৌ বিচার্য নয়। তাঁদের দৃষ্টিতে জীবন সাহিত্য থেকে বিযুক্ত স্বতন্ত্র একটি জগৎ। এ জগতের করণকারণ কাঠখোট্টা, দাবীদাওয়া কঠোর, সুতরাং রসভোগের মোহের প্রাবল্যে এই কুলিশকঠিন বাস্তব পৃথিবীর দিকে পিঠ দিয়ে থাকাই তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। অর্থাৎ নন্দনবাদীরা হলেন সাহিত্যজগতের মৃণালভুক্ সম্প্রদায়, সুখের জড়িমায় আর শ্লথ আলস্যে তাঁরা মৃণালের ডাঁটা চিবিয়ে চিবিয়ে সারা জীবন কাবার করে দিতে প্রস্তুত, তবু সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক প্রাণ গেলেও স্বীকার করবেন না।

সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের এই বিরোধের চেতনা স্পষ্টতঃই নন্দনবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীকে খণ্ডিত করে রেখেছে। তাঁরা সাহিত্যশিল্পের অনুরাগী, কিন্তু জীবনশিল্পের নয়। বস্তুতঃ জীবনও যে সাহিত্যের মত একটি বড় শিল্প এ তাঁদের ধারণায় আসে না। ফলে সাহিত্য তাঁদের চোখে চিরকাল রসপিপাসা নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ হয়েই রইল, জীবনকে সমৃদ্ধতর করার কাজে লাগল না। সাহিত্য তাঁদের প্রেরণার স্থল নয়, নিতান্তই আত্মরতির উপায় মাত্র।

অভিযোগটি যে কথার কথা নয় নন্দনবাদীদের আচরণ থেকে তার প্রমাণ দেওয়া যায়। কেউ হয়তো রবীন্দ্রসাহিত্য আজীবন অধ্যয়ন করেছেন, রাবীন্দ্রিক ধ্যানধারণার দ্বারা তিনি হয়তো আষ্টেপৃষ্ঠে আচ্ছন্ন, তারপরও যদি দেখি তিনি আত্মকেন্দ্রিকতার বিবরে স্বেচ্ছাবদ্ধ, সামাজিক দুঃখদুর্গতির দৃষ্টান্তে তাঁর চিত্ত সাড়া দেয় না, অন্যায়ের প্রতিকারে তিনি যত্নবান নন, কণামাত্র স্বার্থত্যাগেও তিনি নারাজ, তা হলে তার থেকে কী মনে হওয়া সম্ভব?

অতিরিক্ত রসভোগতৎপর নন্দনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতাই কি তার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না? রবীন্দ্রসাহিত্যের ন্যায় এক বিশাল ও মহান সাহিত্যের অধ্যয়ন-অনুধ্যানের পরেও যাঁর প্রবৃত্তি উর্ধ্বগামী হয় না, যাঁর আচরণ সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার বৃত্তের মধ্যেই শুধু আবর্তিত হয়, কেবলমাত্র রসপিপাসার আন্তরিকতার নজীরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করা কঠিন।

নন্দনবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ নন্দনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর এই ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা জীবন আর শিল্পের মধ্যে একটা কাজ-চালানো রফার পক্ষপাতী। এই রফায় জীবনের দাবী আংশিক স্বীকার করে নেওয়া হয়, অথচ নন্দনবাদীসুলভ রসমনস্কতাকেও পরিত্যাগ করা হয় না। সাহিত্যক্ষেত্রে এই-যে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় এঁদের কথা হচ্ছে, সাহিত্য মূলতঃ রসোপভোগেরই ব্যাপার, তবে পরোক্ষভাবে তার দ্বারা জীবনকেও কিয়ৎ-পরিমাণে প্রভাবিত করা যায়। যেমন, সাহিত্যপাঠের ফলে জীবনকে মার্জিত করা যায়, শালীনতা-মণ্ডিত করা যায়। আচার-আচরণে কথাবার্তায় মানুষকে পরিশীলিত রুচির অধিকারী করা যায়। যে সমস্ত গুণের দরুন সভ্যতা সভ্যতা নামে কীর্তিত হয় সে সকল বৈশিষ্ট্য সাহিত্যচর্চার দ্বারা অধিগম্য হয় কি না এঁরা সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলতে পারেন না, তবে সাহিত্যপাঠের দ্বারা মানুষকে যে ভব্য করা যায় সে সম্বন্ধে এঁরা স্থিরনিশ্চয়।

আমাদের সাহিত্যে এই মধ্যগ অভিমতের মুখপাত্ররূপে আচার্য প্রমথ চৌধুরীর নাম করা চলে। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও রুচিমান করত। সমাজের পক্ষে এ-ও একটা কম লাভ নয়।…বৈদগ্ধ্য যে একটি সামাজিক গুণ, এ কথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবতঃ চিরকাল করবে। এ সকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক, অলংকৃত করে। এবং এ সকল গুণ কাব্য ও কলার চর্চা ব্যতীত

রক্তমাংসের শরীরে আপনা হতে ফুটে ওঠে না।" ["বই পড়া", 'প্রবন্ধ সংগ্রহ,' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-৬৫]

আজকের দিনে আমরা যাঁরা বাংলায় প্রবন্ধ-সাহিত্য অনুশীলনের চেষ্টা করছি, আচার্য প্রমথ চৌধুরী তাঁদের সকলেরই গুরুস্থানীয় লেখক। তাঁর নিকট আমাদের ঋণের অন্ত নেই। তবে সেই সঙ্গে এ-ও জানি, চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক ব্যাপারেই পার্থক্য। এই বৈসাদৃশ্যের একটা প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, চৌধুরী মহাশয় বড় হয়েছিলেন আভিজাত্য ও বনেদিয়ানার আবহাওয়ায়, আর আমরা এ যুগের মানুষ বড় হয়েছি গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায়। সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণাপুষ্ট একজন অভিজাত ব্যক্তির চক্ষে আচরণের শালীনতা, ভব্যতা, কেতাদুরস্ত আদবকায়দা যত মূল্যবান, তথাকথিত কৌলীন্যগর্বহীন সাধারণ মানুষের নিকট সে সকল বস্তু তাদৃশ মূল্যবান মনে না-ও হতে পারে। আজকের মানুষ আমরা সাহিত্যের কাছে যখন হাত পাতি তখন সভ্যতার খোলসের অতিরিক্ত আরও কিছু বস্তু প্রত্যাশা করি। সভ্যতার বহিরঙ্গে আর আধুনিক মানুষের মন ভরে না, সে সভ্যতার প্রাণবস্তুটিকেই পেতে চায়। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা দিয়ে কী হবে, যদি সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রধান সদ্‌বৃত্তি-গুলিকেই আয়ত্ত করতে না পারা গেল? সাহিত্যপাঠের ফলে আমার মধ্যে যদি সত্যকার মানবপ্রীতিরই উন্মেষ না হল তবে শুধুমাত্র ভব্যতা দিয়ে কী করব? বরং ভব্যতা যে অনেক সময় মনের প্রকৃত ইচ্ছা অভিপ্রায় আর উদ্দেশ্যকে গোপন করে রাখে সে কথা স্বীকার করাই কি সমধিক সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক নয়?

এ কথা শুধু আমাদেরই কথা নয়, স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীও এ কথা স্বীকার করে গেছেন। তিনি ওই "বই পড়া" প্রবন্ধে একটু বাদেই বলেছেন, "তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সভ্যতা এ সকল গুণের যতটা মূল্য দিত আমরা ততটা দিই নে। তার কারণ, সেকালের সভ্যতা ছিল অ্যারিস্টোক্রাটিক আর একালের সভ্যতা হচ্ছে ডেমোক্রাটিক। সেকালে তাঁরা চাইতেন আকার, আমরা

চাই বস্তু। তাঁরা দেখতেন মানুষের ব্যবহার, আমরা দেখতে চাই তার ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ। ক্ল্যাসিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা করলে এ প্রভেদ সকলেরই চোখে ধরা পড়বে।" [সমগ্রন্থ, পৃ. ১৬৫]

কথাগুলি সর্বাংশে মান্য। শুধু এক জায়গায় আমাদের আপত্তি। চৌধুরী মহাশয় নিজেকে ডেমোক্র্যাটিক সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত মানুষ বলে দাবী করেছেন, আমরা বলব অ্যারিস্টোক্র্যাটিক সভ্যতার ধারাধরনের সঙ্গেই যেন তাঁর সমধিক মেজাজের মিল ছিল। অর্থাৎ মূলতঃ তিনিও ছিলেন ক্ল্যাসিক সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারাবাহী লেখক, আর সে-কারণ তাঁর রচনাবলীতে ফর্মেরই প্রাধান্য, বস্তুসমৃদ্ধি গৌণ। সাহিত্যে যে অংশে আর্ট সে অংশে তাঁর বিচরণ, যে অংশে আত্মা সেখানে তাঁর চলনবলন তেমন স্ফূর্তিযুক্ত নয়।

চৌধুরী মহাশয় কেন বৈদগ্ধ্যের উপর এত জোর দিতে চান তা তাঁর এই রূপভক্তি হতেই টের পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ সাহিত্যে রূপ (**form**) এবং বস্তুর (**content**) দ্বন্দ্ব এবং জীবনে সভ্যতা ও ভব্যতার দ্বন্দ্ব মূলতঃ সমস্তরের দ্বন্দ্ব। রূপ ভব্যতার প্রতীক, বস্তু সভ্যতার প্রতীক ; আমরা আধুনিক সাহিত্যের কারবারীরা বস্তুকেই অধিক মূল্যবান মনে করি, সুতরাং জীবনেও সভ্যতাকেই অধিক মূল্য দিই। আমাদের নিকট বাহ্যিক শালীনতার চাইতে হৃদয়বত্তা ঢের বড় গুণ। চোস্ত কথাবার্তায় আমাদের আস্থা কম। বরং কথাবার্তা কিঞ্চিৎ স্থূল হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অন্তরটি দরাজ হওয়া চাই, এই আমাদের দাবী। যে ব্যক্তি ভিতর-ফোঁপরা অথচ বাইবে চটকদার, যে ব্যক্তি চিত্তসম্পদে দীন অথচ আচার-আচরণে চৌকস, তেমন ব্যক্তির চাকচিক্যে আমরা ভুলি না। পক্ষান্তরে আত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা আত্মীয়জ্ঞানে কাছে টানবার পক্ষপাতী, তা তিনি তথাকথিত বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত হোন আর না-ই হোন।

মনে হয়, মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার সাংস্কৃতিক জীবনের একটা সামান্য অংশ মাত্র দখল করে আছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

তার চেয়ে অনেক, অনেক উঁচুদরের জিনিস হল পরের দুঃখে বেদনা অনুভব করবার সহজ ক্ষমতা, পরের কারণে আত্মসুখ বলিদানের স্পৃহা এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্যপিপাসা। কথিত মানদণ্ডের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নয়, তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, তথাকথিত বৈদগ্ধ্যের অনুশীলনকারীদের যোগ্যতা এ বিষয়ে সব চাইতে কম। বাহ্যিক ভব্যতার চর্চা জিনিসটার মধ্যেই এমন কিছু আছে যা মনকে অসাড় করে তোলে। বরং যাঁদের আচার-আচরণ কম চৌকস, কথাবার্তা কম চোস্ত, তাঁদের মধ্যেই যেন হৃদয়বত্তার পরিমাণ বেশী। অন্ততঃ আমাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতা আমাদের এই কথাই বলে। অবশ্য এ কথার দ্বারা আমি আচার-আচরণের অশালীনতা ও রুচির স্থূলতা সমর্থন করছি না; আমার শুধু বক্তব্য এই যে, সাহিত্য-চর্চার দ্বারা মানুষের আচার-আচরণগত উন্নতি যেমন কাম্য, তার চাইতে বহুগুণে কাম্য তার হৃদয়বৃত্তির স্ফুরণ। যে সাহিত্য মনকে আংশিক উপবাসী রেখে মানুষের জীবনের বাহ্যিক প্রকরণাদিকে বড় করে তোলে, সে সাহিত্যে আর যারই হোক আধুনিক মানুষের মন ভরবার নয়। সাহিত্যের দরবারে আমরা শুধু রূপভক্ত নই, গুণলুব্ধ। যে সাহিত্যে গুণের মর্যাদা স্বীকৃত, সে সাহিত্য স্বয়ং গুণবান এই আমাদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় লিখেছেন, "কমল-হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে, তার থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার।" কবি-কথিত এই আলো, আত্মার আলো, তাকে বাহিরের চাকচিক্যজনিত বিস্ফুরণ মনে করলে নিতান্ত ভুল করা হবে।

সাহিত্য ও স্বধর্ম

পূর্ববর্তী নিবন্ধে সাহিত্যানুশীলনের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কের আলোচনা করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গটিকে আরও একটু বিস্তারিত করতে চাই, অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

কথায় বলে, 'ভেক না হলে ভিখ মিলে না।' কথাটি সত্য। প্রত্যেক বৃত্তিরই একটা নিজস্ব ভেক থাকা চাই। তা নইলে সেই বৃত্তির বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরোয় না। সাধু-সন্ন্যাসীরা কৌপীনবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়ান, ফ্যাশানেব্‌ল সন্ন্যাসীরা অঙ্গে গেরুয়া ধারণ করেন। এই দুই সম্প্রদায়ের পক্ষেই ওঁদের নিজ নিজ পোশাকটি সত্য। ওই ভেকের দ্বারাই তাঁদের সাধারণ দশজন থেকে আলাদা করে চিনে নিতে সুবিধা হয়। তেমনি উকিলের পক্ষে উকিলী ভেক, ডাক্তারের পক্ষে ডাক্তারী ভেক, পুলিসের পক্ষে পুলিসী ভেক অপরিহার্য। এমন কি, নিতান্ত গোবেচারা শান্তশিষ্ট যে স্কুলমাস্টার, তাঁরও একটি নিজস্ব ধড়াচূড়া চাই। পাঞ্জাবির উপর কাঁধে একটা পাটকরা চাদর না ঝুলালে যেন শিক্ষকের প্রকৃত রূপটি খোলে না। তার উপর চোখে যদি চশমা থাকে, তা হলে তো সোনায় সোহাগা।

'ভেক' কথাটি এখানে সদর্থে প্রযোজ্য। তার মধ্যে কপটতার কোন কথা নেই। সাধু-সন্ন্যাসীর গেরুয়া ভেকটি আদৌ সাধনার ছদ্মবেশ নয়, তা বরং সাধুতাকে ফুটিয়ে তুলতে আরও বেশী সহায়তা করে। জ্ঞানীরা অবশ্য প্রশ্ন করেছেন, মন না রাঙায়ে শুধু মাত্র কাপড় রাঙাবার সার্থকতা কী। তার উত্তর এই যে, ওই কাপড় রাঙাতে রাঙাতে মনেও একদিন রঙ ধরে—এককালে যা ছিল শুধু বাইরের পোশাক তা অন্তরের পোশাক হয়ে দাঁড়ায়। মনের উপর পরিপার্শ্ব ও অন্যান্য প্রকরণাদির প্রভাব অত্যন্ত গভীর। পোশাক-আশাক, আহার্য এবং আহারপ্রণালী, বাড়ি-ঘর-দরজা ও সংশ্লিষ্ট নানাবিধ সরঞ্জাম, চারিপাশের আবেষ্টনী—এ সবই মনকে একটু একটু করে

অদৃশ্যভাবে অথচ সুনিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করে। এ কথা যেমন সাধারণ জীবনযাত্রা সম্পর্কে সত্য তেমনি জীবনের এক-একটি অংশ সম্পর্কেও সমান সত্য। বিশেষ, আমাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে এ সত্যের গভীর প্রতিভাস দেখতে পাই। কেউ যখন অবগাহন-স্নানান্তে গরদের বস্ত্র পরিধান করে ঠাকুরঘরে গিয়ে পূজোয় বসেন, নিছক আচার-বিধি প্রতিপালনের জন্যই যে তিনি এটা করেন তা নয়, অন্তরের পরিশুদ্ধতাও এর দ্বারা অনেকখানি পরিমাণে অধিগত হয়। অধিকন্তু ফুলের গন্ধ, ধূপের ধোঁয়া আর চন্দনের সুবাসের মধ্যে এমন একটা পবিত্রতার ভাব আছে, যা দেবোপাসনার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। এ সব প্রকরণ বাদ দিয়েও অবশ্য পূজা যে না হতে পারে এমন নয়, তবে পূজক সেই ক্ষেত্রে নিজের উপর অনাবশ্যক ভার আরোপ করেন। যে কাজ স্বচ্ছন্দে বাহ্যিক প্রকরণাদির উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া চলতে পারত, সে কাজের ঝুঁকি স্বয়ং গ্রহণ করায় দায়িত্ব জটিলতর হয় মাত্র।

কার্যের সঙ্গে প্রকরণের নিগূঢ় সম্পর্কের আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি সৈনিককে যে সৈনিকোচিত বেশে সজ্জিত করা হয় সে আক্রমণের জন্যও নয়, আত্মরক্ষার জন্যও নয়, প্রধানতঃ সৈনিকের মনে সাহস ও একতাবোধ সঞ্চারের জন্য। লড়াইয়ে সব চাইতে যেটি বেশী দরকার তা হচ্ছে সাহস ও দৃঢ়তা। সৈনিকের জাঁকালো বেশটি সেই সাহস ও দৃঢ়তারই প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র। হাতের ভিতর একটা রাইফেল গুঁজে দেওয়া থাকলে শত্রুকে আক্রমণ করতে বা শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে কতদূর কী সহায়তা হয় জানি না, তবে গুলিগোলার শব্দে ঠক্-ঠক্ করে হাত-কাঁপা যে অনেকখানি পরিমাণে বারণ হয় সে কথা নিশ্চিত।

এমনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সাহিত্যের উল্লেখ দিয়ে নিবন্ধের সূচনা হয়েছিল, সাহিত্যের কথাতেই ফিরে আসা যাক।

আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, সাহিত্যসেবার সঙ্গে সাহিত্যোচিত জীবনযাত্রার যোগ অতি নিগূঢ়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যিনি মনেপ্রাণে ভালবাসেন এবং

একাগ্র নিষ্ঠায় তার সেবা করতে চান, তাঁর পক্ষে বিজাতীয় জীবনযাত্রা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। অবশ্য বিজাতীয় জীবনযাত্রা সর্বাবস্থায়ই ঘৃণার্হ, তবু শিল্পী-সাহিত্যিকের বেলায় এর অনিষ্টকারিতা সব চাইতে সাংঘাতিক। একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের বেলায় বিদেশী ধড়াচূড়া তবু বরং স্বীকার করে নেওয়া চলে—যদিও অপরিহার্য কি না সন্দেহ—কিন্তু শিল্পীর পক্ষে তা নৈব নৈব চ। শিল্পীর কাজ, সাহিত্যিকের কাজ শিল্পসাধনার মধ্য দিয়ে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করা। সারাক্ষণ বিদেশী ধড়াচূড়ায় আবৃত থেকে এই মহৎ কাজ সুসম্পন্ন করা যায় কি না সন্দেহ। আমি মাতৃভাষার সেবা করি বলে গর্ব করি, কিন্তু আমার পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার-আচরণাদির মধ্য দিয়ে কেবলই যদি বিজাতীয় রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পেতে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে আমার সাহিত্যনিষ্ঠায় খাদ আছে, আমি অন্তরের সঙ্গে আমার জাতীয় ভাষাকে ভালবাসতে পারি নি। এবং যে পরিমাণে এই খাদ, সেই পরিমাণেই আমি শিল্পসাধনার ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ব। দেশের মানুষকে আপন করে নেওয়ার কাজেও আমার সমানুপাতিক ত্রুটি থেকে যাবে। দৃষ্টিভঙ্গীর এমনতর বিচ্যুতি নিয়ে সাহিত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ অকল্পনীয়।

বাঙালী লেখকের পক্ষে বাঙালী পোশাক-পরিচ্ছদটাই একমাত্র শোভন এবং সঙ্গত বেশ। শুধু তাই নয়, তাঁর জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটির মধ্যেও ওই বাঙালী-প্রীতি প্রতিফলিত হওয়া দরকার। জীবনযাপন-প্রণালীতে ও হাবেভাবে যিনি কড়ারকমের সায়েব তাঁর পক্ষে কদাচ মাতৃভাষাকে আত্মগত করা সম্ভব নয়। এমন হতে পারে তিনি মাতৃভাষাকে ভালবাসেন, ওই ভাষার মাধ্যমে তিনি তাঁর শিল্পকল্পনা ও চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলতেও চান, কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত সায়েবিয়ানাই ওই ক্ষেত্রে তাঁর সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তিনি তাঁর বিজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নিজেই নিজের ঐকান্তিকতাকে খণ্ডন করবেন। সাহিত্যের সেবা করতে হলে বিনীত হতে হয়, স্থির-ধীর হতে হয়, সাধারণ দেশবাসীর আত্মীয়তা অর্জন করতে হয়—বিজাতীয় হাবভাব এই সব সদ্‌বৃত্তির মূর্তিমান প্রতিবাদস্বরূপ। সাহিত্যের মাধ্যমে আমি আমার মনোভাব দেশের

মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই, অথচ বাস্তব জীবনে বিজাতীয়তার টানে দেশের মানুষকে অনাত্মীয় জ্ঞানে দূরে ঠেলে রাখি—এ দুই প্রস্তাব পরস্পরবিরোধী।

ভাষা জিনিসটা পড়ে-পাওয়া বস্তু নয়। ওটির সঙ্গে জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি আচরণের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে অর্থের যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা থাকে, সেই ব্যঞ্জনা স্বদেশীয় জীবন-রীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ফলেই শুধু অধিগত হওয়া সম্ভব। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, প্রচলিত অর্থ এবং শিল্পগত অর্থ—এই ত্রিবিধ ধারণা গ্রন্থাদি অধ্যয়নের ফলে কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করা যায় বটে, কিন্তু মনে হয় তাদের সবটুকু তাৎপর্য আয়ত্ত করবার পক্ষে স্বদেশীয় রীতিনীতির গভীর জ্ঞান আবশ্যক। শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্যোতনার বোধ জীবন-পরিচয় থেকে আহৃতব্য, গ্রন্থ-পরিচয় থেকে নয়। বিদেশী ভাষার ইডিয়ম যে আমরা সহজে আয়ত্ত করতে পারি না তার মূলও এইখানেই নিহিত। ইংরেজী-শিক্ষিত আমাদের অধিকাংশেরই বিদেশের সঙ্গে যেটুকু যোগ, তা গ্রন্থমাধ্যমে নিষ্পন্ন, জীবনমাধ্যমে নয়। ফলে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কখনই তেমন পাকা হতে পারে না। তেমনি এর উল্টোটাও সত্য। মনোভাবের দিক দিয়ে সর্বদাই পশ্চিমের অভিমুখে তাকিয়ে আছি, অথচ চর্চা করি প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের—এমন যোগাযোগ সোনার পাথরবাটির মতই অসম্ভব।

জাতীয়তা-বিজাতীয়তার প্রশ্নে ভাষাকে প্রাধান্য দেবার কারণ, ভাষা সাহিত্যের দেহ, দেহ না হলে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয় না। দেহটাই যদি জীর্ণ ও ভগ্ন হয়, তাতে প্রাণের স্ফূর্তি আসতে পারে না। এই কারণে সাহিত্যশিল্পে সর্বপ্রথম করণীয় হল ভাষারীতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় সাধন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মাত্রই শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পীও বটেন। ভাষাশিল্পেরও আবার কেন্দ্র অধিকার করে আছে শব্দজ্ঞান। কেন না কথা সাজাবার খেলা আসলে শব্দ সাজাবারই খেলা। এই শব্দজ্ঞান কিছু অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়; যুগ থেকে যুগে শব্দার্থের ধারণায় তারতম্য হয়ে থাকে। সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দার্থেরও বদল ঘটতে থাকে।

কোন একটি শব্দের এক সময় যে অর্থ ছিল পরবর্তীকালে তার সে অর্থ নাও থাকতে পারে। দেশ এবং দেশবাসীর ইতিহাসের সঙ্গে গভীর পরিচয় না থাকলে শব্দার্থ সম্বন্ধে এই তারতম্যের জ্ঞান অধিগত হতে পারে না। স্বদেশীয় জীবনযাত্রার ধারার সহিত নাড়ীর যোগ যেখানে বিদ্যমান সেখানে এই জ্ঞানলাভের জন্য বিশেষ আযাস করতে হয় না, সেটি প্রায়ই সহজ সংস্কারের মত অন্তরের ভিতর ওতপ্রোত হয়ে থাকে।

কাজেই সাহিত্যানুশীলনের সঙ্গে স্বদেশীয় জীবনপরিচয়ের একটা গভীর যোগ আছে। চব্বিশ ঘণ্টা যিনি বিদেশী জীবনাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আছেন, চেষ্টা করলেই তিনি মাতৃভাষার অন্তরে প্রবেশ করতে পারেন না। তাঁর বিজাতীয় খোলসটাই সাহিত্যানুশীলনের পথে সর্বপ্রধান বাধা হয়ে ওঠে। এই কারণে মাতৃভাষার সেবকদের পক্ষে জাতীয় ধ্যানধারণাদি কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণেই অভ্যাস করা ভাল। পোশাকে-আশাকেও তাঁদের ষোল-আনা স্বদেশী হওয়া উচিত। কথাবার্তায়ও একই নীতি অনুসৃতব্য। ধুতি-পাঞ্জাবিটা যদি ভেক হয়, তা হলে বাঙালী লেখকের পক্ষে ওই ভেকই ধারণযোগ্য। ওতে আর কিছু ফল হোক আর না হোক জাতির সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপনের পথ সহজতর হয়।

কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত হিসাবে মাইকেল মধুসূদনের নামোল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু এ রকম দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে দুটি খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। আর সত্যি বলতে, মধুসূদনকে তাঁর বাহ্যিক বিজাতীয়তার জন্য মূল্যও বড় কম দিতে হয় নি। জাতীয় ধর্মে স্থিত থাকলে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আরও বহুগুণ সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কাজেই বিজাতীয়তাটা তাঁর ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সহায়ক হয় নি, বরং তাঁর প্রতিকূলতা করেছে। মাতৃভাষার সেবকের পক্ষে অতটা মূল্য দিয়ে বিজাতীয়তার আদর্শকে আঁকড়ে থাকা লাভজনক কি না সেটি ধীরচিত্তে বিবেচ্য।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সমস্যা

বিগত কয়েক দশকের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বাঙালী বুদ্ধিজীবী ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রাগ্রসর অংশ। কতকটা সেইজন্যও বটে, বাঙালীর সমস্যা আমাদের স্বকীয় সমস্যা বলেও বটে, এখানে আমরা প্রধানতঃ বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সমস্যা নিয়েই আলোচনা করব। বাঙালী বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ বাঙালী জাতির সেই অংশ, মস্তিষ্কই যাঁদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন এবং যাঁদের জীবনযাত্রার ধারায় কোন-না-কোন আকারে মানসিকতার ছাপ বর্তমান। অর্থাৎ শিক্ষাব্রতী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কেরানী, সমাজসেবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। মোটামুটি ভাবে বিচার করতে গেলে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভাবজীবনের সমস্যাই মূলতঃ বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সমস্যা।

সমস্যাটা আসলে কী?—সমস্যা হচ্ছে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবজীবনের দ্বন্দ্বসংঘর্ষ এবং তার সমন্বয়ের সমস্যা; প্রাচ্য আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সংঘাত ও সমন্বয়ের সমস্যা; অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং খাঁটি বাঙালীত্বের সঙ্গে নির্ভেজাল বিজাতীয়ত্বের ঠোকাঠুকির সমস্যা; প্রগতিশীলতা কাকে বলে এবং তার লক্ষণ কী কী সেইটে নির্ধারণের সমস্যা এবং এ জাতীয় অন্যান্য সমস্যা। সমস্যা যে দুরূহ তা না বললেও চলে। বর্তমান প্রবন্ধে সমস্যাগুলি একটু বিশ্লেষণের চেষ্টা করে দেখা যাক।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙালীর প্রাগ্রসর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় মার্ক্সবাদ একটি প্রধান স্থান জুড়ে ছিল। মার্ক্সবাদের মধ্যে যে একটা সাম্য ও সুবিচার-নীতি আছে সেইটেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীর উপর তার ঐককালীন অপরিসীম প্রভাবের কারণ। আধুনিক বাঙালী মনে পাশ্চাত্ত্য সকলপ্রকার দর্শন সম্পর্কেই কেমন একপ্রকারের রোমান্টিক মোহ

আছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনগুলির যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতা বিচারের রেওয়াজ এদেশে বড় একটা নেই, সেগুলি পশ্চিমের স্রোত বেয়ে এসেছে সেইটেই তাদের রম্যতার পক্ষে যথেষ্ট। ত্রুটি যদি কিছু ধরা পড়েও, তাকে রোমাণ্টিকতার আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। মার্ক্সবাদী দর্শন সম্পর্কেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। মার্ক্সবাদী দর্শনের লক্ষ্য অর্থাৎ শোষণ-পীড়ন-সম্ভাবনারহিত শ্রেণীহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এই সেদিনও আমাদের কল্পনাকে এতই উচ্চকিত করেছিল যে, তার ফাঁক ও ফাঁকিটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়ে নি। গান্ধীবাদের প্রতি ছিল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সীমাহীন অবজ্ঞা। বাঙালী এই বলে গান্ধীবাদকে অস্বীকার করতে চেয়েছে যে, বাঙালী চিরকালই শক্তিমন্ত্রের উপাসক; তন্ত্রের সাধন বাঙালীর জাতীয় সাধনা; সুতরাং গান্ধীবাদের ন্যায় ভোগবিমুখ কৃচ্ছ্রব্রতী দর্শনের আবেদন তার কাছে থাকতে পারে না। মার্ক্সবাদী দর্শনের ভিত্তি হিংসাত্মক সংঘর্ষ ও সংগ্রাম। নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডার উদগাতা শাক্ত বাঙালী হিংসাত্মকতার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকত্বই দেখতে পায় নি।

কিন্তু শাক্ত প্রভাবই বাঙালী জীবনে একমাত্র প্রভাব নয়। বৈষ্ণব প্রভাবও পাশাপাশি তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। বাঙালী মানসে কোন্‌টি অধিক সক্রিয় সেইটে সহসা বলা শক্ত। বৈষ্ণব ধ্যানধারণার প্রতি বাঙালী মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ অল্প এরূপ মনে করার অনুকূলে কোন যুক্তি নেই। তা যদি হত তা হলে একাদিক্রমে তিন শত বৎসর কি তারও অধিককাল বাঙালী বৈষ্ণব ভাবরসে ডুবে থাকতে পারত না। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করা প্রয়োজন যে, বৃটিশ অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্তি তা মূলতঃ বৈষ্ণব ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে; শাক্ত-ভাব তাদের উৎস নয়। অবশ্য সাধক-কবি রামপ্রসাদের কথা আলাদা। কাজেই এ কথা কোনক্রমে বলা চলে না যে, অহিংসার আদর্শের প্রতি বাঙালী মনের স্বাভাবিক ঝোঁক নেই। এককালীন বৌদ্ধ পরে বৈষ্ণব বাঙালীর প্রকৃতি গান্ধীবাদের অন্তর্নিহিত মূল নীতির প্রতিকূল হতে পারে না।

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে কুৎসিত পরিপ্রেক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর চোখের সামনে ধরা পড়ে তাতে তার মার্ক্সবাদী মোহ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায়। বাঙালী বুদ্ধিজীবী সচকিত হয়ে দেখে, ইউরোপীয় মানসিকতার গর্ভজাত সাম্যবাদী দর্শনই হোক আর গণতন্ত্রী দর্শনই হোক তাদের ভিত্তি পলকা। সে সব দর্শনে উপায়ের বিশুদ্ধতা স্বীকৃত নয় বলে তাদের উদ্দেশ্যকে শেষ পর্যন্ত মহৎ বলে স্বীকার করা যায় না। নীতিহীন উপায়ের কালিমালিপ্ত হস্তাবলেপে তাদের লক্ষ্য আদর্শভ্রষ্ট, বিকৃত। সাম্যবাদী দর্শনের লক্ষ্য মহৎ; কিন্তু বাস্তবতঃ দেখা যাচ্ছে তার কার্যপদ্ধতি আর ফ্যাসিস্ত কার্যপদ্ধতিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ফ্যাসিস্ত জুলুমবাজির ন্যায় সাম্যবাদও ক্রমে ক্রমে এক অখণ্ড আন্তর্জাতিক জুলুমবাজিতে পরিণত হয়েছে। দেশে দেশে তার শিবির; দেশে দেশে তথাকথিত সাম্যবাদের পতাকাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ সেনানীদল। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র কিংবা স্বৈরাচারমূলক সাম্যবাদ—এর কোনটার দ্বারাই যে বিশ্বমুক্তি সম্ভব নয় তা বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণিত হয়েছে। শান্তিকামীর ছদ্মবেশে কতকগুলি তৃতীয়শ্রেণীর চিন্তানায়ক—ইউরোপে যাঁদের বলা হয় রাজনৈতিক ধুরন্ধর—আন্তর্জাতিক আসরে আর একটি বিশ্বগ্রাসী তৃতীয় যুদ্ধের ভূমিকাস্বরূপ পরস্পরের সঙ্গে তাল ঠোকাঠুকিতে নিয়োজিত। আণবিক বোমা সকলের মাথার উপর খাঁড়ার ন্যায় বিলম্বিত রেখে পৃথিবীর মানুষকে শান্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে!

উপরি-উক্ত অশ্রদ্ধেয় পথে যে বিশ্বমৈত্রী, শান্তি, সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় তা বাঙালী বুদ্ধিজীবীর চেতনায় ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তদনুপাতে মার্ক্সবাদের প্রতি তার প্রাক্তন উৎসাহেও মন্দা দেখা দিয়েছে। তিন দশকের বৎসরগুলিতে মার্ক্সবাদকে কেন্দ্র করে যে প্রচণ্ড আলোড়নের স্রোত এ দেশে বয়েছিল তার ধারা এখন স্তিমিত।

অবশ্য মার্ক্সবাদী ভাবধারার ভিতর শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত যে সমসমাজের আদর্শ বিঘোষিত সেটি বুদ্ধিজীবীর মনকে পূর্বেও আকর্ষণ করেছে, ভবিষ্যতেও

আকর্ষণ করবে। মার্ক্সবাদী দর্শনের এইটেই হচ্ছে সেরা দিক। মার্ক্সবাদের বিরোধিতার নামে প্রতিক্রিয়াশীলতার খপ্পরে পড়ার চাইতে এই আদর্শটিকে চোখের উপর ধরে রাখা অনেকগুণ ভাল—এটুকু অন্ততঃ স্বীকার করবার মত উদারতা বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আছে।

সময় সময় মানসিক জগতে vacuum সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তা বেশীদিন অপূর্ণ থাকে না বুদ্ধিজীবিতার ধর্মই হল চিন্তার সক্রিয়তা। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সে ক্রমাগত সঞ্চরণ করে ফিরছে। ফলিত মার্ক্সবাদ সম্পর্কে মোহমুক্তি আধুনিক বাঙালী-মনে যে শূন্যতা এনে দিল তা ভরিয়ে তোলার জন্যে স্বভাবতঃই তাকে নূতন চিন্তার অভিযানে বেরোতে হল, আদর্শান্তরের সন্ধানে। এই পথেই দেখা দিল প্রার্থিত গান্ধীবাদ। গান্ধীবাদের প্রতি বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আর পুরাতন বিমুখতা রইল না। গান্ধীবাদকে সে নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে শুরু করল এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় হিসাবে তার মধ্যে অযুত মঙ্গলসম্ভাবনা আবিষ্কার করল। বিশেষ করে ভারতের ৪০-৫০ সনের ঘটনাবলী এবং গান্ধীজীর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বাঙালী বুদ্ধি-জীবীকে গান্ধীদর্শনের দিকে আরও আকৃষ্ট করল। বিশ্বমুক্তি এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শ যে একমাত্র গান্ধী-প্রদর্শিত পথেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব—এই বোধ তার মনে একটা সুনিশ্চিত প্রতীতির ন্যায় ক্রমেই দৃঢ়মূল হয়েছে। যেটুকু সংশয় এর পরেও অবশিষ্ট ছিল সেইটে সম্পূর্ণ অবসিত হয়ে গেল ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারির ঘটনায়। আততায়ী-নিক্ষিপ্ত অগ্নিশল্য গান্ধীজীর বক্ষঃবিদারণ করল বটে, সেই সঙ্গে সংশয়ীদের সন্দেহের কুয়াশাকেও চিরতরে বিদীর্ণ করে দিয়ে গেল।

ভাবের জগতে বাঙালী বুদ্ধিজীবী একটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজে পেল বটে, কিন্তু তার সমস্যা ঘুচল না। আচরণের ক্ষেত্রে বাঙালী এখনও গান্ধীবাদী দর্শন থেকে বহু দূরে। গান্ধীদর্শনের বৈরাগ্যমুখী কৃচ্ছ্রব্রতী রূপটি জীবনপ্রীতিতে ভরপুর ভোগস্পৃহ বাঙালীর নিকট কোনসময়েই পুরোপুরি গ্রহণীয় হতে পারল না। এক জায়গায় না এক জায়গায় গান্ধীবাদের নিরাভরণ সারল্যের সঙ্গে বাঙালী মনের সহজাত শিল্পপ্রীতির ঠোকাঠুকি ঘটতে বাধ্য। এই অক্ষমতার

সবটুকু দোষ বাঙালীর উপর চাপানো অন্যায় হবে। বাঙালী তো দূরস্থান, এককালীন নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্ত অবাঙালী জাতীয়-নেতারাই এখন আচরণের দিক দিয়ে গান্ধীবাদ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। গান্ধীদর্শনের মহিমা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু ফলিত গান্ধীবাদ অতিশয় দুরূহ বিধায় তার অনুশীলনকারী খুব বেশী নেই। এইখানেই গান্ধীবাদের সার্থকতা ও ব্যর্থতা। বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করা এক, আর আচরণে রূপায়িত করা আর। তা ছাড়া জীবনের আরও অনেক দিক আছে; অনেক তার প্রশ্ন, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা। তাদের সমাধানের কোন ইঙ্গিত কি বাঙালী বুদ্ধিজীবী এযাবৎ পেয়েছে ?

শিল্প ও সাহিত্যের প্রসঙ্গই ধরা যাক। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, আধুনিক বাঙালী শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পাশ্চাত্ত্য শিল্প-সাহিত্যের প্রতি যে পরিমাণ নিবদ্ধ, স্বীয় দেশের শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তার সিকির সিকিও নয়। আমরা বেন জন্‌সন্‌ মার্লোর ঠিকুজী-কোষ্ঠী উদ্ধার করে দিতে পারি; আধুনিক রুশ সাহিত্যের অতি অখ্যাত লেখকের বার্তা আমাদের নখাগ্রে; কিন্তু স্বদেশীয় সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অধ্যায়ের কোন বার্তা সংগ্রহ করবার প্রয়োজন বোধ করি না। আইরিশ-ব্যালাড পড়তে আমাদের আপাত-ঔৎসুক্য; কিন্তু হাতের কাছে অযুত রত্নখণ্ডের আকর পূর্ববঙ্গ-গীতিকা রয়েছে, তার দিকে আমাদের চোখ যায় না। সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য উপেক্ষিত পড়ে থাকে; এদিকে মার্কিন নিগ্রো কবিদের কাব্যপাঠের জন্য আমাদের আকুলি-বিকুলির অন্ত নেই। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আধুনিক পুরাতন সর্বপ্রকার সদ্‌গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য; কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, স্বীয় সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার উপেক্ষা করে বিশ্বসাহিত্যের রত্ন আহরণে কালক্ষেপ করতে হবে। এক ধরনের বিজাতীয়তাই এইরূপ অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্যমুখীনতার কারণ। পূর্বেই বলেছি পাশ্চাত্ত্য দর্শন বা যে কোন প্রকারের পাশ্চাত্ত্য ভাব সম্পর্কে আমাদের মনে একপ্রকার মোহ আছে। সেই মোহ থেকে আজও আমরা মুক্তি পাই নি। মোহমুক্ত মন নিয়ে, অপিচ আন্তরিক জ্ঞানপিপাসার বশে পাশ্চাত্ত্য ভাবসমুদ্র মন্থন খুব অল্প লোকেই করে থাকেন। তার চাইতেও অল্পসংখ্যক

ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য ভাষাকে প্রাচ্য ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করবার, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ে একটি যৌগিক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কিন্তু হালে বাঙালী মানসে এই জাতীয় সুসমঞ্জস সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না। তৌলদণ্ডের পাল্লা হয় এদিকে টাল খাচ্ছে, নয় ওদিকে।—হয় অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বগন্ধিতা, নয় আত্যন্তিক মাত্রায় একদেশদর্শী স্বাজাতিক সাহিত্য-প্রীতি। এ দুয়ের মধ্যে ব্যালান্স দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে অনুপস্থিত।

কাজটি অবশ্য খুবই কঠিন। তবে কঠিনের সাধনায় বাঙালী কবে ভয় পেয়েছে? প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড নৃতাত্ত্বিক শাখার সন্তান বাঙালীর আলস্যের দুর্নাম আছে, কিন্তু মননের ক্ষেত্রে তার এ আলস্য নয়—আলস্যটি নিতান্তই দৈহিক শ্রমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সুতরাং উপযুক্ত নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ থাকলে বাঙালীর পক্ষে ভাবজগতে স্বাজাতিকতা ও বৈশ্বিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা খুব বেশী দুরূহ নাও হতে পারে।

তারপর প্রগতিশীলতার লক্ষণ-নিরূপণের সমস্যা। প্রগতিশীলতা কাকে বলে? তার সর্বস্বীকৃত নিদর্শন কী কী? পাশ্চাত্ত্যমুখীনতাই কি তার একমাত্র নিশানা? তথাকথিত আধুনিকতার মানদণ্ড ছাড়া প্রগতিশীলতাকে বিচার করবার আর কি কোন পথ নেই? আমরা যতদূর বুঝি, ভাবাবেগবর্জিত নির্মুক্ত মন নিয়ে যে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া এবং যুগপ্রভাবের সঙ্গে তাল রেখে তার সমাধান খুঁজে বার করবার যে পদ্ধতি, সেইটেই হল সকল দেশে প্রগতিনিষ্ঠ মানুষের অনুসৃত পদ্ধতি। এর মধ্যে পাশ্চাত্ত্যমুখীনতা কিংবা প্রাচ্যমুখীনতার কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। প্রগতিশীলতা সেই দিক থেকে আদৌ বিবেচ্য নয়। প্রগতিশীলতার প্রসঙ্গে যুগপ্রভাব কথাটির অনেক অপব্যবহার হয়েছে। 'আধুনিক' শব্দটির প্রতি আমরা প্রায়ই যে অনুপাত-অতিরিক্ত মূল্য আরোপ করি, ওই অপব্যবহারই তার কারণ। যুগপ্রভাব ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রাহ্য, যতক্ষণ তা সনাতন মূল্যবোধগুলির সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট। চিরন্তন মূল্যবোধের বিরোধী যুগপ্রভাব অশ্রদ্ধেয় জ্ঞানে বর্জনীয়। চারিত্রবল-

যুক্ত মানুষ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ কখনও নির্বিচারে যুগপ্রভাবের নিকট নিজেকে ধরা দেন না। যুগপ্রভাবের গুণাগুণ নির্ণয় করে তবে তিনি যুগপ্রভাবকে স্বীকার করেন। যুগপ্রভাব সর্বাবস্থায় অনুসরণ করার অনুকূলে যাঁরা যুক্তি দেখান, তাঁরা সমস্যার এই দিকটি তলিয়ে দেখেন না। যুগপ্রভাব স্বীকার করা সর্ব ক্ষেত্রেই প্রগতিশীলতার নিদর্শন নয়; ক্ষেত্রবিশেষে তা পশ্চাদ্‌গতিরও পরিচায়ক হতে পারে।

উপরে প্রগতিশীলতার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হল তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। সাহিত্যক্ষেত্রে 'প্রগতি' 'প্রগতি' বলে যে প্রায়ই একটা প্রচণ্ড রব তোলা হয়, এই প্রগতির প্রকৃতি-পরিচয় কি? জেম্‌স্‌ জয়েস্‌, প্রুস্ত্‌, লরেন্স, এলিয়ট, স্পেণ্ডার, পাউণ্ডের রীতিপদ্ধতি ও ভাবাদর্শের অনুকরণে কিছু লেখাটাই কি একমাত্র প্রগতিলক্ষণ? আমাদের স্বদেশীয় সাহিত্যের ধারাপরম্পরাক্রমে বাহিত ঐতিহ্যকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করলেই কি তা আর প্রগতিলক্ষণাক্রান্ত রইল না? আমরা প্রগতিশীলের খাতা থেকে খারিজ হয়ে গেলাম? প্রগতিশীলতার এই একদেশদর্শী অর্থ বাঙালী-মনে প্রাধান্য লাভ করবার কারণ কী? পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্পর্কে বিচার-বিরহিত মোহ এবং স্বীয় সাহিত্য সম্পর্কে অযৌক্তিক হীনতাবোধই কি সেই কারণ নয়? কে না জানে যে এই উভয় ধারাই আমাদের মনে শিকড় গেড়ে বসে আছে? মিঃ এবন নামে এক ভদ্রলোক কয়েক বছর আগে কলকাতা থেকে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌'-এ আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রেরণ করেছিলেন। গবেষণাটির অনেকাংশই ভুল; যথা—। না, থাক্‌, যথা নয়। মিঃ এবন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাঁদের হয়ে ওকালতি করেছেন আমি তাঁদের শত্রু হয়ে থাকতে চাই না। কিন্তু একটি বিষয়ে মিঃ এবন বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি ও বাঙালী সাহিত্যিকের ধাত ঠিক ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব ধারা বিসর্জন দিয়ে এই যে আজকাল জেম্‌স্‌ জয়েস, মার্সেল প্রুস্ত্‌ প্রভৃতিকে নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি করা

হচ্ছে এটা বাঙালী সাহিত্যিকের স্বাভাবিক ভূমিকা নয়। অর্থাৎ ভদ্রলোক প্রকারান্তরে বলতে চান, স্বীয় সাহিত্যের বিশিষ্ট রীতিপদ্ধতি-আঙ্গিকের অনুসরণই বাঙালী লেখকের সহজাত ভূমিকা, তার মধ্যেই তার মানব-স্বভাবসিদ্ধ স্ফূর্তি নিহিত রয়েছে।

কথাটা 'নোট' করবার মত। বেশ বুঝতে পারি, আমাদের অনেক সাহিত্যিকের মধ্যেও আত্যন্তিক পাশ্চাত্ত্যমুখীনতা সম্পর্কে একটা সংশয়ের ভাব আছে। কিন্তু ফ্যাশান বড় জ্বালা—ফ্যাশানের বশেই অনেক সময় তাঁরা সেই সংশয় হজম করে যান। কিংবা চক্ষুলজ্জাও তার হেতু হতে পারে। কারণ যাই হোক, এইটে বাঙালী লেখকের এক সমস্যা—পাশ্চাত্ত্য ভাব সম্পর্কে মনে মোহময় ধারণা লালন করা সত্ত্বেও তার সম্বন্ধে সংশয়, স্বদেশীয় ভাব ও রীতি যথেষ্ট পরিমাণে আয়ত্ত না করতে পারায় আত্মগ্লানি। বাঙালী সাহিত্যিকের সমস্যা, মূলতঃ বুদ্ধিজীবী বাঙালীরই সমস্যা। এই সমস্যার সুসঙ্গত সমাধান বাঙালী আজও করতে পারে নি, ফলে স্বতোবিরোধিতার অভিশাপে তার মনে কেবলই গ্লানি জমে জমে উঠছে।

আর একটি কঠিন সমস্যা জীবনযাত্রার মান-নিরূপণের সমস্যা। জীবনযাত্রার মান-নিরূপণের প্রশ্নের সহিত অর্থনীতির প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অর্থ-নৈতিক সঙ্গতির উপরই জীবনযাত্রার রূপ প্রধানতঃ নির্ভরশীল। টাকার পরিমাণেই স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ। কিন্তু জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নটিও এই ব্যাপারে একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। দৃষ্টিভঙ্গীটাও অবশ্য খতিয়ে দেখতে গেলে, অর্থনীতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল; কিন্তু অর্থনীতিই তার শেষ কথা নয়। সংযম ও স্বেচ্ছাবৃত সারল্য বলেও একটা কথা আছে—এইখানে এসেই যত গণ্ডগোল। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ভরে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, আমাদের মহা সৌভাগ্য, বাংলা দেশে অনেক বড় বড় মহাপুরুষকে আমরা পেয়েছি। তাঁরা সকলেই একবাক্যে আমাদের সরল জীবনযাত্রার আদর্শ শিক্ষা দিয়ে গেছেন—কি রচনার মাধ্যমে, কি ব্যক্তিগত আচরণে। গান্ধীজীর শিক্ষাও তাই। কিন্তু আজকের দিনে

আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? বিলাস ও কৃত্রিম আড়ম্বরের স্রোতে দেশ ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে। একটা অসার বাবুয়ানার মোহ আমাদের অধিকাংশেরই চিত্ত অধিকার করে বসেছে। বাবুয়ানাটা যে স্তরের এবং যে শিক্ষা ও রুচি-বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে অনুকরণ করা স্বাভাবিক তাঁদের কথা বলছি না; এতাবৎ যাঁদের আমরা সারল্যের আদর্শের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ বলে জেনে এসেছি, যাঁদের আচরণ ও কথাবার্তা মনে আশার সঞ্চার করত, সচকিত হয়ে দেখছি তাঁরাও আজ বিলাসবিভ্রমের নিকট আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছেন। পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান নেই, বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা নেই, আদর্শবাদ মূল্যহীন হয়ে যেতে বসেছে—সকলের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে শুধু টাকা। অর্থের কৌলীন্যই আজ কৌলীন্যের একমাত্র নিশানা।

বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধই যে এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী তা না বললেও চলে। যুদ্ধ বাঙালীর নৈতিক মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিয়েছে। নীতিহীনতার স্রোতোমুখে ভেসে এসেছে অগণিত পাপ: অতিরিক্ত অর্থবুদ্ধি, পরানুকরণস্পৃহা, বিলাসপ্রীতি, আড়ম্বরলালসা, দেখানোপনা, হিংসাচার, বিদ্বেষপরায়ণতা, অসংযম, ব্যভিচার, আরও কত কি। গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মনের সঙ্গোপনে সুপ্ত যে প্রবৃত্তিগুলির হঠাৎ মুখ খুলে গেছে তাদের আজও অর্গলবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ হয়তো আর নেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার স্রোতে ভেসে আসা অন্যান্য পাপ দূর হয় নি। অন্যায় ও অমিতাচারে দেশ ভরে গেল।

আজকের দিনে বাঙালীর মূল সমস্যা হল তার পুরাতন মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাওয়া; আত্মস্থ হওয়া। আত্মস্থ হতে গেলেই আড়ম্বরের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে স্বভাবগত সারল্যের আদর্শে ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিজাতীয় ভূষা, বিজাতীয় কথাবার্তা, বিজাতীয় আচার-পদ্ধতি—স্বাধীন বাঙালীর মধ্যে এগুলির প্রতি আকর্ষণ কোথায় দিন দিন কমে আসবে তা নয়, মাত্রা আরও বাড়ছে। স্বকীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব অর্থাৎ আত্মসম্ভ্রম-

বোধ কমে গেছে বলেই আমরা বিজাতীয় প্রভাব-প্রবাহে নিজেদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে দিচ্ছি। যে লোক দু-চার পাতা ইংরেজী পড়েছে তার কৃতিত্ব আমাদের তাক লাগিয়ে দেয়; কিন্তু স্বদেশীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যে যাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। আচারে-ব্যবহারে কথাবার্তায় যে ব্যক্তি পূরাদস্তুর সাহেব সে শুধু ওই সুবাদেই সকলের মাথার উপর দিয়ে ডিঙি মেরে চলতে চায়। আর আমরাও এত প্রচণ্ড মূঢ় যে, তার সেই শ্রেষ্ঠত্ব-চেতনাটাকে আমরা নির্বিবাদে মেনে নিই, একটিবারের তরেও প্রশ্ন করি না, সাহেব হওয়াটাই সম্মান আদায়ের শ্রেষ্ঠ ছাড়পত্র কি না। 'আমরা' অর্থে সকল স্তরের বুদ্ধিজীবী বাঙালীকেই বোঝাচ্ছে। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বিজাতীয়ত্বের আকর্ষণ আরও বেশী। মুষ্টিমেয় শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে সকলেই এ যুগে অল্পবিস্তর অর্থকৌলীন্যের দাস। সমাজের উপরতলায় যাঁদের বাস তাঁদের ভিতর নানাবিধ কারণে অর্থলোলুপতা আরও বেশী। কারণগুলি এখানে নাই বা ব্যাখ্যা করলাম, তবে একটা কারণ বোধ করি এই যে, যাঁর অর্থ নেই তাঁর ভিতর অর্থচেতনাও নেই, অন্ততঃ তা খুব বেশী প্রবল হতে পারে না। অর্থই অর্থমনস্কতা সৃষ্টি করে। উচ্চশিক্ষিতদের অধিকাংশ সমাজের উপরতলার জীব এবং অর্থবান, কাজেই উপরের প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে সকলেই তাঁরা কিছু না কিছু পরিমাণে অর্থমনস্কতার বশ। বিজাতীয় জীবনযাত্রা সাচ্ছল্যের এবং অর্থসঙ্গতির দ্যোতক—এই কারণেই বিজাতীয় জীবনযাত্রার প্রতি এঁদের আকর্ষণ। আপিসের পদস্থ কর্মচারী, আধুনিক কেতাদুরস্ত উচ্চডিগ্রীওয়ালা অধ্যাপক, মোটা ফি-যুক্ত ডাক্তার ও উকীল, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, বিত্তবান দালাল ও ফড়ে—সকলের মধ্যেই বিজাতীয় মোহ অল্পবিস্তর পরিলক্ষণীয়। বিজাতীয় রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের মনে প্রচ্ছন্ন ভাবালুতা না থাকলে এরূপ কখনও হতে পারত না।

অতীত অভ্যাসের সব কিছুই অশ্রদ্ধেয় নয়, নির্ভেজাল বাঙালীত্বের সব কিছুই অস্পৃশ্য নয়। যে সব অভ্যাস মানুষের চিত্তে সঙ্কীর্ণতা আনে, তাকে

গর্বিত করে, লোলুপ করে, আড়ম্বরপ্রিয় করে, স্বার্থপর করে, স্বাজাতিকই হোক আর বিজাতীয়ই হোক সেগুলি বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আসল কথা হচ্ছে চরিত্রবল। যার চরিত্র নেই তার কিছুই নেই। নানা ঘটনা-বিপর্যয়ে আধুনিক বুদ্ধিজীবী বাঙালী চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। ঘটনাগুলির সব কয়টিই বাইরে থেকে চাপানো নয়, কতক স্ব-সৃষ্টও বটে। কাজেই চরিত্রহীনতার অনেকখানি দায়িত্ব বাঙালীর নিজের। আজকের দিনের বাঙালীর—বিশেষ করে তার বুদ্ধিজীবী অংশের—সব চাইতে বড় সাধনা যদি কিছু থেকে থাকে তো সে হচ্ছে স্বস্থ ও সুস্থ হওয়ার সাধনা, চারিত্রশক্তি পুনরধিকারের সাধনা। যে সুখস্বর্গ থেকে সে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে তাতে পুনঃপ্রবেশের সাধনা।

সঙ্গীতের দ্বিধারা

এবার (ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫) কলকাতায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনেকগুলি অধিবেশন হয়ে গেল। এত বেশী সংখ্যক অধিবেশন ইতিপূর্বে আর হয় নি। শুধু যে বড় বড় অধিবেশন হয়েছে তা-ই নয়, ওস্তাদদের ডেকে এনে পাড়ায় পাড়ায় ছোটখাটো জলসাও হয়েছে নিতান্ত কম নয়। সব তাতেই শ্রোতা হয়েছে অগণ্য। দুই ধরনের শ্রোতা—এক যাঁরা টিকিট কেটে গান শুনেছেন, আর যাঁরা টিকিটের সুযোগ (কিংবা সামর্থ্য) বঞ্চিত হয়ে লাউড-স্পীকারের প্রসাদে বাইরে থেকে গান শুনেছেন। শেষোক্ত শ্রোতারা গান শুনতে এসে শীতের দৌরাত্ম্য, রাত্রির হিম, বসবার অনারাম, রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি কিছুই গ্রাহ্য করেন নি। পথচারীদের কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি না করে পথের উপর বসেই একাদিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসুধা পান করেছেন। এঁদের নিয়ে কোনও একটি ইংরেজী দৈনিকে **'Footpath Listeners'** নাম দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লেখা হয়েছে, তাতে 'পথচারী শ্রোতাদের' সঙ্গীতনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ, তাঁরা পথচারী শ্রোতাদের সুবিধার্থে লাউড-স্পীকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ঔদার্য কয়েক বৎসর আগেও অজ্ঞাত ছিল। সে সময় অধিকারী-অনধিকারীর একটা কৃত্রিম ভেদ জীইয়ে রেখে সঙ্গীতকে সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছিল। যেন দরদালানের অভ্যন্তরে যাঁরা সমবেত হতে পারলেন তাঁরাই সঙ্গীতের একমাত্র ভোক্তা; দালানের বাইরে আঙিনায় যাঁরা পড়ে রইলেন গান শোনবার তাঁদের কোন অধিকার নেই। আমার যতদূর ধারণা, সংবাদপত্রে এই নিয়ে লেখালেখি হওয়ার ফলেই কর্তৃপক্ষের মনোভাবের বদল হয়েছে। শিল্প উপভোগের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিকে যত কম প্রশ্রয় দেওয়া যায় ততই ভাল। এতে শিল্পেরই যে শুধু লাভ হয় তা-ই নয়, আখেরে

ব্যবসায়েরও সুবিধা হয়। সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তারা যে শেষ পর্যন্ত কথাটি বুঝেছেন এইটেকেই যথেষ্ট বলে মানব।

সঙ্গীত সম্মেলনগুলির এই-যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যাচ্ছে, এতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এই কথাই যে, দেশে রাগসঙ্গীতের সমাদর বাড়ছে। একে একটা মস্ত সুলক্ষণ বলে গণ্য করা উচিত। রাগসঙ্গীত-প্রীতি নিছক সঙ্গীতপ্রীতি হিসাবেই তাৎপর্যপূর্ণ নয়, এর সঙ্গে অ্যাটিচ্যুডের প্রশ্নও জড়িত আছে। রাগসঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যা গঠনমূলক, প্রাণবান। জীবনকে যাঁরা হাল্কাভাবে দেখেন, সর্ববিধ শিল্পগত তৎপরতার মধ্যে চটুল স্ফূর্তির উপকরণ খোঁজেন, তাঁদের পক্ষে কখনও রাগসঙ্গীতের পোষকতা করা সম্ভব নয়। অবশ্য এক সময় ধনী ও বিলাসীদের আসরে খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি গানকে আমোদের উপকরণ রূপেই প্রধানতঃ গণ্য করা হত, কিন্তু সে যুগ আর নেই। সস্তা আধুনিক গানকে বাতিল করে রাগসঙ্গীতের উপর মনের অনুরাগ ন্যস্ত করাটাই একটা মস্ত বড় গঠনমূলক মনোভাবের নিদর্শন। এতে বোঝায়, শ্রোতারা আর আগের মত চটুল সুর পছন্দ করছেন না, ভারী জিনিসেই তাঁদের সমধিক রুচি। 'আধুনিক গান' নামধেয় সঙ্গীত তথা সর্বপ্রকার হাল্কা গানের জারিজুরি শ্রোতাদের কাছে ধরা পড়ে গেছে, মোহমুক্ত মন নিয়ে তাঁরা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় রাগসঙ্গীতের পাশে এসে ভিড়ছেন। এই মানদণ্ডে আধুনিক গানের দিক থেকে রাগসঙ্গীতের দিকে শ্রোতার মনোযোগ-বদলকে চটুলতা থেকে গঠনমূলকতার দিকে সার্থক অভিযান বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না।

কেউ কেউ বলতে পারেন, সঙ্গীতামোদী শ্রোতার একটি বৃহৎ অংশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রীতি আসলে একটা 'পোজ', ওর পিছনে হুজুগের কারকতাটাই সমধিক বলবৎ। হঠাৎ দেশের ভিতর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রীতিরূপ ফ্যাশানের একটা ঢেউ উঠেছে, সেই ঢেউ স্বাভাবিক কারণে অনেকেরই মনের তীরে গিয়ে আঘাত করছে। শ্রোতাদের নিজ নিজ রুচির উপর ব্যাপারটি ছেড়ে

দিলে এমন ঘটত কি না সন্দেহ। হুজুগে ব্যাপার ভালও হয় মন্দও হয়, এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভাল হয়ে উঠেছে নিতান্ত আকস্মিকতার জোরে, এ বাদে এর সপক্ষে আর কিছু বলার নেই।

কথাটা মেনে নেওয়া যায় না। হুজুগের জোর পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় তাকে প্রতিকূল অবস্থার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা। বিরূপ অবস্থার মধ্যে পড়েও যদি হুজুগ টিকে থাকে, বুঝতে হবে সেই হুজুগ বস্তুটি নেহাত নকল জিনিস নয়। এই-যে অগণিত শ্রোতা পর পর কয়েকদিন রাতের হিম আর শীত উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বসে গান শুনল—একে নিতান্ত হুজুগে ব্যাপার বললে কেউ তা মানবে না। উন্মুক্ত আকাশের তলায় নানারূপ অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সমস্ত রাতভোর জেগে গান শোনা—চাট্টিখানি কথা নয়। যিনি সঙ্গীতরসিক নন তিনি একবার নিজেকে ওই অবস্থার মধ্যে ফেলে দেখুন তো—কতক্ষণ তাঁর উৎসাহ থাকে! ক্লেশের সংস্পর্শে হুজুগ কর্পূরের মত উবে যায়। যে বস্তু ক্লেশের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ তাকে বোধ হয় হুজুগ বলা যায় না।

কিন্তু আজকের আলোচ্য বিষয় তা নয়। এই নিবন্ধের আলোচ্য নূতন করে রাগসঙ্গীতের মূল্যায়নের সমস্যা। মাঝে কিছুকাল বাংলা দেশে রাগসঙ্গীতের প্রচার বিশেষ ভাবে দমিত অবস্থায় ছিল। লোকের মনোযোগ অনুপাত-অতিরিক্ত ভাবে আধুনিক সঙ্গীতের উপর গিয়ে পড়েছিল। সেই বিসদৃশ অবস্থার অবসান হয়েছে, এটা খুবই সুখের বিষয়। আসলে 'আধুনিক' গান মাত্রই চটুল সঙ্গীত—তা কাব্যগীতিই হোক আর ভাবগীতিই হোক। এরকম চরম একটি মত প্রচারের কারণ এই যে, রাগসঙ্গীতের ভিতর যে সুরের ঐশ্বর্য আছে আধুনিক সঙ্গীতের ভিতর তার সিকির সিকিরও দেখা মেলে না। রাগসঙ্গীতের একটা নির্দিষ্ট কাঠামো আছে, তার একটা বিশেষ রূপ আছে, রাগসঙ্গীতে সুরবিকাশের পদ্ধতিটি সুনিরূপিত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত; পক্ষান্তরে আধুনিক গানে সবই ঢিলেঢালা ও শিথিল। সুরের দিক তার নিতান্ত রিক্ত। আধুনিক গানে সুরবিকাশের কোন

স্বীকৃত পদ্ধতি নেই, বস্তুতঃ বলা চলে কোনপ্রকার স্বরবিকাশই তাতে নেই। সুরের রূপায়ণের নামে আধুনিক গানে সচরাচর যা করা হয় এক কথায় তার নাম—কথার সানুনাসিক আবৃত্তি। অনেকে আধুনিক গানের সুরকে সুমিষ্ট ও সুরেলা বলেন, কিন্তু তাঁদের জিজ্ঞাসা করি মিষ্টত্বের মাপকাঠি কী? মিষ্টত্ব কি শুধু কণ্ঠস্বরেই নিহিত? সুরবোধের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই? সুরের স্থায়িত্বের বোধ না জন্মালে, স্বরজ্ঞান না থাকলে, মিষ্টত্ব যে কেমন করে অধিগত হতে পারে বুঝি না। দীর্ঘ দিনের অনুশীলনে কণ্ঠস্বর যখন বিশেষ ভাবে পরিমার্জিত ও প্রখরতাপ্রাপ্ত হয়, মাত্র তখনি সত্যিকার মিষ্টত্ব অধিগত হওয়া সম্ভব। আধুনিক গানের শিল্পীদের কণ্ঠে সাধারণতঃ যে মিষ্টত্বের সাক্ষাৎ পাই তা ভাসা-ভাসা, পল্লবগ্রাহী, দুরূহ কিংবা জটিল সুরের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ নয়। এই মিষ্টত্ব ঘাতসহ নয় বলেই তা বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক করে।

তা ছাড়া, আধুনিক গানে সুরের কোন স্থায়িত্ব নেই। রাগসঙ্গীতে সুরের স্থায়ী সাধন একটা মস্ত বড় জিনিস। সুর যখন সা-তে কিংবা পা-তে গিয়ে দাঁড়ায়, মন অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে। আধুনিক গানে সুরায়ণের এ জাতীয় কোন সংস্কার আজ পর্যন্ত তৈরি হয় নি। আধুনিক গানের সুর কেবল পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, সুর কোথাও স্থায়ী ভাবে গিয়ে দাঁড়ায় না। এতে সঙ্গীতশ্রবণের আসল আনন্দই মাটি। এ বাদে রাগসঙ্গীতে সুরকে যদৃচ্ছা খেলাবার স্বাধীনতা আছে, এক একটি রাগ বা রাগিণীকে আশ্রয় করে কণ্ঠস্বরকে বিধিসম্মত ভাবে আরোহাবরোহক্রমে লীলায়িত করবার অবকাশ আছে; আধুনিক গানে তা আদৌ নেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধেও আপত্তি এই যে, তাতে সুরবিকাশের স্বাধীনতা নেই। বস্তুতঃ এ স্বাধীনতা তথায় সর্বাংশে অস্বীকৃত। ফলে সঙ্গীতশ্রবণের একটা বড় তৃষ্ণাই রবীন্দ্রসঙ্গীতে অপূর্ণ থেকে যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রচনাগত গঠন অতি চমৎকার, কিন্তু একটা বড় মূল্যের বিনিময়ে এই চমৎকারিত্ব অর্জন করতে হয়েছে। সুরের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে সেখানে সুরের লালিত্যের

আদর্শকে আঁকড়ে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পী বড় কথা নয়, বড় কথা সুরকার। সুরকারের কৃতিত্বের তলায় রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী চাপা পড়েছেন।

কথাগুলি কিঞ্চিৎ অপ্রিয় শোনাতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্বিচার সমাদরের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বিশেষ, সর্ববিধ আধুনিক সঙ্গীতের পিঠে রাগসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য আর উৎকর্ষটুকু ভাল করে বোঝা প্রয়োজন। যাঁরা রাগসঙ্গীত আর আধুনিক গান এই দুই ধারার গানের সঙ্গেই পরিচিত তাঁরা এ দুয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কোথায় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন আশা করি। রাগসঙ্গীতেব শ্রেষ্ঠ ধারার সঙ্গে একবার কেউ বিধিমতে পরিচিত হলে তাঁর আর আধুনিক গানের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। সুরৈশ্বর্যের টানেই তিনি তখন রাগসঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন।

এ সকল কথায় কেউ যদি মনে করেন আধুনিক গান বনাম রাগসঙ্গীতের প্রশ্নে রাগসঙ্গীতের পোষকতা করে লেখক প্রকারান্তরে রক্ষণশীলতারই পোষকতা করছেন, তিনি লেখকের প্রতি অবিচার করবেন। সঙ্গীতজগতে লেখক প্রগতিশীলতার আদর্শে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, কিন্তু প্রগতিশীলতার নামে যা-কিছু পরিবেশিত হবে তাকেই মেনে নিতে প্রস্তুত নন। প্রগতিশীলতা আর চটুলতা এক বস্তু নয়। হাল্কা আমোদের উপকরণ যোগানো প্রগতিশীল শিল্পের কাজ নয়। প্রগতির সংজ্ঞা যথাযথভাবে নির্ণীত হলে দেখা যাবে, ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ দানগুলির সম্প্রসারণের মধ্যেই প্রগতি, ঐতিহ্যের আশ্রয়বিচ্যুত হয়ে নতুন কিছু করাকে প্রগতি বলে না। ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সংস্কার বলতে বোঝায় সুরবিকাশের স্বাধীনতা; আধুনিক সঙ্গীতকারদের উচিত ওই স্বাধীনতার সংস্কারকে আরও সম্প্রসারিত করা। তা না করে তাঁরা যদি একে বেমালুম বাদ দেন এবং কল্পিত এক নূতন সুরাদর্শ গ্রহণ করেন, সে ক্ষেত্রে প্রগতির বদলে অধোগতি হয় বলেই আমাদের ধারণা। সুরের স্বাধীনতা তথা শিল্পীর স্বাধীনতা ছাড়া উৎকৃষ্ট পর্যায়ের গানের কাঠামো কল্পনা করা যায় না।

আধুনিক ধারার গান হলেই তাকে স্বররিক্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আধুনিকতা আর অসারতা সমার্থক নয়। যুগভেদে শিল্পাদর্শের বদল হতে পারে, হয়েও থাকে, তা বলে এই পরিবর্তন কিছু ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতামুক্ত ভূঁইফোড় বস্তু নয়। ফলতঃ পরম্পরার সঙ্গে যোগেই সমসাময়িক শিল্পের সার্থকতা। সমিল কবিতার করণকারণ ভাল জানা না থাকলে যেমন ভাল গদ্যকবিতা লেখা যায় না, তেমনি রাগসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যচিহ্নসমূহ ভাল করে আত্মসাৎ না করা পর্যন্ত আধুনিক সঙ্গীত সৃষ্টি করা চলে না। রাগসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার স্বরের অবলীলায়িত রূপায়ণে; স্বরের স্বাধীনতার আদর্শকে আধুনিক গানের কাঠামোর ভিতর গ্রথিত না করে কী করে আধুনিক সঙ্গীতের সমৃদ্ধি বিধান সম্ভব ভাল বোঝা যায় না।

আধুনিক সঙ্গীতের সব শাখাই ঐতিহ্যের আশ্রয়বিচ্যুত এমন মনে করলে অবশ্য আধুনিক সঙ্গীতের উপর ঢালাও রায় দেওয়া হবে। বাংলা গানের ভিতর রাগপ্রধান বাংলা গান বলে একটা ধারা আছে। এই শ্রেণীর গানের বিশেষ সম্ভাব্যতা আছে বলে মনে হয়। সম্ভাব্যতা, কেন না এই গানের স্বর রাগাশ্রিত, অথচ বাংলা গানের নিজস্ব মাধুর্য থেকেও এ বঞ্চিত নয়। বাংলা গানের স্বভাবসুলভ রসরূপটি অবিকৃত রেখে তার উপর রাগরাগিণীর ভর কতখানি সওয়ানো যায় তারই একটি সুন্দর সাফল্যের নিদর্শন হল এই রাগপ্রধান বাংলা গান। রাগপ্রধান বাংলা গানে এক দিকে যেমন বাংলা গানের বিশেষ রসটুকু পাওয়া যায় তেমনি অন্য দিকে সেই স্ববাদে রাগরাগিণীর আমেজটুকুও অনেকখানি পাওয়া যায়। অনেকে এই প্রসঙ্গে হিন্দী-ভাঙা খেয়ালের নাম করতে পারেন (পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী এ-জাতীয় গানের কুশলী শিল্পী ছিলেন), কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, হিন্দী-ভাঙা বাংলা খেয়াল বোধ করি সত্যিকার বাংলা গানের পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য নয়। কেন না ওতে শুধু বাণী-অংশই বাংলা, বাদ বাকি অংশের উপর হিন্দীর প্রভাব সুস্পষ্ট। রাগপ্রধান বাংলা গান সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। রাগপ্রধান বাংলা গানের কাঠামোর ভিতর হিন্দুস্থানী ক্লাসিকাল গানের

স্বরভঙ্গির প্রভাব সুস্পষ্ট : সুরবিস্তারের স্বাধীনতা এ-জাতীয় গানের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ; তা হলেও রাগপ্রধান বাংলা গান বাংলা গানই, তাকে আর কিছু বলে ভুল করা চলে না।

পরিতাপের বিষয়, বাংলা দেশে এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর একটি শ্রেণীর গানের তেমন অনুশীলন হল না। এক সময়ে শচীন দেববর্মণ প্রমুখ দু একজন বিশিষ্ট শিল্পীর কণ্ঠে এই শ্রেণীর গানের সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছিল, কিন্তু আজকাল আর রাগপ্রধান বাংলা গান তেমন শুনতে পাওয়া যায় না। সকলেই এদানি হাল্কা চটুল কাব্যগীতি গাইতে ব্যস্ত। 'কাব্যগীতি', 'ভাবগীতি' ইত্যাকার নামধেয় গানে কাব্যভাব কতদূর আছে বলতে পারব না, তবে সে সব যে প্রকৃত গান নয় সে কথা জোর করে বলা বলে। সুরসমৃদ্ধি এ সকল গানে একান্তভাবে অনুপস্থিত। এক ধরনের সানুনাসিক সুরের আবৃত্তি বললে এ সকল গানের যথাযথ পয়িচয় দেওয়া হয়। এতে সুরবিস্তার আদৌ নেই, সুতরাং সুরের মজাও নেই। কিন্তু হলে কি হবে, আজকালকার শিল্পীরা এই শ্রেণীর গান গাইতেই বেশী স্ফূর্তি পান দেখতে পাই।

এর কারণ সম্ভবতঃ দুর্বোধ্য নয়। রাগপ্রধান বাংলা গানের প্রতি সুবিচার করতে হলে কিছু-কিঞ্চিৎ পূর্ব-অনুশীলনের দরকার হয়, স্বরসাধনার দরকার হয়; পক্ষান্তরে কাব্যগীতি প্রভৃতির বেলায় অনুশীলনের বালাই নেই। স্বরজ্ঞান যাঁর যত কম, সুরবোধ যাঁর যত দুর্বল, কাব্যগীতি গাওয়া তাঁর পক্ষে তত সোজা। এক ধরনের কল্পিত মিষ্টত্বকে এই শ্রেণীর গানে মিষ্টত্ব বলে অভিহিত করা হয়, যা আসলে মিষ্টত্বই নয়। অধিকাংশ কাব্যগীতি-শিল্পীর তথাকথিত সুমিষ্ট কণ্ঠ একটু বিশ্লেষণে বেসুরো বলে ধরা পড়বার আশঙ্কা আছে। অথচ নির্বোধ শ্রোতার নিকট এই মিষ্টত্বেরই কত জয়জয়কার। সঙ্গীতের মিষ্টত্ব কণ্ঠস্বরে যত না নিহিত তার চাইতে বেশী মাত্রায় নিহিত সুরজ্ঞানের ভিতর। সুরের রাজ্যে কাকে সুরেলা বলে, কাকে বেসুরো বলে, না চেনা পর্যন্ত সত্যিকার মিষ্টত্ব অধিগত হয় কি না সন্দেহ। সচরাচর হাল্কা-চটুল বাংলা গানের কণ্ঠরূপায়ণে যে ধরনের মিষ্টত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই

তা আসলে মিষ্টত্বের আবরণে 'বেসুরো কণ্ঠমাধুর্য' মাত্র। অর্থাৎ কণ্ঠ স্বভাবতঃ মধুর কিন্তু বেসুরো।

বলা বাহুল্য, এ জাতীয় গানে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন হয় না, তাই শ্রমকুণ্ঠ, সহজে-বাজিমাত-প্রয়াসী শিল্পীদের দরবারে এ গানের বিশেষ প্রচলন। অন্যপক্ষে রাগপ্রধান বাংলা গানের সার্থক রূপ পরিস্ফুটনে স্বরসাধনা তথা স্বরজ্ঞান অপরিহার্য, তাই ওদিকে কেউ বড় একটা ঘেঁষতে চায় না। আধুনিক বাংলা গানের শিল্পীদের মধ্যে রাগমনস্কতা বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত, শ্রমভীরুতা দূর না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না।

আশার কথা, জনসাধারণের মধ্যে গত কয়েক বছরে রাগমনস্কতা দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সে তুলনায় বরং শিল্পীরা পেছিয়ে আছেন। এখন জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান রাগসঙ্গীতপ্রীতির সঙ্গে তাল রেখে আধুনিক বাংলা গানের শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন ঘটলেই বাঞ্ছিত অবস্থা বহুলাংশে আয়ত্তগম্য হতে পারে।

ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য দুই ধারায় বিভক্ত।—রাগসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত। রাগসঙ্গীতের বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হল, এবার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে কিছু বলব।

সাধারণতঃ আমরা লোকসঙ্গীতকে রাগসঙ্গীতের পরবর্তী যোজনা বলে মনে করে থাকি। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের দিক নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের কেউ কেউ নজীর-প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, বৈদিক যুগে মার্গসঙ্গীতের পাশে পাশে লোকসঙ্গীতেরও বিধিবদ্ধ অনুশীলন হয়েছে। মুসলমান যুগে এসেও দেখতে পাই একই অবস্থা। ধ্রুপদ-খেয়ালের পাশে পাশে চলেছে 'কাউয়ালি' নামক লোকসঙ্গীতের চর্চা। ধ্রুপদ-খেয়াল অনুশীলিত হচ্ছে দরবারের অভ্যন্তরে, আর কাউয়ালি গান কাউয়াল সম্প্রদায়ের মুখে মুখে, রাস্তায়। গঙ্গা-যমুনার ধারার মত মার্গসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত সর্বদা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। লোকসঙ্গীত মার্গসঙ্গীতের বিকার বা অনুগ নয়, পরন্তু একটি অপরের সমসাময়িক ও

পরিপূরক। মার্গ বা রাগসঙ্গীত হল ভারতীয় সঙ্গীতের দরবারী রূপ, আর লোকসঙ্গীত ঘরোয়া রূপ—কিন্তু দুয়ের ভিতর যোগ অতি নিবিড়। সদর-অন্দরে মিলে যেমন গৃহবাটিকা, একটিতে গৃহের রূপ পূর্ণ হয় না; তেমনি ভারতীয় সঙ্গীতের আসল রূপটিকে চিনতে হলেও রাগসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত এই দুই ধারার সঙ্গেই সম্যক্ পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমার লোভ হচ্ছে, যে সিদ্ধান্তের আভাস কোন কোন নিবন্ধে আগেও দিয়েছি। সেটি হচ্ছে, ভারতীয় সঙ্গীতের সুমহান ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ দুই প্রান্ত ধারণ করে আছে রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত—এদের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন সাঙ্গীতিক স্তরগুলির শিল্পগত মূল্য বিশেষ কিছু নেই। ভারতীয় সঙ্গীতের অগ্রগতির ইতিহাসে আধুনিক সঙ্গীত নামধেয় সঙ্গীতের দান খুব বেশী গৌরব করে বলবার মত কিছু নয়। আধুনিক সঙ্গীত সঙ্গীতের জগতে **up-start**, ভূঁইফোড় ও অকুলীন, সে-কারণ ভিতর-ফাঁপা। এর পদ্ধতি-প্রকরণের পিছনে কোন সর্বজনসম্মত ঐতিহ্য না থাকায় তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সমানভাবে মুগ্ধ করতে পারে না। আধুনিক সঙ্গীতের আবেদন নগরীর চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং সেখানেও ফ্যাশান-পন্থীরা এর ভোক্তা। রাগসঙ্গীত তথা লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। এ দুয়ের পিছনেই দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যের পোষকতা বিদ্যমান। আর ঐতিহ্যাশ্রিত বলে এ দুয়েরই পদ্ধতি-প্রকরণ বৈশিষ্ট্যাদি লোকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। রাগসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের ভিতর যে পার্থক্য চোখে পড়ে সেটি রূপ ও গঠনগত পার্থক্য,আসলে ও দুয়ের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য বিদ্যমান। বরং আধুনিক সঙ্গীতের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের মিল কম; কিন্তু রাগ ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। এ কথার একটা বড় কার্যকর প্রমাণ এই যে, যাঁরা রাগসঙ্গীতের ভোক্তা তাঁরা একই কালে লোকসঙ্গীতেরও ভোক্তা বটে। রাগসঙ্গীতের প্রতি প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে লোকসঙ্গীতের মর্ম গ্রহণে বাধা নেই বরং সুবিধা। কিন্তু আধুনিক গান আর রাগসঙ্গীতে যেন আলোচাল-তেঁতুল সম্পর্ক। ও দুই কিছুতেই মিশ খায় না। রাগসঙ্গীতের

প্রতি অনুরাগ জীইয়ে রেখে আধুনিক গানের পোষকতা করা শক্ত। তেমনি তার উল্টোটাও সত্য। আধুনিক গানের উৎসাহী শ্রোতা রাগসঙ্গীতের রস মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কাব্যগীতি জাতীয় গান যাঁদের ভাল লাগে রাগসঙ্গীত তাঁদের জন্য নয়। মধ্য ও শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী শ্রোতারা শ্রোতা হিসাবে নিতান্ত কচি ও কাঁচার দলে পড়েন।

বাংলার সঙ্গীতামোদী জনসাধারণের একটা মোটা অংশের মনোযোগ রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের উপর যুগপৎ ন্যস্ত হয়েছে, এটা খুবই আশার কথা। আমাদের শ্রোতারা এতদিন বাদে সত্যিকার পথ খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয়। এই পথে চললে ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তিরূপ মহতী সিদ্ধির কিনারায় অদূরকালের মধ্যেই আমরা পৌঁছাতে পারব বলে বিশ্বাস করি।

লোকসঙ্গীত

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত আলোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ এই দিক দিয়ে যত সমৃদ্ধ বোধ হয় আর কোন প্রদেশই তেমন নয়। প্রত্যেক অঞ্চলেরই নিজস্ব লোকসঙ্গীত আছে, কিন্তু বাংলায় যেমন তা বিচিত্র আর বিবিধ, তেমন সম্ভবতঃ আর কোথাও নয়। সর্ব ব্যাপারে নিজের প্রদেশকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবার দিকে বাঙালীর যে নিদারুণ দুর্বলতা আছে সেই দুর্বলতার বশে এ কথা বলছি না, বলছি সত্যের নিরাবেগ বিবৃতি হিসাবে।

বাংলাদেশ সমতল হলেও তার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সংস্থানগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের শিল্প-সঙ্গীতেও নানারূপ সহজ পার্থক্য গড়ে উঠেছে। যেমন নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ ছোট বড় নদীতে সমগ্র পূর্ববঙ্গকে যেন জপমালার মত আচ্ছাদন করে রয়েছে ; তার ভিতর আবার ভয়ালকুটিল প্রমত্তা পদ্মা পূর্ববঙ্গের একেবারে মর্মমূলে অধিষ্ঠিতা। এই নদীটি পূর্ববঙ্গের এক বিরাট অঞ্চলের লোকদের যেমন নানাভাবে সর্বনাশ করেছে, তেমনি সেই ক্ষতির উল্টোপিঠে তাদের স্বভাবে একটি বিশিষ্টতাও এনে দিয়েছে।

আবার পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরুন। বিশেষতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের নৈসর্গিক সংস্থানটুকু বিচার করা যাক। দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই শুকনো খড়খড়ে, তার ধূ ধূ করা প্রান্তরে ও বাটে শূন্যতা যেন জমে আছে। এই প্রাকৃতিক বিভেদের ফলে বঙ্গীয় সংস্কৃতির অখণ্ডতার সীমার মধ্যে পূর্ববঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতিই এক ধাঁচে গড়ে উঠেছে আর পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতিই এক ধাঁচে গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে লোকসঙ্গীতের বেলায় এই পার্থক্য সুপ্রকট। পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী, সারি প্রভৃতি জলপথের গান পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক রূপটিকেই যেন উদঘাটিত করেছে ; আর পশ্চিমবঙ্গের

বাউল, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি গভীর ভাবোদ্দীপক গান যেন তার হু-হু করা উদাস শূন্য প্রান্তরের রূপটিকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মেলে ধরেছে। এ ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিজাত অন্যান্য পার্থক্যও আছে।

বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রকারভেদ বিচিত্র, এ কথা গোড়াতেই বলেছি। এই ভিন্ন রূপগুলির মধ্যে আবার কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। সঙ্কীর্ণ অর্থে কীর্তনকে লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়তো ঠিক হবে না, কেন না কীর্তনের যে নিজস্ব ঢঙ ও গাইবার পদ্ধতি, তা বহু সাধনাসাপেক্ষ, আয়াসসাধ্য। সমস্ত প্রকার লোকসঙ্গীতেরই একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে তার প্রেরণাটুকু স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাতে নাগরিক সংস্কৃতিসুলভ sophistication নেই। কীর্তনে যদিও আবেগের অংশ খুব বেশী, তা হলেও বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাস ব্যতিরেকে কীর্তন আয়ত্ত করা যায় না। কীর্তনের লয় দুরূহ, কীর্তনের অন্তর্নিহিত রস ফুটিয়ে তোলা আরও কঠিন। তার উপর, ধারা বজায় রেখে বিভিন্ন শ্রেণীর (মনোহরসাহী, গরাণহাটি, রেণেটি, মন্দারিণী) কীর্তন গাওয়া ততোধিক কঠিন। এই সব বিবেচনায় কীর্তনকে ঠিক লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁর 'কীর্তন' বইয়ে লিখেছেন—"কীর্তনের টেকনিক্ একসময়ে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, কীর্তনকে পল্লীসংগীত বা folk music-এর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।" (পৃঃ ৫৭) কথাটা খুবই সত্য। তবে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রকাশ হিসেবে এবং ব্যাপক অর্থে কীর্তনকে বোধ হয় লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

কীর্তন বাঙালীর সম্পূর্ণ আপনার জিনিস। বাংলাদেশের নিজস্ব প্রকৃতি থেকে এই সঙ্গীত গড়ে উঠেছে। বাংলা বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণভূমি; শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্ম ও লীলাস্থান। তারই ফলে বাংলার মাটিতে ভক্তিবাদ যেরূপ সহজ লীলায় বিকশিত হয়ে উঠেছে, আর কোথাও তেমন ওঠে নি। কীর্তন সেই ভক্তিবাদেরই সুররূপ। কীর্তনের সুরে আবেগের উচ্ছলতা সুপ্রকট; শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি, থেকে এই আবেগের জন্ম। ভক্তির আবেগ দিয়ে গড়া কীর্তনের

সুরের মধ্যে বাঙালীর সহজ প্রাণধর্ম অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ তো পেয়েইছে, সম্পূর্ণ বিশিষ্টভাবেও তা প্রকাশ পেয়েছে। কীর্তনের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের লোকসঙ্গীতের ধারার কোনরূপ মিল নেই তার কারণ, কীর্তন বাঙালীর সংস্কৃতির বিশিষ্ট, অন্য-নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র প্রকাশ। বাংলার অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে হয়তো ভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীতের ধারার খানিকটা সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যেতে পারে (যেমন ভাটিয়ালীর সঙ্গে গুজরাটের 'মাঁঢ়' আর বিহার প্রদেশের 'বিহারী' সুরের মিল লক্ষ করা যায়), কিন্তু কীর্তনের প্রতিরূপ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। সম্প্রতি ভিন্ন প্রদেশবাসীরা কীর্তনের সুর বাংলা থেকে ধার করতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তাদের মৌলিক সঙ্গীত-ভাণ্ডারে কীর্তন জাতীয় কোন সুরের দেখা পাওয়া যায় না।

কীর্তন দুই প্রকার: নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। নামকীর্তন বা সংকীর্তনে ভগবানের নাম গাওয়া নিয়ম, আর শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গীতকে বলা হয় লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। উভয়েরই উদ্দেশ্য প্রেম এবং ভগবানের লীলাগানে হৃদয়ে আবেশ সৃষ্টি করা। "অন্তরঙ্গ সনে লীলারস-আস্বাদন। বহিরঙ্গ লৈয়া হরিনাম সংকীর্তন।" 'বংশীশিক্ষা'র দুটি লাইনে লীলাকীর্তন ও নামকীর্তনের বৈশিষ্ট্যটুকু অতি সংক্ষেপে চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই মতটিকে অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের মত বলে মনে করেন। কীর্তনের আর একটি রূপ পদাবলী। বৈষ্ণব মহাজনেরা যে সমস্ত অপূর্ব ভাবমধুর পদ রচনা করে গেছেন তাদের গীতরূপকে বলা হয় পদাবলী কীর্তন। যেমন জয়দেবের পদাবলী, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী। পদাবলী কীর্তনের কবিত্ব ও সুরৈশ্বর্য দুইই অনবদ্য।

ভাটিয়ালী গান পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের সত্তার সঙ্গে মিশে আছে। যদিও ভাটিয়ালী মূলতঃ মাঝিদেরই গান, তা হলেও তা নদীবক্ষেই ফুরিয়ে যায় নি; হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রামের নিরক্ষর চাষাভূষো সবারই কর্মক্লান্ত হৃদয়ে গিয়ে তা মিশেছে। মাঝিরা সাঁঝ-সন্ধ্যায় নৌকা বাইতে বাইতে যখন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে, অস্তরাগরঞ্জিত নদীর নিস্তরঙ্গ জলে আর সন্ধ্যার

প্রশান্ত আবহাওয়ায় যে ভাবটি তাদের মনে ঘনিয়ে ওঠে, একমাত্র ভাটিয়ালী সুরের মধ্য দিয়েই তাকে তারা রূপ দিতে পারে। ভাটিয়ালী ভাটির স্রোতের গান—তাই তার ভিতর চাঞ্চল্য নেই, প্রাবল্য নেই, একটা একটানা থিতিয়ে-পড়া কান্নার সুরে তা ভরপূর। নৌকা-পথে যে সুরের প্রেরণা জাগে তারপর সেটা হাটে মাঠে বাটে প্রান্তরে, গ্রামবাসীর অন্তরে, কর্মে ও কর্মের অবসরে অশ্রান্ত অনুরণন জাগিয়ে তোলে। পল্লীবাসীর জীবনে ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর।

সারিও ভাটিয়ালী গানের ন্যায় নদীপথেরই গান। তবে ভাটিয়ালী যেমন নিঃসঙ্গ মানুষের একাকিত্বের প্রতিরূপ, সারি ঠিক তা নয়। সারি গানের ভিতর মানুষের যৌথ সংস্কারটিই প্রবল। পূর্ববঙ্গে ভাদ্রমাসে জায়গায় জায়গায় 'বাইচ' খেলা (নৌকা-দৌড়) হয়—সাধারণতঃ সারি সেই সময়েই অধিক গাওয়া হয়। গাথা নামক গানও সারি গানেরই অনুরূপ। ভাটিয়ালী সুরের সৌন্দর্যটুকু রুক্ষ, অমার্জিত—রুচিবান শিক্ষিত গায়কের কণ্ঠে ভাটিয়ালীর যথার্থ ভাবটুকু যেন ফুটে উঠতে চায় না। ভাটিয়ালী সুরে যে wailing বা কান্নার ভাব ফুটে ওঠে তা সাধা গলায় ধরা পড়ে না; পল্লী-প্রকৃতির কোলে মানুষ অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত চাষাভুষোরাই কেবল তার যথার্থ রূপদান করতে পারে। এই জন্য শহরবাসীর কণ্ঠে ভাটিয়ালী গান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাস্যকরতার নমুনা হয়ে দাঁড়ায়—ড্রইং-রুমে বসে ভাটিয়ালী গান গাওয়া আর বলনৃত্যের আসরে নাম-সংকীর্তনের সুর ভাঁজা একই কথা। তবে দু একজন শহরবাসী গায়কের নাম করা যায়, যাঁরা তাঁদের কণ্ঠে ভাটিয়ালীর অমার্জিত সৌন্দর্যের অনেকখানি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে মনে হয়। যথা শচীন দেববর্মণ ও আব্বাস উদ্দিন সাহেব। তবে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে শচীন দেববর্মণকে অনেক বেশী কুশলী কলাকার বলে স্বীকার করতে হয়। শচীন দেববর্মণের 'আমি মনদুখে মরি রে সুবলসখা, ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে', 'নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভ্রমরা', 'আমি রইব না আর উজান ঘাটে রে আমি রইব ভাটিতে', 'গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল ঔষধে আর মানে

না, চল সখি চল যাই গো নদীয়ায়' প্রভৃতি ভাটিয়ালী গান শহরবাসী গায়কের কণ্ঠের গাওয়া গান হলেও সেগুলি গ্রাম্য কবির রচিত বহুদিনকার প্রচলিত গান এবং তাদের ভিতর গ্রাম্য ছাঁদটুকুই সব ছাড়িয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শচীন দেববর্মণের কণ্ঠ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পদ্ধতিতে সাধা হলেও তিনি যখন ভাটিয়ালী গান করেন, শিক্ষা, নাগরিকতা ও ওস্তাদী রেওয়াজ ভুলে গিয়ে তিনি গ্রামের একেবারে মর্মস্থলে গিয়ে প্রবেশ করেন। সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব, সেইখানেই তাঁর সাফল্যের রহস্য। শচীন দেববর্মণ ও আব্বাস উদ্দিন ছাড়া আর যাঁরা ভাটিয়ালী গানে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কমলা ঝরিয়ার নাম অগ্রগণ্য।

বাউল সুর প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। সংসারবিরাগী ফকির দরবেশের কণ্ঠে উদাসকরা সুরে যে সব খাঁটি বাউল শোনা যায় তার নিরাভরণ সারল্যটুকু যেমন হৃদয় স্পর্শ করে, তেমনি তার তত্ত্বের দিকটিও মনকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। সাধারণতঃ একতারা বাজিয়ে বাউল গাওয়া হয়। ভাবগাম্ভীর্য বাউলের প্রধান সম্পদ। নিম্নে দুটো-তিনটে প্রসিদ্ধ বাউলের আংশিক নমুনা দিলাম—তা থেকে পাঠক বাউলের ভাব-সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

"ওরে ও নিঠুর গরজী
তুই মানসমুকুল ভাজবি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে ?
দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই
সে যুগযুগান্ত ফুটায় মুকুল
তার তাড়াহুড়া নাই।..."

(সেখ মদন বাউল)

কিংবা,

"আছে যার মনের মানুষ,
মনে সে কি জপে মালা ?

অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা,
কাছে রয়ে ডাকে তারে উচ্চস্বরে কোন্ পাগলা,
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে থাক্ রে ভোলা ॥…"

(লালন শাহ্)

অথবা,

"যার নাম আলেক মানুষ, আলেকে রয় ।
শুদ্ধ প্রেম-রসিক বিনে কে তারে পায় ॥
রসরতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে ;
রতিতে মতি ঝরে, মূল খণ্ড হয় ॥…"

(লালন শাহ্)

উল্লিখিত প্রত্যেকটি বাউলের মধ্যেই পাঠক দেখবেন রূপক ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে পরমপুরুষের তত্ত্বটিকে কী চমৎকার ভাবেই না ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ! বিশেষতঃ প্রথম বাউলটির তো তুলনা হয় না। ভাষার ডৌলে ছন্দের ঝঙ্কারে মনে হয় যেন কোন আধুনিক কবির রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় অনেক জায়গাতেই এই গানটির উল্লেখ করেছেন। কবি বাউল ভাবাদর্শের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাউলের প্রভাব প্রত্যক্ষ।

দেহতত্ত্ব বাউলেরই সমশ্রেণীর গান। এই গানের রসেও ভাবগাম্ভীর্য প্রধান। নিম্নে দুটি দেহতত্ত্ব-জাতীয় গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

"বঁধু, বাঁশী দাও মোর হাতেতে
আজ নিশি বাজাইয়া দেই নিও প্রভাতে।
তুমি বাজাও জয় রাধা বলে,
আমি বাজাই শ্রীকৃষ্ণ বলে—শুনুক সকলে.
বঁধু, তুমি গুণী কি আমি গুণী
রাষ্ট্র হোক জগতে ॥

বাঁশীতে রন্ধ্র আছে সাত,
কোন্ রন্ধ্রে কোন্ গুণ ধরে
দেখব আজি রাত
বঁধু, তোমার বাঁশী তুমি নিবা
সন্দ কি তায় মনেতে ॥…”

(রচনা অজ্ঞাত)

কিংবা,

“দৌড়বাজ ঘোড়া ফিরছে সদা ভবের বাজারে।
দিবানিশি ঘোরে ফিরে, ধৈর্য না মানে ॥
সপ্তসাগর পাড়ি দিয়ে
এল ঘোড়া শূন্য ভরে,
হায়াৎ মওত্ জানা যাবে সেই ঘোড়ার সামনে ॥
সাধন করলে পাবি তারে,
তার জোরে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে,
তিনটি মায়ের একটি ছেলে হৈল কি প্রকারে ॥
সেই ঘোড়া হৈল খোঁড়া,
এড়ে দিল বত্রিশ জোড়া,
তিনু বলে, খাড়াক-খাড়া যাবি কোন্ বাজারে ॥”

(তিনু ফকির—মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন প্রণীত ‘হারামণি’ গ্রন্থে সংগৃহীত)

বাউল ও দেহতত্ত্বের অনুরূপ অন্যান্য গানও আছে। যেমন মুর্শীদ্যা ও মারাফতী। বাউল গানে যেমন প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের আবহটাই প্রধান, মুর্শীদ্যায় তেমনি নদীবলয়িত পূর্ববঙ্গের রূপ প্রকট। মারাফতী গানগুলিতে সহজিয়া সূফী সাধনার মর্মকথা অতি চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

বাংলার লোকসঙ্গীতের আরেকটি ধারায় আমরা পাই শ্যামাসঙ্গীত ও মালসি গান। সাধক রামপ্রসাদের ঐকান্তিক ভক্তিদ্যোতক শ্যামাসঙ্গীতগুলি এই শ্রেণীর গানের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধকপ্রবর কমলাকান্তেরও শ্যামাসঙ্গীত

অনেক আছে। ত্রিপুরা জিলার সাধক ভুবন রায় ও মনোমোহন রায় রচিত মালসি গান পূর্ববঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে আজিও প্রচলিত ও আদৃত।

যে সমস্ত লোকসঙ্গীত মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রচলিত, তাদের ভিতর মারাফতী, মুর্শিদ্যা ছাড়া জারী আর গাজী গান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জারী মহরম পর্বানুষ্ঠানের সময় গীত হয়—কারবালা প্রান্তরের স্মৃতির বিষণ্ন নিঃশ্বাসে জারী গানের সুর ভারী। গাজী কথাটা শামশের গাজীর নাম থেকে নেওয়া—তিনিই প্রথম গাজী গান রচনা করেছিলেন। বাংলার সর্বত্র গাজী গানের প্রচলন। মুসলমান ফকিরেরাই প্রধানতঃ গাজী গেয়ে থাকেন, তা হলেও হিন্দুচিত্তে তার প্রভাব অল্প নয়। হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির মিলনে গাজী ও সত্যপীরের পাঁচালীর একটা বিশিষ্ট দান আছে।

আরও নানা ধরনের লোকসঙ্গীত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সকলের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়; আমরা এখানে শুধু মোটামুটিভাবে তাদের নামগুলি উদ্ধৃত করলাম :—

কবি, তর্জা, হাফ্-আখড়াই, পাঁচালী, বীরভূম অঞ্চলের সাঁওতালী ঝুমুর, ধামালী, পটুয়া (ফরিদপুর, নদীয়া, যশোহর জিলায় প্রচলিত পটশিল্পের বিষয় নিয়ে রচিত), জাগ (চাষীদের রাত্রিজাগরণের গান—সাধারণতঃ পৌষ মাসে গাওয়া হয়; রাজসাহী ও ফরিদপুর জিলায় প্রচলিত), বারমাস্যা, মেয়েলী গান, জলভরণের গান, ধুয়া, মালদহের গম্ভীরা, বধমানের ভাদু ও বীরভূমের ভাদর; ভাওয়াইয়া, ত্রিপুরা অঞ্চলের ঘাটু ও ঢপ কীর্তন, গাজন, ইসলামী, ছাদপেটানো গান, লাউনি, বর্গীর গান, ছেলে-ভুলানো ছড়া, ময়নামতী ও গোপীচাঁদের গান, ময়মনসিংহ-গীতিকা, ব্রতচারী আন্দোলনের গান প্রভৃতি।

বাংলার সর্বপ্রকার লোকসঙ্গীতেরই একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে তা হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত দানে গড়ে উঠেছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পর থেকে এদেশে কার্যকরী হয়েছে তারই একটি বিশেষ রূপ লোকসঙ্গীতের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ভিতর পরিস্ফুট। বিশেষ বিশেষ লোকসঙ্গীতের প্রেরণা হিন্দু

সম্প্রদায় থেকে এসেছে কিংবা মুসলমান সম্প্রদায় থেকে এসেছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল তাদের উপভোগের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে কোন তফাত নেই, রসোপলব্ধির মহোৎসবে সেখানে সকলেরই সমান অধিকার। সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই-যে চমৎকার একাত্মতা পরিলক্ষিত হয়, সামাজিক জীবন থেকে আরম্ভ করে জীবনের সর্বস্তরে যদি সেই একাত্মতাকে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়া যেতে পারত তা হলে কী সুখেরই না হত!

লোকসংস্কৃতির সমস্যা

আজকাল বাংলা দেশের অভ্যন্তরে লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের একটা সজ্ঞান চেষ্টা চলছে। বাংলার পুরাতন লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকচিত্র, কবি, হাফ-আখড়াই, তর্জা, পাঁচালী, কথকতা, যাত্রা, পুতুল-নাচ প্রভৃতি—যা কতকটা সামাজিক-রাষ্ট্রিক কাঠামোর পরিবর্তনের দরুণ, কতকটা একালীন শহরের লোকদের অবহেলার দরুণ লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে—অনুশীলন ও পুনঃপ্রচারের কার্যে কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবেই আত্মনিয়োগ করেছেন। বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলন এইরূপ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। গত তিন বছর ধরে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে তাঁরা যে ব্যাপক ভিত্তিতে বাংলার লোক-সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে যাচ্ছেন তা ইতিমধ্যেই জনমনে অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য কতিপয় প্রতিষ্ঠানের তৎপরতাও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

এটি স্পষ্টতঃই একটি আশাব্যঞ্জক লক্ষণ। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, লোকসংস্কৃতির প্রতি আমাদের সহজ মনের অনুরাগের ধারা নানা বিরূপ অবস্থার সমবায়ে ক্ষীয়মাণ হয়ে এলেও একেবারে বিশুষ্ক হয়ে যায় নি। অবস্থা সামান্য একটু অনুকূল হতেই আবার আমাদের অনুরাগের ভাঁটার টানে জোয়ারের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। যা এতকাল ছিল মনের অবচেতন স্তরে শীর্ণ এক সংস্কারের মত অন্তর্লীন, তা চেতনার উপরিভাগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাঙালীর মনে লোকশিল্পানুরাগ প্রকৃতই একটি জাতীয় সংস্কার। দীর্ঘ কালের অভ্যাসের দ্বারা এই সংস্কার গড়ে উঠেছে। বহু মূল্যবান শ্রুতি ও স্মৃতির সমবায়ে এই সংস্কারের দেহ পরিপুষ্ট। এই সংস্কারের আবরণের উপর বারে-বারেই বিভিন্ন কালের ধূলিমাটির প্রলেপ পড়েছে, কিন্তু তাতে সংস্কারটির মূল চেহারার বিকার ঘটাতে পারে নি। সত্য বটে, গত দুশো বছর পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের আত্যন্তিক প্রভাবের ফলে আমাদের

দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপটি উৎকটভাবে নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল ; ব্রিটিশ-অভ্যুদয় পরবর্তী বাঙালী মানসিকতার ঝোঁক নাগরিক সংস্কৃতির উপর যে পরিমাণ ন্যস্ত হয়েছে, গ্রামীণ বা লৌকিক সংস্কৃতির উপর তার ভগ্নাংশও ন্যস্ত হয় নি। তা সত্ত্বেও বাঙালীর প্রাণশক্তির দুর্বার টিকে থাকবার ক্ষমতার জোরে কেমন করে যেন আমরা এরই মধ্যে আমাদের জাতীয় সংস্কারটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। শত বিপর্যয় আর বৈপরীত্যের মধ্যেও আমরা আমাদের মনের গহনের অবজ্ঞাত কোণায় লুকায়িত লোকশিল্পানুরাগকে লুপ্ত হতে দিই নি। এতে করে বাঙালীর নূতন নূতন ভাবগ্রহণের ক্ষমতার সঙ্গে ধারণক্ষমতারও বড় কম প্রমাণ হয় না।

লোকশিল্পের প্রতি আমাদের অন্তরের ভালবাসা যে মরেও মরে নি তার প্রমাণ, শহরের পটভূমির মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও যখনই আমরা লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্য জাতীয় বিশুদ্ধ গ্রামীণ কোন অনুষ্ঠান শ্রবণ বা প্রত্যক্ষ করি, তখনই আমাদের মন আনচান করে ওঠে। বাউলের সুরে আমাদের মন উদাস হয়ে যায়। ভিখিরি বৈষ্ণবের মুখে শোনা সাধারণ কীর্তনের সুরে মনের মধ্যে বহুদূরাগত স্মৃতির কলকল্লোল অনুভব করি। হয়তো আজীবন শহরের ইট-কাঠের হাঁফ-ধরা খাঁচায় মানুষ হয়েছি, গ্রাম কখনও দেখি নি, কিন্তু যা-ই ভাটিয়ালীর একটানা মধুর সুর কানে এসে বাজল, অমনি সমগ্র সত্তা অননুভূতপূর্ব আবেগের দোলায় আলোড়িত হয়ে উঠল। এই-যে আশ্চর্য সংঘটন, এর শুধু একটি মাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভব। যতই কেন না আমরা নাগরিক জল-হাওয়ায় বড় হই, গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যতই ক্ষীণ সুতোয় ঝুলে থাক্, আমাদের মনের গভীর গোপনে লোকশিল্পপ্রীতি একটা সহজ সংস্কার রূপে সততবর্তমান ; আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে তা লিপ্ত হয়ে আছে। একে অস্বীকার করা আর আমাদের জাতীয় স্বভাবকে অস্বীকার করা একই কথা।

রবীন্দ্রনাথ এ জিনিসটি বুঝেছিলেন। তাই তিনি নগরের পরিশীলিত, মার্জিত আবহাওয়ায় ষোল-আনা লালিত হয়েও লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারার

সঙ্গে একান্তভাবে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছিলেন। উনিশ শতকের কলকাতার অভিজাত ধনীগৃহের আবেষ্টনী কতকাংশে ইংরেজী রীতিনীতির দ্বারা আবিষ্ট ছিল, আবার তার উপর ছিল মুঘলযুগসুলভ ঐশ্বর্য-আড়ম্বরেরও প্রভাব। সায়েবিয়ানা আর আমিরিয়ানায় মিশে কলকাতার বনেদী পরিবারের বহির্মহলের আবহাওয়া সত্যই বিজাতীয়তার এক-একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। অন্দরমহলে অবশ্য সনাতন জাতীয় রীতিনীতির প্রভাবটাই ছিল বলবৎ, কিন্তু অন্দরমহলের দ্বারা বহির্মহল যেমন প্রায় কোন ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত হয় না, এ ক্ষেত্রেও হয় নি। অন্তঃপুরের জগৎ ছিল নিতান্ত ঘরোয়া আচার-আচরণের জগৎ, তার সঙ্গে দেশের প্রবহমান শিল্প-সংস্কৃতির আন্দোলনের বড় একটা যোগ ছিল না। বহির্মহলে তখন বিজাতীয়তার বন্যা বয়ে চলেছে। উনিশ শতকের বাংলার প্রতিটি শিল্পসংস্কৃতিমূলক তৎপরতার উপর নাগরিকতার ছাপ স্পষ্ট। এই নাগরিকতাও আবার দেশজ সংস্কারের ভিত্তিতে গঠিত নাগরিকতা নয়, ওই নাগরিকতার রীতিনীতি, পদ্ধতি-প্রকরণ আগাগোড়াই বিজাতীয়। এক দিকে মোগলাই আদবকায়দা, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ধ্যানধারণা—এই দুই প্রবল বিষম প্রভাব একত্রিত হওয়ার দরুণ বাংলার উনিশ শতকীয় শিল্প-সংস্কৃতি থেকে গ্রামীণ প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণ বিদূরিত হবার উপক্রম হয়েছিল।

এই রকমের এক ঘোরতর প্রতিকূল আবহাওয়ায় আবাল্য নিঃশ্বাস গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে লোকসংস্কৃতির অনুরাগী হওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু অপরিসীম প্রতিভাশালী শিল্পীর সহজাত দূরদৃষ্টির বশে রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ বয়সে উপনীত হবার অনেক আগেই বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির যথার্থ মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলার গ্রামজীবনের অঙ্গীভূত বাউল-সাধনা কবির শিল্প-সাধনার সহিত একাত্ম হয়ে আছে। কবি জমিদারীর কার্য তদারকির সূত্রে শিলাইদহ ও সাহাবাজপুরে বাস করা কালে বাউলদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। বাউল-সাধনা ছাড়া অন্যান্য ধরনের গ্রামীণ শিল্পসাধনাও কবির মনোজীবনের উপর বড় কম প্রভাব

বিস্তার করে নি। মধ্যযুগীয় সাধকদের সহজিয়া সাধনার যে ভাবরূপ আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে পাই, তা আসলে ভারতবর্ষের সামগ্রিক লৌকিক সংস্কৃতিরই একটা মূল্যবান অংশ। কবির বিভিন্ন বাণী ও জীবনচর্যার আদর্শের মধ্যেও আমরা লোকশিল্পের প্রভাব একান্তরূপে অনুস্যূত দেখতে পাই।

নাগরিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সুষ্ঠু সমন্বয়ের আর একটি সার্থক দৃষ্টান্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আমাদের লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে দু-হাতে উপকরণ আহরণ করে তাঁর শিল্পসাধনাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথের তুলি ও বুলি দুইয়ের মধ্যেই আমরা বাংলার লোকশিল্পের স্বাদগন্ধের পরিচয় পাই। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পসাধনার প্রাথমিক অধ্যায়ে পাশ্চাত্ত্য শিল্পাদর্শের দ্বারা একান্তভাবে প্রভাবিত ছিলেন; সকলেই জানেন এক সময়ে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটেছিল। যদিও অবনীন্দ্রনাথের মানসিকতার এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের মূলে হ্যাভেল, ওকাকুরা প্রভৃতির দৃষ্টান্তকে সব চাইতে কার্যকরী প্রভাবরূপে নির্দেশ করা হয়, তা হলেও সেইটেকেই একমাত্র কারণ মনে করা বোধ হয় উচিত হবে না। খুব সম্ভব এই ক্ষেত্রে পিতৃব্যের দৃষ্টান্তও ভ্রাতুষ্পুত্রের মনের উপর কার্যকরী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি-প্রীতি অজ্ঞাতসারে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-ভাবনাকে প্রভাবিত করে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ—বাংলার শিল্পজগতের এই দুই প্রধান পুরুষের সার্থকতার উদাহরণ আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই প্রত্যক্ষ করে গেলাম। বাংলার আধুনিক সংস্কৃতির সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রাধিপতি রবীন্দ্রনাথ, তার উজ্জ্বলতম গ্রহগুলির অন্যতম অবনীন্দ্রনাথ। হাতের কাছে এই দুই নজীর বিদ্যমান, কাজেই অতঃপর আর বলা চলবে না যে, পাশ্চাত্ত্য ভাবের খাতে আগত নাগরিকতাটাই শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় কথা, আমাদের নিজস্ব গ্রামীণ সংস্কৃতি কিছু নয়।

বাংলা দেশের ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদী শিল্প এবং লৌকিক শিল্প এই দুই শিল্পের ধারা এবং সেই সঙ্গে উপরন্তু হিসাবে কিছু পরিমাণে পাশ্চাত্ত্য শিল্পের

রস একত্র সমন্বিত হলে তবেই শুধু আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির সার্থকতম প্রকাশ সম্ভব। মোটের উপর, এই মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতির উপাদান কোন মতেই বাদ দেওয়া চলবে না। এ কথা যে কত বড় খাঁটি কথা তার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা হল রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা। তিনি তাঁর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব ও সাধনার দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিকূলতা নিরস্ত করে গেছেন।

অবশ্য এমন কথা বলব না যে, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ত্যাজ্য। পাশ্চাত্ত্য ভাবের দ্বারা আমরা অতীতে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি, ভবিষ্যতেও হব, যদি আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য রস সংযোজনা করি। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণ জাতীয় ব্যবধানের বেড়া না থাকাই উচিত, দেশবিদেশের ভাবজগৎকে অবলম্বন করে তার পরিধির সম্প্রসারণে কোন বাধা নেই। তবে এ সম্প্রসারণ যতই দূরবিস্তারী হোক-না কেন, শিল্পের প্রাণকেন্দ্রটি জাতির অন্তরে স্থিত থাকা চাই। আমরা এই ক্ষেত্রে সমন্বয়ের আদর্শের পরিপোষক। যেখান থেকে যা-কিছু ভাল পাব তা দিয়েই আমাদের সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে সর্বাংশে ঝেঁটিয়ে বিদায় না করা পর্যন্ত জাতীয় সংস্কৃতির মুক্তি নেই—এ কথা যেমন গ্রাহ্য নয়, তেমনি এ কথাও সমান অগ্রহণীয় যে, পশ্চিমী সাহিত্যের ধ্যানধারণা আরও বেশী পরিমাণে আত্মস্থ করতে পারলেই আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির মুক্তি। অথচ, শেষোক্ত মত সমর্থন করেন এমন শিল্পী সাহিত্যিক এ দেশে বিরল নন। সম্প্রতি বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলনের মণ্ডপে সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, আমরা অতীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপকৃত হয়েছি, ভবিষ্যতেও ওই পথেই আমাদের চলা উচিত। বস্তুতঃ ওই পথেই আমাদের কল্যাণ নিহিত। বক্তা প্রকারান্তরে লোকসংস্কৃতির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

বসু মহাশয়ের এই মত একদেশদর্শিতাপ্রসূত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শুভংকরতায় অতিরিক্ত বিশ্বাসের সঙ্গে জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যে অবিশ্বাস একত্র যুক্ত হলে যে মনোভাব গড়ে ওঠা সম্ভব, বক্তার উক্তির মধ্যে সেই মনোভাব প্রতিফলিত। মনোভাবটি গ্রহণ করা যায় না। মনে হয় মনোভাবের এই সংকীর্ণতার জন্যই শ্রীবুদ্ধদেব বসু এবং তদনুরূপ ভাবের ভাবুকদের রচিত সাহিত্য আংশিক খণ্ডিত হয়ে আছে। এঁদের আত্যন্তিক পাশ্চাত্ত্যমনস্কতার জন্যই বোধ হয় বাংলা দেশের পাঠকসমাজ এঁদের সাহিত্য তেমন উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারল না। কিন্তু শ্রীবুদ্ধদেব বসুর পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শে অতিরিক্ত আস্থা এবং লোকসংস্কৃতির প্রতি আনুপাতিক অবহেলার নীতি প্রচারের কারণ বোঝা দুষ্কর। তাঁর লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি, তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধমাত্র পাশ্চাত্ত্য ভাবের ভাবুক ছিলেন না; কবির মানসিকতায় বিভিন্ন ভাবধারার সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন মূলতঃ প্রাচ্য ভাবাদর্শের সাধক, এ যুগে তিনি তার শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতাও বটে। কবির মনোজীবনের উপর লোকসংস্কৃতির প্রভাব সাতিশয় প্রবল ছিল। এ সম্বন্ধে একটু আগে আলোচনা করা হয়েছে, প্রসঙ্গটি বিস্তারিত করার আবশ্যকতা দেখি না। এখানে শুধু বক্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথকে যিনি শিল্পসাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করেন তিনি কেমন করে লোকসংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা খর্ব করে পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের উপর সবটুকু মনোযোগ আরোপ করেন? এটা কি স্বতোবিরোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নয়?

যা-ই হোক, এ বিষয়ে আজ আর সংস্কৃতিনিষ্ঠদের মধ্যে বিশেষ দ্বিমত নেই যে, লোকসংস্কৃতিকে যে-কোন শিল্পপরিকল্পনায় তার যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে। নাগরিক সংস্কৃতির যাঁরা অনুশীলন করেন, লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ খনিগর্ভ থেকে তাঁদের দু-হাতে উপকরণ আহরণ করতে হবে। একটা দেশের শিল্প-সংস্কৃতি যেহেতু নাগরিক আবহাওয়াতেই মূলতঃ গড়ে ওঠে, সেইহেতু সংস্কৃতির কাঠামোয় নাগরিকতার প্রভাব অত্যধিক হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়,

অসঙ্গতও নয়। তবে দেখতে হবে অন্তরে যেন অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় লোকসংস্কৃতির প্রভাবের স্রোত বহমান থাকে। সংস্কৃতির গভীর গহনে থাকবে লোকসংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন দ্যোতনা, তার বাইরে থাকবে নাগরিকতার আভরণ ও পালিশ। নাগরিক অঙ্গসজ্জা আর ত্বকাবরণের অন্তরস্থ হৃদ্‌পিণ্ডটি যদি গূঢ় জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে অনুরূপ ছন্দে ধুকপুক করে, তা হলে শিল্প-সংস্কৃতির বাইরের পরিমার্জিত শহুরে রূপটি সম্পর্কে আপত্তি করবার কিছু নেই।

লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে সমালোচকদের একটা যুক্তি এই যে, এই প্রয়াসটি নাকি রিভাইভ্যালিস্ট, প্রগতিশীলতার মানদণ্ডে একে সমর্থন করা যায় না। লোকসংস্কৃতির পরিপোষকগণ লোকসংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন শিল্পরূপ পুনঃপ্রচলনের চেষ্টার নামে আসলে যা করছেন তা হচ্ছে পুরাতন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন। লোকসংস্কৃতির পুনঃপ্রচলন প্রয়াসের সঙ্গে আধুনিক প্রগতিধর্মী শিল্পসাহিত্য-আন্দোলনের সত্যিকার কোন যোগ নেই; ওটি শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতারই নামান্তর।

এর উত্তর এই যে, লোকসংস্কৃতির পুনঃপ্রচলনের অর্থ পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া নয়। যে অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক পরিবেশে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখাগুলির বিকাশ হয়েছিল সেই পরিবেশের অনুরাগী না হয়েও লোকসংস্কৃতির আদর্শের অনুরাগী হওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, এখনকার লোকসংস্কৃতি-কর্মীগণ অল্পবিস্তর সকলেই এই মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাঁরা প্রগতিশীলতার আদর্শে বিশ্বাসী, তা বলে জাতির পুরাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি বিষয়ে অচেতন নন। তাঁরা লোকশিল্পের পুনঃপ্রচলন চান অতীতের প্রতি কোনরূপ মোহবশতঃ নয়; পক্ষান্তরে লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ রূপগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাই তাঁদের লক্ষ্য। তাঁদের সমস্ত প্রয়াসের মূলে আছে এই বিশ্বাস যে, বিদগ্ধ বা নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতি অন্বিত হলে তবেই শুধু নাগরিক সংস্কৃতির মহত্তম রূপ উন্মোচিত হওয়া সম্ভব। প্রাচীন ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার মোহ কোন প্রগতিশীল সংস্কৃতি-

কর্মীর থাকতে পারে না, নেইও। তা ছাড়া এটা চাওয়া বা না-চাওয়ার প্রশ্ন নয়, আজ শত চেষ্টা সত্ত্বেও পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে এখনকার কাঠামোর মধ্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যুগ বদলেছে, সুতরাং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেরও বদল হয়েছে। অতীতাশ্রয়ী সংরক্ষণশীল মনোভাবের পোষকতাবশে কেউ যদি আজ লোকসংস্কৃতির পুনঃপ্রচলন করতে চান, তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ হবে। লোকসংস্কৃতির নিজস্ব মূল্যেই তার গৌরব, এ ক্ষেত্রে সামাজিক-আর্থিক ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা অবান্তর। লোকসংস্কৃতির সামাজিক-আর্থিক-রাষ্ট্রিক পটভূমি নিশ্চয়ই একটা আছে, তবে সে বিচার এখানে জরুরী নয়। শিল্পগত বিচারটাই হচ্ছে বর্তমান প্রসঙ্গে আদৃত কথা। যাঁরা রিভাইভ্যালিস্ট আখ্যায় লোকসংস্কৃতির পুনঃপ্রচার প্রয়াসের সমালোচনা করেন, তাঁরা জাতীয় জীবনে, বিশেষ, জাতীয় জীবনের শিল্প-সাহিত্যের বিভাগে, লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক্ সচেতন নন বলেই মনে হয়। রিভাইভ্যালিস্ট কথাটা খারাপ, কিন্তু রিভাইভ্যাল মাত্রই খারাপ নয়। লোকসংস্কৃতির পুনঃপ্রচলন চেষ্টার মধ্যে যদি শ্রেষ্ঠ আদর্শের উজ্জীবন থাকে, হোক তা পুনঃপ্রচলনবাদ, তা এমন কিছু দোষাবহ বলে মনে করি না।

খেলনা ও পুতুল

বৎসরাধিককাল পূর্বে নয়াদিল্লীতে শঙ্কর্‌স্ উইকলির উদ্যোগে একটি পুতুল-প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকারের পুতুল ও খেলনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল। পুতুল বস্তুটি শিশুর মনোরঞ্জক, তবে বয়স্ক ব্যক্তিদেরও যে তা যথেষ্ট মনোহরণ করতে পারে, আলোচ্য প্রদর্শনীর অপরিসীম সাফল্যই তার প্রমাণ। প্রদর্শনীটির আকর্ষণ শুধুমাত্র শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বয়স্করাও তা থেকে প্রভূত আনন্দ আহরণ করেছেন।

খতিয়ে দেখতে গেলে, বয়স্কদের মধ্যেই যেন পুতুলের অধিক সমাদর লক্ষ করা যায়। আধুনিক গৃহসজ্জায় ঘর সাজাবার উপকরণ হিসাবে আজকাল অনেকেই পুতুলের ব্যবহার করে থাকেন। নানা রকমের কাঠের ও মাটির পুতুল তথা খেলনার সাহায্যে গৃহের শোভা বর্ধনের একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। এখনকার কেতাদুরস্ত যে কোন গৃহের ফ্যাশনেব্‌ল্ ড্রইং-রুমে দুটো-চারটে পুতুল আবিষ্কার করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। অতি বড় উদাসীন আগন্তুকও ইতস্ততঃ চক্ষু ঘোরালে দেখতে পাবেন, নানা রকমের পুতুল ও খেলনা ঘরের এখানে-সেখানে আপাত-বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে আছে। পুতুলের সমারোহ দেয়ালবদ্ধ তাকে, টেবিলে, জানলার পাটাতনে, কুলুঙ্গিতে। গৃহসজ্জার উপকরণরূপে ব্যবহৃত ওই সকল পুতুল বা খেলনা যত পুরাতন ধাঁচের হয়, তত তার সমাদর। কেন না, পুরাতনের মধ্যেই নাকি শিল্পের কৌলীন্য নিহিত। হাত-পা-মুখ আছে কি নেই এমন এক তিন-ব্যাঁকা কাষ্ঠমূর্তি কোন গতিকে কেউ যদি আত্মগত করতে পারে, তা হলে অনায়াসেই তাকে বনেদীয়ানার হাটে চড়া দরে বিক্রি করা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে রুচির প্রশ্ন, সৌন্দর্যের প্রশ্ন অবান্তর; ফ্যাশানটাই দস্তুর। বাংলাদেশে এখনকার কালে সংস্কৃতি ও রুচিবান বলে যাঁর সামান্যতম আত্মাভিমান আছে, পুরাতন-প্রীতি তাঁর স্বভাবের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিশেষ, তথাকথিত 'রাবীন্দ্রিক'

সংস্কারে লালিত ও পুষ্ট নর-নারীর জীবনে এই প্রবণতা আরও বেশী করে চোখে পড়ে। কলকাতা শহরে শিক্ষা ও শিল্পাভিমানী কিছু কিছু লোক আছেন, খেলনা-প্রীতিতে যাঁরা ডগমগ। তাঁদের গৃহশোভার উপকরণের মধ্যে চোখ-মুখের আবয়বিক লক্ষণশূন্য পুরানো ঢঙয়ের কাষ্ঠমাত্রসার খেলনা যদি না-ও থেকে থাকে, দু-চারটে আধুনিক দারুমূর্তি থাকবেই থাকবে। অভাবে কৃষ্ণনগরের কারিগরদের তৈরী দুটো-চারটে মৃন্ময় পুতুল। তারা দৃশ্যতঃ পুরাতনের ছাপ-মারা, আসলে হালে তৈরী।

তবু খেলনা জিনিসটি ফ্যালনা নয়। ওটি শৈশবের আনন্দের প্রতীক। এমন ব্যক্তি বিশ্বসংসারে খুব কম আছে, শৈশবে দু-দশটা পুতুল নাড়াচাড়া করবার সৌভাগ্য যার না হয়েছে। খেলনার ভিতরের কথাটা হচ্ছে আনন্দ, সেইজন্য শিশুর নিকট তা এত আদরের বস্তু। আমাদের বাংলাদেশে শিশু-জীবনে খেলনার প্রভাব অত্যধিক। বস্তুতঃ, বিচিত্র ধরনের খেলনা ও পুতুলের সাজসরঞ্জাম নিয়ে খেলাঘরের একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্যই দাঁড়িয়ে গেছে বাংলার শিশু-জীবনে। নানা রঙ-বেরঙের পুতুল ও খেলনায় বাঙালী শিশুর খেলাঘর সমাকীর্ণ। পুতুলের বিয়ে খেলাঘরের একটি বৈশিষ্ট্য। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের দল কল্পিত খেলাঘরের আঙিনায় কখনও নিজেরা ঘর-গেরস্থালীর অভিনয় করে, কখনও পুতুলের সাহায্যে সে কাজ নিষ্পন্ন করে। পরিণত সংসার-জীবনের একটি রূপক শিশুর খেলাঘর। অতিরিক্ত সংসারমনস্কতার ফল যেমন ভাল হয় না, শৈশবে ঘর-গেরস্থালীর খেলা নিয়ে অতিরিক্ত মেতে থাকার পরিণামও তেমনি ভাল হয় না বলে আমাদের বিশ্বাস। কথায় বলে, "অতি ঘরন্তী না পায় ঘর, অতি বরন্তী না পায় বর।" এর ভিতরকার কথা সম্ভবতঃ এই যে, আকাঙ্ক্ষাকে খুব বেশী প্রশ্রয় দিতে নেই। অতিরিক্ত চাওয়ার মধ্যেই চাওয়ার পরাজয়। বিষয়বাসনাকে অত্যধিক 'নাই' দিলে মনের সব বাতায়ন রুদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অনক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত হয়েও সংসারজীবনের এই গূঢ় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত আছে, উল্লিখিত চলতি প্রবচনই তার প্রমাণ।

আর একটি ব্যাপারে বাঙালীর স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পুতুল-নাচ। এক সময়ে পুতুল-নাচ বাংলাদেশে সবিশেষ প্রচলিত ছিল। এখন অবশ্য পুতুল-নাচের পূর্বতন জনপ্রিয়তা আর নেই, তবে পল্লী অঞ্চলে আজও এই নির্দোষ আমোদের অভ্যাসটি টিকে আছে। গত দুই বছর বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের আসরে পুতুল-নাচ দেখবার আমাদের সুযোগ হয়েছে। প্রদর্শিত পুতুল-নাচের মান প্রত্যাশানুরূপ না হলেও এটি যে একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ভগ্নাবশেষ তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। উৎসাহ ও আনুকূল্যের অভাবে পুতুল-নাচের প্রচলন স্পষ্টতঃই আজ মন্দীভূত হয়ে এসেছে। চেষ্টা করলে তার জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। পুতুল-নাচ আমোদ হিসাবে যেমন উপাদেয়, তেমনি তার মধ্যে একটি তত্ত্বের সংকেতও নিহিত আছে। বড় বড় গুণী-জ্ঞানী কবি সন্ত শ্রেণীর মানুষের মত এককালে আমাদের দেশের সাধারণ লোক-শিল্পীরাও এ কথা জানত যে, সংসার একটি রঙ্গমঞ্চ বিশেষ এবং আমরা সবাই তাতে অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। আপন আপন সত্তা সম্পর্কে যতই আমাদের আত্মাভিমান থাকুক না কেন, আসলে এই আত্মাদরের ভিত্তি অতিশয় পলকা। সামগ্রিক বিশ্বপরিকল্পনায় আমাদের কারুরই গুরুত্ব খুব বেশী নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, আমরা সকলেই অদৃশ্য চালকের দ্বারা চালিত অকিঞ্চিৎকর জীবমাত্র। যন্ত্রীর হাতে যেমন যন্ত্র, তেমনি বিশ্বনিয়ন্তার অদৃশ্য করধৃত সূত্রের ওঠানামার সঙ্গে আমাদের ওঠানামা। আমরা সব ভব-রঙ্গমঞ্চের পুতুল, চালকের অঙ্গুলিহেলনে কেবলই ওঠবোস করছি। পুতুল-নাচের এইখানেই বৈশিষ্ট্য। আর কোন কারণে যদি না-ও হয়, নিছক এই কারণে, অর্থাৎ দর্শকসাধারণের ভিতর অকিঞ্চিৎ-করত্বের চেতনা সঞ্চারিত করে দেবার জন্যে, পুতুল-নাচের প্রচলন জীইয়ে রাখবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

আর-এক দিক দিয়ে খেলনা ও পুতুলের সার্থকতা আছে। শিশুর মনোরঞ্জক খেলনা ও পুতুল শিল্পনৈপুণ্যের বিচারে স্থূল শিল্পকর্মরূপে পরিগণিত হতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে এ-ও স্বীকার করতে হবে যে, খেলনার মধ্যেই শিল্পরূপের

শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। শিল্পী তাঁর সাধনার পথে যত অগ্রসর হন, শিল্পসার্থকতার যত উচ্চগ্রামে তিনি উন্নীত হতে থাকেন, তত তাঁর শিল্পকর্ম খেলা ও খেলনার নিকটতর হতে থাকে। এ কথার প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের খেয়ালের ফসল চিত্রকলা, অবনীন্দ্রনাথের 'কুটুম-কাটুম', রোদাঁর উত্তর-জীবনের আবয়বিক পরিমিতিশূন্য ভাস্কর্যের কিম্ভূত সব নমুনা, টলস্টয়ের পরিণত লেখনীপ্রসূত অলঙ্কাররিক্ত সহজ-সরল গল্পাবলী। খেলনায় আমাদের জীবনের আরম্ভ, খেলনায় তার শেষ। জীবন-রূপ খেলনাটিকে বিশ্ববিধাতার হাতে সঁপে দিয়ে আমাদের সংসার-রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান।

শঙ্কর্‌স্ উইকলির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পুতুল-প্রদর্শনীর সার্থকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বয়স্কদের পুতুল ও খেলনার সূত্রাবলম্বন করে শৈশবের আনন্দময় স্মৃতি স্মরণ করতে বলেছেন। শৈশবের আনন্দময় ভাব-স্মৃতি রোমন্থন করলে জীবনের সার্থকতায় বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, দুঃখ-দুর্গতিপূর্ণ পরিণত জীবনের ভার বহনীয় হয়। নেহরুজীর এই কথাটি অতিশয় খাঁটী। বাস্তবিক, কৃত্রিমতা ও দুঃখভরা জীবনের ক্লেশভার লাঘব করতে হলে মাঝে মাঝে শৈশবের সুখস্মৃতির দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন আছে বৈকি। যাঁরা বলেন, শৈশব, বাল্য, কৈশোর ইত্যাদি গত জীবনের অংশের প্রতি দৃক্‌পাত করা অতীতাশ্রয়িতাকে প্রশ্রয় দেবার সামিল—তাঁদের কথা মানতে পারি না। পুরাতনকে মনে রাখলে তবেই শুধু নূতনের ভূমিকা রচনা করা যায়, নচেৎ নয়।

রঙ্গমঞ্চ বনাম চলচ্চিত্র

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন; চলচ্চিত্র সেই তুলনায় একেবারেই আনকোরা নূতন। মাত্র বিংশ শতাব্দীতে এর উদ্ভব ও বিকাশ। তার ভিতর আবার সবাক চিত্রের বয়স তিরিশ-বত্রিশ বছরের বেশী হবে কি না সন্দেহ। উপমার সাহায্যে বলতে গেলে বলতে হয়, রঙ্গমঞ্চ যেখানে সবল চরণক্ষেপে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ সবেমাত্র একটু ঝিমুতে বসেছে, সেই অনুপাতে চলচ্চিত্র এখনও হামাগুড়ির অবস্থায় এসেও পৌছয় নি।

নূতনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। এবং সেটা স্বাভাবিক। চলচ্চিত্র যে আজ সমস্ত সভ্য দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষের মন অধিকার করে বসেছে তার মূলে এই নূতনত্বপ্রীতিই প্রধানতঃ কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য শুধু মাত্র নূতনত্বের জোরেই যে চলচ্চিত্র মানুষের মন হরণ করেছে তা বলছি নে, তবে রঙ্গমঞ্চের ন্যায় তিলে-তিলে গড়া সযত্নপোষিত একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠানকে মুহূর্তেকে অনাদরের ধূলোয় নিক্ষেপ করে মানুষ যেভাবে চলচ্চিত্রের পিছনে ছুটে চলেছে তাতে অসার নূতনত্বপ্রীতি, চিত্তের তরলতা এবং বহুচারিতার অপবাদটুকু আবার নতুন করে মানুষের উপর চাপাতে হয়।

পুরাতন বলেই রঙ্গমঞ্চের হয়ে ওকালতি করছি তা কেউ ভাববেন না। পুরাতনের প্রয়োজন যদি ফুরিয়ে যায় তা হলে তা অবিলম্বে বর্জনীয়, অন্যান্য অনেক অগ্রসরপন্থীর মত আমিও এই মতে বিশ্বাসী। যে জিনিস ধরে থাকা গলিতশব আঁকড়ে থাকারই সামিল, যে শিল্প তার সর্বোচ্চ বিকাশের অধ্যায় অতিক্রম করে decadence-এর স্তরে এসে পৌছেছে (যেমন আমাদের দেশের হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত), তাকে ঠেকো দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার কোন মানে হয় না, তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু দেখতে হবে রঙ্গমঞ্চেরও সেই অবস্থা হয়েছে কি না; মানুষের শিল্প ও সংস্কৃতি-জীবনে তার যা ভূমিকা,

তার নিঃশেষ পরিসমাপ্তি হয়েছে কি না। তা যদি না হয় তো রঙ্গমঞ্চকে হঠাৎ বরবাদ করে চলচ্চিত্রের পিছনে হন্তে হয়ে ছোটা মানুষের তরলচিত্ততারই পরিচায়ক নয় কি ?

আমার তো মনে হয়, রঙ্গমঞ্চ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে বটে, কিন্তু তার সম্মুখে এখনও সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ প্রসারিত। জনসাধারণের অত্যধিক সিনেমা-প্রীতির জন্য মাঝপথে এসে হঠাৎ সে থেমে গেছে মাত্র। যেখানে এসে আজ সে বসে পড়েছে, মানুষের সযত্ন চেষ্টায় ও শিল্পীর একাগ্র সাধনায় সেখান থেকে তুলে তাকে আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এক কথায় রঙ্গমঞ্চের সম্ভাব্যতা আজও অপরিসীম ; সেইটে হৃদয়ঙ্গম করে আমরা যদি রঙ্গমঞ্চের বিকাশকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারি তা হলে জাতীয় জীবনের একটি বড় রকমের ত্রুটি দূর হয়।

এইখানেই রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দেখতে হবে চলচ্চিত্রে এমন কি আছে যা রঙ্গমঞ্চে নেই ; আবার এর উল্টো দিক দিয়ে, এমন কোন্ সম্পদ রঙ্গমঞ্চের আছে যার কাণাকড়িও চলচ্চিত্র নিজের বলে দাবী করতে পারে না। এক কথায় কোন্ কোন্ দিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রকৃতি চলচ্চিত্রের প্রকৃতি থেকে আলাদা এবং সেই প্রকৃতির তারতম্য-বিচারে এদের কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই তুলনামূলক বিচার আমাদের লক্ষ্য।

চলচ্চিত্রের বয়স অতি নবীন, এই আলোচনায় আমাদের সব সময় সে কথা মনে রাখতে হবে। তবে সেই সঙ্গে এও আমাদের মনে রাখা দরকার, নবীনত্বই চলচ্চিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। যতদিন পর্যন্ত সবাক চিত্র আবিষ্কৃত হয় নি ততদিন চলচ্চিত্রকে সর্বাংশেই একটি নূতন শিল্প নামে অভিহিত করা যেতে পারত, কিন্তু 'নির্বাক' ছবি যখন 'সবাক' হল, আপাতদৃষ্টিতে এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে তাতে যত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তনই সাধিত হোক না কেন, আসলে তা রঙ্গমঞ্চের অনুকরণ বই আর কিছু নয়। ছবির মানুষ কথা কয়, গান গায় এটা যান্ত্রিক উদ্ভাবননৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা

সন্দেহ নেই, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে তা রঙ্গমঞ্চের প্রক্রিয়ার অনুকৃতি মাত্র। রঙ্গমঞ্চের বৈশিষ্ট্যগুলিকে পর্দার গায়ে আরোপ করার ভিন্ন নাম হল সবাক চিত্র। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, নির্বাক ছবির সবাক হওয়ার প্রচেষ্টাটাই রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। আজ সবাক ছবি শুধু সবাক থেকেই সন্তুষ্ট নয়, পর্দার গায়ের মানুষগুলিকে সত্যি সত্যি দেহী জীবের ন্যায় দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ দেবার চেষ্টা চলেছে এবং ওদেশে কিছু কিছু **"three-dimensional"** ছবি তৈরীও হয়েছে। এতে এই কথাটাই প্রমাণ হয় যে, চলচ্চিত্র নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারেই রঙ্গমঞ্চের পদ্ধতি-প্রকরণ, ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করে চলেছে। চিত্রনির্মাতারা বাইরে রঙ্গমঞ্চকে যতই সেকেলে ব্যাপার বলে হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করুন না কেন, এটা তাঁরা জানেন এবং মনে মনে স্বীকার করেন, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের সঙ্গে পর্দার গায়ে অভিনীত নাটক আজও পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে নি; তাই সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে চলচ্চিত্র রঙ্গমঞ্চের প্রক্রিয়াগুলিকে আত্মস্থ করবার চেষ্টা করছে।

অবশ্য কোন কোন লেখকের মত এই যে, ছায়াছবি শুধু স্টেজের বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করবারই চেষ্টা করছে না, একই সঙ্গে সে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন কলাশিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলিও অধিগত করবার চেষ্টা করছে। চিত্রনির্মাতাদের ভিতর যাঁরা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তাঁরা এখন থেকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী, শ্রেষ্ঠ নৃত্যকার, শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রভৃতি নিয়োগ করে ছবিকে সব দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চাচ্ছেন। ছবির প্রতিটি বিভাগ যাতে সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে পর্দার গায়ে সুন্দরতম রূপ পায় সেইজন্যে চিত্রনির্মাতারা অকাতরে অর্থব্যয় করছেন—অর্থের লোভে শিল্পী সাহিত্যিক সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে অনেকে এরই মধ্যে নিজের নিজের বৃত্তির সযত্ন অনুশীলন ত্যাগ করে সিনেমার যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়েছেন এরূপ দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব দেখা যাচ্ছে না। এই সব লক্ষণদৃষ্টে উপরোক্ত লেখকেরা অনুমান করছেন, এমন দিন আসা বিচিত্র নয় যখন অন্য কোন শিল্পের অস্তিত্বই হয়তো থাকবে না; সিনেমা অন্য সব শিল্পকে

নিজের মধ্যে গ্রাস করে একচ্ছত্র অধীশ্বররূপে সংস্কৃতি-রাজ্যে বিরাজ করবে। এই সব উৎসাহী চলচ্চিত্র-সমর্থকদের মতে অন্য সব শিল্পকলাকে **supplement** করবার জন্যে সিনেমা নয়, তাদের **supplant** করবার জন্যেই সিনেমা।

কিন্তু এই অনুমান যুক্তিযুক্ত কিনা সন্দেহ। সিনেমা অন্য সমস্ত শিল্পের সাহায্যে আজকের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূর করে নিজের বহুবিধ উৎকর্ষ সাধন করতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার দ্বারা এটা কখনই বোঝায় না যে অন্যান্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য নিঃশেষে আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা তার আছে। আদর্শের দিক দিয়ে যেমন এটা অবাস্তব, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তা তেমনি অচল। অন্য কোন নজীর তুলব না, শত বিপর্যয়ের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ যে আজও টিকে আছে এবং চলচ্চিত্রের উৎকৃষ্টতর সংগঠননৈপুণ্য, প্রচারকৌশল, আর্থিক প্রাচুর্য সব কিছু উপেক্ষা করে জাতীয় জীবনে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে কোন শিল্পই অন্য কোন শিল্পের বিনাশসাধন করতে পারে না? সাময়িকভাবে হয়তো কোন শিল্পকলা হতাদর হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু একটু অনুকূল হাওয়া পেলেই যে তাতে নবজীবনের লক্ষণ দেখা দেয় বাংলার রঙ্গমঞ্চের পুনরুজ্জীবনে তার সব চাইতে বড় প্রমাণ মেলে।

গোড়ায় যে কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম তাতেই ফিরে আসি। চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের প্রকৃতির তারতম্য কোথায়? তাদের বৈশিষ্ট্যই বা কী?

প্রথমে চলচ্চিত্রের কথা ধরা যাক। চলচ্চিত্র নির্বাকই হোক আর সবাকই হোক, তার গঠনরীতিতে যান্ত্রিকতার নৈপুণ্য প্রধান। এই যান্ত্রিকতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চলচ্চিত্রে সব কিছুই কাটা-কাটা, ভাগ-ভাগ: ছবির গায়ে নাটকটির একটি সমগ্র রূপ প্রকাশ পেলেও ছবিনির্মাণের সময় ঘটনাপরম্পরা বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করার কিছু মাত্র প্রয়োজন হয় না। পরের ঘটনা আগে, আগের ঘটনা পরে; দৃশ্যের অর্ধাংশ আজ, বাকী অর্ধাংশ এক সপ্তাহ বাদে; ছবিতে যিনি গান গাইছেন বলে মনে হচ্ছে তাঁর ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে অপরের গাওয়া গানের সংযোগ

সাধন (syncronisation); ষ্টুডিওর অভ্যন্তরের অভিনয়ের পটভূমিকা হিসাবে ক্যামেরায় তোলা বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যসংস্থানের যোজনা; পূর্বপ্রস্তুতি বা কোনরূপ আবেগের প্রেরণা ছাড়া অভিনয়কালে করুণ রসের অবতারণা করা; কথায় কথায় 'কাট্' আর 'এন্. জি.'; ক্যামেরাম্যান খুশী হলেন তো রেকর্ডিষ্ট বেঁকে বসলেন, কান সব ঠিক আছে বলে রায় দিল তো ক্যামেরার চোখ টাটাতে লাগল, কিংবা কান আর চোখ উভয়কেই খুশী করা গেল তো পরিচালক খুঁতখুতিয়ে উঠলেন—এই সমস্ত মিলে চলচ্চিত্রশিল্পকে এমন যন্ত্রনির্ভর ও যান্ত্রিক ভাবাপন্ন করে তুলেছে যে এর ভিতর শিল্পের শিল্পসত্তা আবিষ্কার করতে যাওয়া অনেকখানি পণ্ডশ্রম।

অবশ্য বলা হবে চলচ্চিত্রের শিল্পরূপটিই তো এই রকম। যাকে যান্ত্রিকতা বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে সেইটেই তো চিত্রনির্মাণের বৈশিষ্ট্য, তবে কেন এই নিয়ে আপত্তি? এর উত্তরে বলব, যে শিল্প পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতার অপেক্ষা রাখে না, ঘটনার ক্রমপরিণতির পথ অনুসরণ না করে বিভিন্ন ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট আকারে রূপ দেয়, আবেগের প্রস্তুতি ছাড়াই আবেগ ফোটাতে চেষ্টা করে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিত্ব চাপা দিয়ে তাদের প্রধানতঃ ছবির প্রয়োজন সাধনের উপায় স্বরূপ গণ্য করে, সেই শিল্প কখনও প্রথম শ্রেণীর শিল্প হতে পারে না।

রঙ্গমঞ্চের এখানেই জিৎ। রঙ্গমঞ্চেও কৃত্রিম দৃশ্যপট, কৃত্রিম আলোকসম্পাত প্রভৃতি বাহ্যিক উপকরণের সাহায্য লওয়া হয়, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভিনেয় বিষয়টিতে ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। নাটকীয় চরিত্রগুলি যেমন যেমন স্টেজের উপর অভিনয় করে যায় এবং নাট্যবস্তুতে ঘটনার আনুপূর্বিক বিন্যাস যথাযথ বজায় রেখে অভিনয় করে, দর্শকেরাও ঠিক তেমনি ভাবে নাটকটিকে স্টেজে উপস্থাপিত দেখতে পায় এবং তেমনি তাকে অনুধাবন করে। ফলে কৃত্রিমতার আবহাওয়া কোথাও জমতে পায় না; বাস্তব জীবনের মতই নাটকীয় ঘটনা দর্শকের মনে খাঁটী পারম্পর্যবোধ জাগিয়ে তোলে।

সব চেয়ে বড় কথা হল স্টেজের অভিনেতা-অভিনেত্রীর ব্যক্তিত্ব। স্টেজের উপর কোন অভিনেতা যখন অভিনয় করেন তিনি অতিরিক্ত আবেগজনিত আত্মবিস্মৃতির মুহূর্তেও ভুলতে পারেন না তিনি রক্তমাংসের জীব, তার রক্তমাংসের দেহের অভ্যন্তরে প্রাণস্পন্দন অবিরাম গতিতে চলেছে। সম্মুখে প্রেক্ষাগৃহে যে দর্শকসাধারণ সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দতরঙ্গকে গ্রহণ করবার জন্যে কান পেতে রয়েছে তাঁর বাচনভঙ্গী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের কায়দা একমনে লক্ষ করছে, তাদের সঙ্গে তিনি কেমন করে যেন নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারেন। পারেন নিজের অভিনয়কে দর্শকসাধারণের মনন ও অনুভূতির ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। অভিনেতা যেমন সেখানে এক সজীব সত্তা, দর্শকরাও তেমনি প্রত্যক্ষ, দৃষ্টিগ্রাহ্য এক সজীব উপস্থিতি—দুয়ের যোগাযোগে তবেই নাটকীয় চরিত্রের পরিপূর্ণ পরিস্ফুটন সম্ভব হয়। যেখানে শ্রোতার সঙ্গে অভিনেতার প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই সেখানে যথার্থ রসসৃষ্টি সম্ভব কিনা সেইটেই প্রশ্ন।

চলচ্চিত্রে ঠিক এই অসুবিধাটুকুই প্রকট। 'সেটে' দাঁড়িয়ে অভিনেতা যখন অভিনয় করছেন, অর্থাৎ পরিচালকের নির্দেশমত নিতান্তই যন্ত্রের গতিতে এক পা এগোচ্ছেন তো তিন পা পেছোচ্ছেন কোনরূপ পূর্বপ্রসঙ্গ ছাড়াই হঠাৎ রেগে উঠছেন কি হঠাৎ কেঁদে ফেলছেন, তাঁকে তারিফ করবার মত যেমন কোন দর্শকদল তাঁর সামনে উপস্থিত নেই, তেমনি যখন দর্শকদল সত্যি সত্যি পর্দার গায়ে তাঁকে দেখবার জন্যে সিনেমা-গৃহে জমায়েত হয়, তিনিও আর তখন শরীরগত ভাবে বেঁচে নেই; চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তিনি ততক্ষণে কতকগুলি আলোর বিচ্ছুরণে পরিণত হয়ে গেছেন এবং 'প্রোজেক্টর'-এর মাধ্যমে পর্দার গায়ে আলো ও ছায়ার বিচিত্র সমাবেশরূপে দর্শকচক্ষে প্রতিভাত হচ্ছেন।

দেখা যাচ্ছে এইখানে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে যোগাযোগ দুইদিক থেকেই অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত। যেমন অভিনেতা সজীব দর্শকমণ্ডলীকে চোখের

উপর দেখতে পাচ্ছেন না, অভিনয়কালে তাঁকে প্রেক্ষাগৃহ কল্পনা করে নিতে হচ্ছে (কিংবা আদৌ তাঁকে কিছু কল্পনা করতে হচ্ছে না), তেমনি দর্শকদলের চোখেও অভিনেতা অনুপস্থিত। পর্দার গায়ে অভিনেতার আলোকচিত্রের প্রতিলিপি দেখেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় দুয়ের ভিতর সত্যিকার **understanding** কখনও সম্ভব নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই কারণে যে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী স্টেজ এবং সিনেমা দুয়েতেই অভিনয় করেন, তাঁদের অধিকাংশকেই স্টেজকে সমধিক পছন্দ করতে দেখা যায়। সিনেমা তাঁদের টানে অর্থের আকর্ষণে, কিন্তু স্টেজের প্রতি তাঁদের থাকে সত্যিকার প্রাণের টান। এটা যেমন বিদেশী নটনটীদের বেলায় সত্য, আমাদের দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেলায়ও তেমনি সত্য। এখানে আমরা বিখ্যাত মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা পরলোকগত দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের উক্তি থেকে খানিকটা অংশ তুলে দিচ্ছি, তাতেই পাঠক-সাধারণ বুঝতে পারবেন চিত্রজগতে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সত্ত্বেও মঞ্চের প্রতি তাঁর অনুরাগ কী গভীর আর অকৃত্রিমই না ছিল! "স্টেজে আমি অভিনয় করি কেন?" (দুর্গাদাসের অপ্রকাশিত রচনা, শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দুর্গাদাস' গ্রন্থে সন্নিবেশিত) শিরোনামায় দুর্গাদাস লিখছেন—

"পঞ্চভূতে গঠিত এই দেহ, যে চেষ্টা করলে ভগবানকে পেতে পারে, তার সঙ্গে তারা (চিত্রসমর্থকেরা) করছে লড়াই। আর তার প্রতিবিম্ব —যা চলে জাপানী দম দেওয়া পুতুলের মত, তাকেই আজ সবাই মিলে বড় করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি বলব—এ মানুষের একটা মোহ, ক্ষণিক দুর্বলতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

"মঞ্চকে আমি ভালবাসি। মঞ্চের বৈদ্যুতিক আলোর সামনে দাঁড়িয়ে যখন আমার চোখের সামনে অসংখ্য কালো কালো মাথা দেখতে পাই, তখন আমার দেহের শিরা-উপশিরাগুলি আনন্দে তাথৈ তাথৈ করে নেচে

ওঠে। কিন্তু এ আনন্দ পর্দায় অভিনয় করে আমি কোনদিন পাই নি বা পেতে পারি না।”

কথাগুলির উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। দেখা যায় যাঁদের অভিনয়কলার নৈপুণ্যের উপর নাটকের সাফল্য-অসাফল্য মূলতঃ নির্ভর করছে, সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই মঞ্চকে চিত্রের চাইতে অধিক ভালবাসেন। এই প্রীতি ও অনুরাগের মূল যে প্রাণের অতি গভীরে নিহিত দুর্গাদাসের উপরোক্ত স্বীকৃতি তার প্রমাণ।

আরেকটি কারণে সিনেমা শিল্পকে আমার বড় কৃত্রিম মনে হয়। চিত্রের দৃশ্যসজ্জার জন্য যে অজস্র অর্থ ব্যয় করা হয় সে কথা আশা করি সকলেই জানেন। এই দোষ দেখাদেখি আজকাল স্টেজেও ক্রমে ক্রমে সংক্রমিত হচ্ছে। মঞ্চের কর্তাদের উচিত এই ব্যয়বাহুল্যের আকর্ষণ থেকে সর্ব-প্রযত্নে নিজেদের মুক্ত রাখা। চিত্রনির্মাতারা আজকাল এইভাবে ছবির বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে—'A million-rupee costume picture,' 'Eye-filling sets, gorgeous spectacle'—আরও কত কী সব অর্থহীন কথা! এই সমস্ত বিজ্ঞাপনী নমুনার ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, উপকরণবাহুল্যে, অলঙ্করণপ্রাচুর্যে যে যাকে টেক্কা দিতে পারে তারই তত জিৎ। 'সেটিং'-এর আড়ম্বর যে ছবিতে যত বেশী যেন সে ছবিই সব চাইতে সেরা ছবি। সোজা কথায়, জলের মত অর্থব্যয় করতে পারলেই যেন ছবি সেই নজীরে পাশমার্ক পেয়ে গেল—গুণাগুণ নির্ণয়ের, রসের পরিমাপের আর কোনও নিরিখ নেই।

রসের ক্ষেত্রে এই ধরনের আড়ম্বরের কোন দাম নেই সে কথা বলাই বাহুল্য। দৃশ্যসজ্জার প্রতিটি খুঁটিনাটিই যদি নাটকে সংস্থাপিত করতে হয় তা হলে বাস্তব জীবনের সমস্ত আয়োজনকেই নাটকে উজাড় করে ঢেলে দিতে হয়। কিন্তু তার দরকার হয় না, কেন না নাট্যকলার একটি বড় কথাই হল ব্যঞ্জনা—ইঙ্গিতের সাহায্যে দর্শকের মনে উপযুক্ত আবহ ঘনিয়ে তোলা।

চলচ্চিত্রে ব্যঞ্জনার বালাই নেই। সেখানে সব কিছুই উদ্‌ঘাটিত, অবারিত। কল্পনা বস্তুটির প্রয়োজন সেখানে নিতান্ত সংকুচিত, তার ফাঁকও নেই। এমন একটি আশ্রয় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না যাকে অবলম্বন করে দর্শকের কল্পনা লতিয়ে উঠতে পারে। চিত্রের আড়ম্বরবাহুল্য, উপকরণ-প্রাচুর্য দর্শকের চোখকে আঘাত করে, তার চোখে মায়াকাজল পরাতে জানে না। ঠিক এই কারণেই চিত্রের দৃশ্যসংস্থানগুলিকে বড় বেশী বাস্তবানুকৃতি বলে মনে হয়—নাটকীয় দৃশ্যসজ্জায় যে খানিকটা কল্পনা, খানিকটা ব্যঞ্জনা থাকা চাই এবং দৃশ্যসংস্থাপনের ব্যাপারে জীবনকে অনুসরণ না করে নাট্যকলার নিজস্ব রীতি অনুসরণ করাই যে পন্থা, ছবির সেট-সেটিং-এর আড়ম্বর অন্ততঃ সে কথা প্রমাণ করে না।

নাট্যকলার বড় বড় প্রযোজক এবং নাট্যসমালোচক ও নাট্যরসিক সকলেই নাট্যরসের পরিবেশনে এই ব্যঞ্জনাগুণ ও কাল্পনিকতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে এসেছেন। যেখানে তিনটি বঙ্কিম রেখায় চিত্রকর নদীর ঢেউ-এর কল্পনা দর্শকমনে সঞ্চারিত করতে পারেন, সেখানে সত্যি সত্যি নদীর ঢেউ দেখানো বাস্তবের অনুসারী হয় বটে কিন্তু তা নাট্যকলার নিজস্ব প্রয়োগরীতিসম্মত নয়। এই জন্যই পাশ্চাত্ত্যের এবং এ দেশের বড় বড় নাট্যপ্রযোজকগণ দৃশ্যসজ্জার সারল্যের উপর বরাবরই এত জোর দিয়েছেন। নাট্যকলার প্রয়োগরীতিতে রবীন্দ্রনাথ আড়ম্বরকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর নাটকের দৃশ্যসংস্থাপনে সারল্যের জয়জয়কার। যাকে আপাতদৃষ্টিতে আয়োজনের দীনতা বলে মনে হতে পারে তা যে মোটেই দীনতা নয়, বরং নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় এ দেশে প্রথম সেটা সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। যাত্রায় আয়োজনের ঐশ্বর্য নেই, তাই দর্শক সেখানে শুধু দর্শক নয়, স্রষ্টাও—নিজের মনে মনে তাকে প্রয়োজনীয় দৃশ্যাদি কল্পনা করে নিতে হয়—প্রযোজকও সেখানে দর্শকের উপর দৃশ্যসংস্থাপনের ভার ছেড়ে দিয়ে খালাস। রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই এদিক দিয়ে অন্ততঃ অন্য সমস্ত

নাট্যরূপের তুলনায় যাত্রার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে গেছেন। **Open-air Theatre**-এর পক্ষপাতীও ছিলেন তিনি এই কারণে।

যে সমস্ত নাট্যপ্রযোজক সিনেমার দেখাদেখি মঞ্চেও উপকরণের স্তূপ জমিয়ে তুলতে চাইছেন তাঁরা ভুল পথে চলেছেন। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, নাট্যকলায় রিক্ততাই সম্পদ—উপকরণের পর উপকরণ স্তূপীকৃত করে তুললে লোকের সস্তা বাহবা হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু তাতে নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। যেখানে সামান্য একটি বিশল্যকরণী লতায় কাজ চলা উচিত সেস্থলে সমগ্র গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনা যেমন স্থূলতার পরিচায়ক, আয়োজনের সংযমের পরিবর্তে আয়োজনের অমিতাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া তেমনি বিকৃত রুচির দ্যোতক।

দর্শকমনে স্টেজ ও সিনেমার প্রভাবের তারতম্য বিচারেও স্টেজের শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়ে। আমি এক সময় সিনেমার পেশাদার সমালোচক ছিলাম, কাজের চাপে ভালমন্দ সব রকম ছবিই দেখতে হত। সেই তুলনায় স্টেজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরং অনেক কম ছিল। এই বিচারে সিনেমার প্রতিই আমার পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত ছিল, অন্ততঃ লোকে তাই আশা করবে। কিন্তু এটা দেখেছি স্টেজের নাটক আমাকে যত নাড়া দেয় পর্দার নাটক তত দেয় না। দুইটি সমান গুণসম্পন্ন নাটকের সম্পর্কেই আমার এ অভিজ্ঞতা, স্টেজের ভাল নাটক বনাম পর্দার খারাপ নাটকের তুলনামূলক বিচার করে এ কথা বলছি না। এতে এই কথারই প্রমাণ হয় যে, মঞ্চের নাট্যকলারীতিতে এমন কিছু আছে যা চিত্রকলার অনবরত পরিবর্তমান, ছোট-ছোট-টুকরোয়-ভাগ-করা, **flitting** দৃশ্যাবলীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রের শিল্প বড় বেশী অবাস্তব, বড় বেশী ভঙ্গুর, বড় বেশী পরিবর্তনশীল। আলো ও ছায়ার সমাবেশে এবং অধুনা **technicolor** প্রসাদাৎ বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে সিনেমা মনে যে মোহ বিস্তার করে তার মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সেটা খুব বড় দরের জিনিস নয়, খুব বড় জোর তাকে আলোকচিত্রের জটিল রূপ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কাগজের পাতায় যে ফোটোগ্রাফ আমরা দেখি তার রূপটুকু সরল, তার প্রকৃতি

স্থাণু; সেই ফোটোগ্রাফেরই সচল এবং জটিলীকৃত রূপ হল ছায়াছবি—এই দিক দিয়ে বিচার করলে চলচ্চিত্রকে উঁচুদরের শিল্প বলতে অনেকেরই বাধবে। আমার অন্ততঃ বাধে।

উপরে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে কথা বললাম দর্শক-সাধারণের মধ্যে অনেকেই সে কথায় সায় দেবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। চলচ্চিত্র যেখানে যান্ত্রিক প্রয়োগনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা মাত্র, রঙ্গমঞ্চ সেখানে একটি জীবন্ত, প্রাণধর্মী, বাস্তব আর্ট। জনৈকা ইংরেজ লেখিকার মতে **"theatre shows humanity at its height."** এটা যে নিতান্ত কথার কথা নয় আশা করি নাট্য-কলারসিক মাত্রই সে কথা স্বীকার করবেন।

Edward Wood প্রমুখ লেখকেরা সিনেমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রমোদ (**'world's best entertainment'**) আখ্যা দেন এই যুক্তিতে যে, সিনেমায় সর্বসাধারণের দেখবার সুযোগ ও সুবিধা যত অবারিত অন্য কোন প্রমোদের বেলায় তেমন অবারিত নয়। সিনেমার টিকেট অনেক সস্তা, ব্যয়ের অনুপাতে তার বসবার ব্যবস্থা অত্যন্ত আরামপ্রদ; সিনেমা-গৃহের **air-conditioning** ব্যবস্থা থিয়েটার-হলের **air-conditioning**-এর চাইতে শ্রেষ্ঠতর, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু এইসব বহিরঙ্গের বিচারে কোন আর্টই অন্য কোন আর্টের চেয়ে বড় বলে স্বীকৃত হতে পারে না, **Edward Wood** প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য বস্তুবাদী লেখক যতই কেন না সিনেমার হয়ে এই নিয়ে ওকালতি করুন। প্রেক্ষাগৃহের আরামের ব্যবস্থার প্রশ্ন বা নাটককে সর্বসাধারণের অধিগম্য করে তোলার প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা সমস্যা—সেটা **management** এর সমস্যা, তার সঙ্গে নাটকের সমস্যাকে কিছুতেই এক করে দেখা চলে না। দুটো শিল্পের তুলনামূলক আলোচনায় আরাম-অনারামের প্রসঙ্গ অবান্তর, এর দ্বারা বিচার্য বিষয় গুলিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। **Edward Wood** ঠিক এই ভুলই করেছেন।

আর সস্তা টিকেট ও বসবার আসনের প্রশ্নই যদি বিচার করা যায় তো থিয়েটার কর্তৃপক্ষও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ওদেশের থিয়েটারগুলি এ

ব্যাপারে সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। আমাদের দেশেও যে তার ঢেউ এসে লেগেছে অধুনা-পরিত্যক্ত **Stage Development Syndicate**-এর পরিকল্পনার মধ্যে এবং অন্যান্য প্রয়াসের মধ্যে তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিখ্যাত ফরাসী মনীষী জর্জ ডুহামেল **commercial** সিনেমাকে অতি নিকৃষ্ট স্তরের আমোদ বলে বর্ণনা করেছেন। **"This terrible machine for stupefying and destroying the mind."** আমাদের দেশে শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়—যিনি এক কালে নিজে সিমেমায় অভিনয় করেছেন এবং অভিনয়কলা সম্বন্ধে যাঁর গভীর জ্ঞান আছে, তিনিও তাঁর ***Towards A National Theatre*** পুস্তিকায় সিনেমার বিরুদ্ধে অনেক সারগর্ভ যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। বোম্বাই-এর নাট্যকলারসিক অধ্যাপক বলভুন ধিঙ্গরাও তাঁর ***A National Theatre for India*** পুস্তকে বিচিত্র নজীর উপস্থিত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন সিনেমা কেন মার্জিতরুচি দর্শকের গ্রাহ্য হতে পারে না। তাঁদের সকলের মতামতের যৌক্তিকতাই স্বীকার্য। বিশেষ করে হলিউডের ছবির বিরুদ্ধে বলভুন ধিঙ্গরা যে সব কথা বলেছেন তার সারবত্তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

এঁদের সকলেই এই এক বিষয়ে একমত যে, যখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে **decadence**এর সূচনা হয় তখন সস্তা আমোদপ্রমোদ দর্শকচিত্ত অধিকার করে বসে। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের কালে রোমবাসীরা চটুল আমোদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। বর্তমান যান্ত্রিক পৃথিবীতে সংস্কৃতি যে একটি বিশেষ সঙ্কটের অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। এবং এরই ফলে সিনেমারূপ সস্তা আমোদ সর্বত্র জনমন হরণ করতে বসেছে। এর একটি প্রমাণ এই যে, সিনেমার যারা পৃষ্ঠপোষক, যারা গাঁটের পয়সা খরচ করে সিনেমা দেখে থাকে—তাদের একটা মোটা অংশই অপরিণতবুদ্ধি তরুণসম্প্রদায় এবং অর্ধশিক্ষিত বয়স্ক সম্প্রদায় থেকে আহৃত। উন্নাসিকের ভঙ্গিতে সিনেমা-দর্শকদের শ্লেষ করবার জন্যে এ কথা বলছি না; আমার বলবার কথা হল এই যে, সর্বদেশের সিনেমা

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে সাধারণ শ্রেণীর দর্শকের অপকৃষ্ট রুচির খোরাক যোগায় তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে খোদ্ সিনেমাশিল্পের মধ্যেই বিকৃত রুচির পোষকতা আছে? চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে এ যাবৎ এ দেশে যে শ্রেণীর লোক আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহর দেখলে এই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়। রামা শ্যামা যদু যে চিত্র নির্মাণ করতে যায় সেটা শুধু রামা শ্যামা যদুরই দোষ নয়, সিনেমা শিল্পের মধ্যেই এমন অপকৃষ্ট কিছু আছে যার আকর্ষণে রঙ্গমঞ্চের মোহ ত্যাগ করে লোকে চিত্র নির্মাণ করতে দৌড়য়। জনৈক লেখক ঠিকই বলেছেন, **"The popular cinema does not only cater for imbeciles, but breeds them."** জনপ্রিয় সিনেমা শুধু নির্বোধদের খোরাক জোগায় তা-ই নয়, দর্শকদের নির্বোধ বানিয়েও তোলে। হয়তো অভিযোগটিতে অতিরঞ্জন আছে, তবে তার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আশার কথা, বাংলার রঙ্গমঞ্চের পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাত দেখা দিয়েছে। শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের সর্বত্র জাতীয় নাট্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণ সচেতন হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্রে যে সব আলোচনা দেখতে পাই এবং গত কয়েক বৎসরে এই সম্পর্কে যে সব বই লেখা হয়েছে তাদের অনুধাবন করলেই সাধারণের উৎসাহের ব্যাপকতাটুকু অনুমান করা যায়। কতিপয় সুপরিচিত শৌখীন নাট্য-প্রতিষ্ঠান গত কয়েক বছরে কয়েকটি ভাল নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য দিক দিয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ থেকে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। প্রগতিশীলতার বোধের দ্বারা তা অনুপ্রাণিত। শৌখীন বা অ-পেশাদার নাট্যপ্রতিষ্ঠানগুলির সংহত প্রচেষ্টার ফলে বাংলার নবনাট্য আন্দোলন জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মূল্যবান দান রেখে যেতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ যে পরিমাণ পুষ্ট ও সমৃদ্ধ, বাংলা নাট্য-সাহিত্য সে পরিমাণ সমৃদ্ধ নয়; বরং বাংলা নাটক নানা দিক থেকে শোচনীয়ভাবে পশ্চাৎপদ—এইরূপ এক অভিযোগ প্রায়শঃ আমরা শুনে আসছি। কিন্তু কথাটুকু মাত্র বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কেন এমন হল, কেন বাংলা নাটক বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারছে না, সেটা বোধ হয় কেউ আমরা তেমন অনুধাবন করে দেখি না।

ছুটি প্রধান কারণ বাংলা নাটকের এই শোচনীয় অনগ্রসরতার পশ্চাতে সক্রিয় বলে মনে হয়। প্রথম কারণ, বাংলার সমাজজীবনে 'অ্যাকশন'-এর অভাব। 'অ্যাকশন' বা ঘটনা সকল নাটকের প্রাণবস্তু; সেই 'অ্যাকশন' বাংলা নাটকে অনুপস্থিত। অনুপস্থিত, কেন না সমাজজীবনে যা নেই, সমাজজীবনের চিত্ররূপ নাটকেও তা থাকতে পারে না। যদি কেউ সে চেষ্টা করে, তাঁর সেই চেষ্টা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হতে বাধ্য। সুতরাং হয় ঘটনার অপ্রতুলতাহেতু বাংলা নাটক বৈশিষ্ট্যবর্জিত, মন্থরগতি, জড়ভাবাপন্ন, নয় ঘটনার বাহুল্যহেতু তা অস্বাভাবিক, কৃত্রিম, বাস্তববিরোধী।

দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্যের ভিতর বরাবর নাটকের পটভূমিকায় একটা অনাবিল মনোরম পরিবেশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাঙালীর আজকের সামাজিক জীবনে সেই পরিবেশের কোন ছাপ নেই। তার জায়গায় আছে কঠোর জীবনসংগ্রামের অপরিহার্য পাওনা হিসাবে নানা রকম কুশ্রীতা, সঙ্কীর্ণতা, রুচিহীনতা। প্রাচীন সৌন্দর্যের ধারণা বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে, তার জন্যে শোক করে লাভ দেখি না। কিন্তু কোন প্রকার সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচয়ই বোধ হয় আধুনিক বাঙালীর জীবনে আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে দিকেই তাকাই, পুঞ্জীভূত কুশ্রীতা গলিত নখদন্ত বিকাশ

করে আছে। যে কল্পনাঘন সৌন্দর্যের আবহাওয়া প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের প্রাণ, সেই আবহাওয়া আধুনিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত। ফলে বাংলা নাটক শ্বাস নিতে পারছে না; স্তূপীকৃত আবর্জনার উৎক্ষিপ্ত ধোঁয়ায় ধূলোয় কেবলি তার দম আটকে আসছে। বাস্তব জীবনের শত সংগ্রামদীর্ণ, শত কুশ্রীতাপীড়িত দর্শক নাটকে সৌন্দর্য চায়। কিন্তু বাংলা নাটক সেই সৌন্দর্য কোথা থেকে পরিবেশন করবে?

উপরে যে দুটি কারণ বর্ণিত হল, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের একটা আর-একটার বিপরীত। 'অ্যাকশন' যেখানে প্রধান, সেখানে নানারূপ জটিলতা ও মালিন্য দেখা দিতে বাধ্য। ঘটনার স্রোতের ভিতর আবর্জনা ভেসে না এসেই পারে না। আবার নাটকে সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলতে হলে ঘটনাকে বাদ দিতে হয়, শুধু মনোময় পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া সেক্ষেত্রে গত্যন্তর থাকে না। প্রথমটি ইউরোপীয় নাটকের সংস্কারের অনুসারী; দ্বিতীয়টিতে ভারতীয় নাটকের সংস্কার বলবৎ। এই দুই পরস্পরবিরোধী সংস্কারের ভিতর সামঞ্জস্যবিধান কী করে সম্ভব?

হয়তো সম্ভব নয়, তবে দুটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হবার পথে কোন বাধা নেই। আধুনিক যুগে বাস করে ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের সংস্কারকে আমরা বর্জন করে চলতে পারি না। আবার ভারতীয় প্রাচীন নাটকের সংস্কারকে বাদ দিয়ে চলাও অসম্ভব। তাতে স্বীয় প্রকৃতিকেই অস্বীকার করা হয়। সুতরাং বাংলা নাটককে সচল, সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে ওই দুই ধারাকেই বজায় রাখতে হবে। এক শ্রেণীর নাটকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে তাদের গতিময় করে তুলতে হবে; অন্য এক শ্রেণীর নাটকে সুন্দরের ধারণাকে নাটকের কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নাটকের ভিতর অনাবিল, পবিত্র একটি আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে। নাটকের স্বধর্ম এবং আধুনিক ধর্ম—দুই কুলই এতে রক্ষা পাবে।

প্রথম কারণটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যবে, যে অর্থে ইউরোপীয় নাটক ঘটনাবহুল, 'অ্যাকশন-ময়,' সে অর্থে বাংলা নাটককে ঘটনাবহুল কোনক্রমেই

বলা চলে না। বাংলা নাটকে ঘটনা নেই, ঘটনার একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র আছে। এ না হয়ে যায় না। গত ত্নশো বছরের একটানা বিদেশী আধিপত্যের ফলে বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে এই একটা লক্ষণীয় প্রভাব দেখা গিয়েছে যে তার জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য বলতে কিছু বেঁচে নেই—ভারতীয় জীবন জন্মের স্থচনা থেকে মৃত্যুর সীমা পর্যন্ত একঘেয়েমির অখণ্ড ইতিবৃত্ত। আধুনিক বাঙালী জাতির হিসাব নিলে দেখা যায়, হয় বাঙালী সন্তান ক্ষেতের চাষী, নয় সাধারণ কোন বৃত্তিজীবী, নয় কেরানী, নয় অফিসার, নয় ব্যবসায়ী, নয় কারিগর, নয় এমনি ধারা আর কিছু। যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে হালে কিছু পরিমাণ লোক কারখানার শ্রমিক শ্রেণীর কলেবর গড়ে তুলেছে; কিন্তু শ্রমিক জীবনে যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রেণী-সংগ্রামের আলোড়ন জেগে উঠে, যতক্ষণ না সে ধর্মঘটের হাতিয়ার হাতে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ থেকে তাকে আলাদা করে দেখা চলে না। বরং খতিয়ে দেখতে গেলে, শ্রমিকের জীবন আরও বেশী বৈচিত্র্যহীন, আরও বেশী ধূসর। যন্ত্রের ধরাবাঁধা অভ্যাস তার রুটিনকে প্রতি পদে নিয়ন্ত্রিত করছে; যান্ত্রিকতার বাঁধা সড়ক ছাড়িয়ে তার এক পা বাইরে যাবার যো নেই।

কাজেই এ কথা আশা করি প্রতিবাদের ভয় না করে বলা চলে যে শতকরা অন্ততঃ পঁচানব্বুইটি বাঙালীর জীবনই বৈচিত্র্যহীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত। উদরান্ন সংস্থানের প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত মামুলী চিন্তা ও চেষ্টার মধ্যেই অধিকাংশ বাঙালীর অভিনিবেশ সীমাবদ্ধ। যে শ্রেণীগুলির নাম করা হল তার কোনটিরই কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য কিংবা অসাধারণ কর্মতৎপরতার অবকাশ নেই। এদের কর্মচাঞ্চল্য বলতে নিছক রুটিনমাফিক মাপা কাজ এবং বিশ্রাম বলতে আহার-নিদ্রা-মৈথুনকেই বোঝায়। নিশ্ছিদ্র, নীরন্ধ্র দিনগত পাপক্ষয়, আর কিছু নয়।

এই যেখানকার অবস্থা, সেখানে ঘটনার অসদ্ভাব ঘটবে, বলাই বাহুল্য। আর ঘটনা যদি থাকেও তা লঘুগতি না হয়ে যায় না—নিতান্ত মন্থর, শ্লথ সেই গতি। এই কারণেই দেখি, বাংলা নাট্যসাহিত্যে ভাল সামাজিক নাটক

নেই। প্রত্যেক নাট্যকারেরই ঝোঁক হয় পৌরাণিক, নয় ঐতিহাসিক, নয় আধা-ঐতিহাসিক নাটকের দিকে। পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মধ্যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা অবতারণা করার সুযোগ অবারিত, সেই কারণে এক শ্রেণীর দর্শকের কাছে অতিমাত্রায় ঘটনাশ্রিত পৌরাণিক নাটক খুবই হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হয়। এই ধরনের দর্শকদের রুচিকে আমরা স্থূল বলতে পারি, তাই বলে তাদের ভাল-লাগাটাকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। তাদের ভাল-লাগার পিছনে রুচি না থাকতে পারে, যুক্তি আছে। তেমনি ঐতিহাসিক নাটকের (বিশেষতঃ সে নাটক যদি মধ্যযুগীয় ইতিহাসের কোন চরিত্রকে বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়) বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে আড়ম্বরের সুবিস্তৃত অবকাশ। এবং এ কথা কে না জানে যে আড়ম্বরপ্রিয়তা মানুষের স্বভাবের একেবারে গভীরে নিহিত? বিশেষ, আজকের দিনের উপকরণবাহুল্যবর্জিত রিক্ত জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে আড়ম্বরের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হবারই কথা। আধা-ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কেও ওই একই মন্তব্য প্রযোজ্য। আধা-ঐতিহাসিক নাটকে বাস্তবের একটা আবরণ মাত্র আছে, বাকী অংশে রয়েছে কল্পনাবিলাসী জনশ্রুতির সঞ্চয় থেকে নেওয়া অবাস্তব কাহিনী।

এই তিন রকমের নাটক ছাড়াও অ-সামাজিক নাটক আছে। যে সকল নাট্যকার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য নাটকের উপাদান খুঁজে পান না, অথচ পুরাতন বিষয়বস্তু গ্রহণেও যাঁদের আপত্তি, তাঁদের তীক্ষ্ণ রুচিবোধ প্রহসন কিংবা ব্যঙ্গাত্মক নাটকের মধ্যে আত্মপ্রকাশের উপায় খোজে। এইভাবে তাঁরা আত্মগ্লানির হাত থেকেও রক্ষা পান, আবার বর্তমান রিক্ত সমাজ-জীবনের উপরও শোধ নেন। তিক্ততা দিয়ে নয়, উগ্রতা দিয়ে নয়, আপাতমনোরম পরিহাসরসিকতার মধ্য দিয়েই তাঁরা বর্তমান সমাজকে একহাত নিয়ে নেন।

বাংলা দেশে সফল নাট্যকারের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং আধুনিক কালের কয়েকজন নাট্যকার—এই তো

বাংলার নাট্যকারদের সজ্ঘশক্তি! এঁদের নাট্যরচনাবলী অনুধাবন করলে দেখা যাবে, এঁদের অধিকাংশ নাটকেরই উপজীব্য হয় পুরাণোক্ত কোন বিষয়, নয় ঐতিহাসিক কোনও চরিত্র কিংবা ঘটনার ব্যাখ্যান। হালে নাট্যকাররা সামাজিক নাটক লিখতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যে এই রেওয়াজ কিছুকাল পূর্বেও মোটামুটি অনুপস্থিত ছিল। দুই-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে আগেকার লেখা অধিকাংশ নাটকের উপজীব্য হিসাবে আমরা পুরাণ কিংবা ইতিহাসোক্ত কোনও না কোনও কাহিনীকেই পাই। আর যেখানে ইতিহাস পুরাণ ইত্যাদি মন্থন করার প্রয়োজন হয় নি, সেখানে নাট্যকাররা অবধারিতভাবে ব্যঙ্গ-নাটকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, প্রহসন রচনা করেছেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম আদি প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদনের নাট্য-রচনাবলীর মধ্যে বাংলার সমগ্র নাট্যসাহিত্যের সূত্রটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। মাইকেল পৌরাণিক নাটক লিখেছেন, ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন, এবং প্রহসন লিখেছেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্রেরও অধিকাংশ নাটক ইতিহাস অথবা পুরাণের ছায়ায় রচিত। তাঁর অজস্র নাটকের মধ্যে মাত্র দুটি সফল সামাজিক নাটক আছে—'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান'। ক্ষীরোদপ্রসাদের সুপরিচিত নাটকের প্রত্যেকটিই ঐতিহাসিক। প্রধানতঃ নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি সুবিদিত। দুটি-তিনটি সামাজিক নাটক ('পরপারে', 'বঙ্গনারী' প্রভৃতি) ছাড়া তাঁর প্রায় সব নাটকের বিষয়বস্তুই ইতিহাসের সুবিস্তৃত অঙ্গন থেকে আহৃত। আর 'রসরাজ' অমৃতলাল বসু সার্থক উপাধিক; প্রহসন ও ব্যঙ্গ-নাটকের তিনি রাজা।

উপরি-উক্ত নাট্যশ্রেণীর মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অন্য সবাকার থেকে নিঃসংশয়ে পৃথক একটি মাত্র নাটকের সাক্ষাৎ আমরা পাই। সে নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। কি বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে, কি পরিবেশের দিক দিয়ে, কি অভিপ্রায়ের দিক দিয়ে এই নাটকের জাত সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলা দেশের ইতিহাসের যে অধ্যায়ে কুখ্যাত নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার

শুরু হয় সে অধ্যায়টিকে এখনকার কাল থেকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা উচিত। কোম্পানির আমল সেকাল এবং একালের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ। সেই আমলের ধরনধারণ, করণকারণ সবই আলাদা। অত্যাচার, লুণ্ঠন ও তস্করবৃত্তি, এবং এই ধরনের অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপ লেগেই ছিল সে আমলে। নীলকরের উৎপাত তদানীন্তন সর্বব্যাপী অরাজকতার একটা দিক। অরাজকতার বর্ণনা করতে হলে ঘটনা—বীভৎস ঘটনা—লোকচক্ষে তুলে ধরতেই হবে, আর একমাত্র এই উপায়েই লোকের চেতনাকে কশাহত করা সম্ভব। সুতরাং বাংলায় অ্যাকশন-প্রধান যে স্বল্পসংখ্যক নাটক আছে স্বভাবতঃই নীলদর্পণকে তাদের অন্যতম বলা চলে, হয়তো নাটকটি তাদের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ। নাটকীয় সম্ভাবনার দিক দিয়ে বাংলা ভাষায় নীলদর্পণের তুল্য সমৃদ্ধ নাটক আজও রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

আমরা উপরে বর্ণিত নাট্যকারদের নামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম এক সঙ্গে উচ্চারণ করি নি। এর কারণ সুস্পষ্ট। ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে যে অনাবিল পরিবেশের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের আলোচনা স্বতন্ত্র মনোযোগের অবকাশ রাখে। একটু পরেই সে কথায় আমরা আসছি।

পাশ্চাত্ত্য নাটকে 'অ্যাকশন'-এর সংস্কার অতিশয় প্রবল। এলিজাবেথীয় আমল থেকেই এইরূপ ঘটে এসেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের সমাজ-জীবনের নাড়ীতে নাড়ীতে তীব্র কর্মচাঞ্চল্যের স্রোত নিরন্তর বহমান। প্রাচ্য দেশবাসী আমরা ভুগছি নিষ্ক্রিয়তায় ব্যাধিতে; আর পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরা ভুগছে অতিরিক্ত ক্রিয়াশীলতার অভিশাপে। একজনের রোগ রক্তাল্পতা; অপরের রক্তাতিশয্য। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের এই কর্মতৎপরতা, এই আত্যন্তিক কর্মস্ফূর্তি তার রাষ্ট্রিক জীবনে বহু অশুভের যাকর হলেও সাহিত্যের পক্ষে তার ফল ভাল হয়েছে। গত পঁচিশ বছরের ব্যবধানে দু-দুটো হিংস্র মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই বিষের পারাবার মথিত করে যে সাহিত্যের অমৃত

উঠেছে, ক্ষয়-ক্ষতির পিঠে সে লাভটাও বড় কম নয়। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের উৎস থেকে বিচিত্র ধারায় নূতন নূতন চিন্তাস্রোত উৎসারিত হয়েছে ; পাশ্চাত্ত্য কাব্য-উপন্যাস-নাটকের প্রবাহ সেই স্রোতোধারায় সচল, সক্রিয়, প্রাণবন্ত হয়েছে। বিশেষতঃ নাটকের ক্ষেত্রে যুদ্ধের শুভ প্রভাব সব চাইতে লক্ষণীয়-ভাবে চোখ পড়ে। স্থল জল অন্তরীক্ষ সব কিছুকে বেড় দিয়েই আধুনিক যুদ্ধের আয়োজন। যুদ্ধের বেদীমূলে জাতির সমগ্র অভিনিবেশ, সমগ্র কর্মতৎপরতাকে সমর্পণ না করলে যুদ্ধের দেবী তৃপ্ত হন না। সুতরাং যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধোদ্ভূত অবস্থাকে ভিত্তি করে যে নাটকের পটভূমি রচিত হয়, সেই নাটকে কর্মোচ্ছ্বাস অদম্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। সেখানে দৃশ্যসংযোজনাতেও কোন ধরাবাঁধা সঙ্কীর্ণ নিয়ম মেনে চলার অবকাশ নেই। চরিত্রগুলি বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করে। শুধু যুদ্ধ বলে নয়, সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের লক্ষণই হল এই অভিযাত্রিক সক্রিয়তা। একটা সংগ্রামশীল মনোভাব, একটা যুদ্ধমুখীনতা সব সময়েই যেন পাশ্চাত্ত্য মানুষের মনে সূচ্যগ্র হয়ে আছে। পাশ্চাত্ত্যের শান্তিকালীন অধ্যায়গুলি যুদ্ধের প্রস্তুতি ভিন্ন আর কিছু নয়। নাট্যসাহিত্যে এর একটা পরোক্ষ প্রভাব এই দেখা দিয়েছে যে, কোন কিছুই সেখানে স্বাভাবিক নয়, একটা অশোভন অশান্ত তাড়না যেন ধূমকেতুর পুচ্ছের মত কেবলই নাট্যাকাশকে ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। নিছক যেসব ড্রইংরুম সোশ্যাল, তার চরিত্রগুলিও ঠিক সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ নয় ; তাদের কারও চিন্তার প্রক্রিয়া জটিল, কারও চিন্তা বিকৃত, কারও রুগ্ন। আচরণ' তদনুপাতে অস্বাভাবিক। মনোবিশ্লেষণের আলোকে এদের অনেকেরই জটিলতার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে এই যুদ্ধমুখীনতার, এই অশান্ত কর্মের তাড়নার মধ্যে

ইউরোপীয় নাট্যকারের হাতে নাটকের বিষয়বস্তু কখনও-কখনও একটা সামাজিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে দেখা গেছে। এটাও ইউরোপের নাড়ীতে বহমান কর্মচাঞ্চল্যের একটা বহিঃপ্রকাশ। গত শতকের যুগপ্রবর্তক নাট্যকার ইবসেনের 'ডল্‌স্ হাউস'-এ প্রথম ইউরোপের নারী-

আন্দোলনের সূচনা, তাঁর 'ঘোস্ট' তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত কয়েকটি মারাত্মক কন্‌ভেনশনের বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ। ইবসেনের মন্ত্রশিষ্য বার্নার্ড শর 'ডক্টর্স ডাইলেমা' আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি প্রায় সর্বজনগৃহীত রীতির বিরুদ্ধে বিবেকবানের একক বিদ্রোহ। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও সংগ্রহ করা যেতে পারে। ইউরোপীয় নাটকের পটভূমিই বা কত বড়! গল্‌স্‌ওয়ার্দির 'দি লিটল ম্যান' ছোট্ট একটি নাটক; কিন্তু তার পটভূমি আন্তর্জাতিক। কয়েকটি বিভিন্ন দেশের মানুষকে তত্তৎ দেশের 'টাইপ' হিসাবে এই নাটকের চরিত্ররূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ইউজিন ও' নীলের নাটকে অসংখ্য চরিত্রের ছড়াছড়ি। তাঁর ভ্রাম্যমাণ নাবিক জীবনের ছাপ চরিত্রগুলির উপর স্পষ্ট।

কিন্তু বাংলা নাটকে এই ধরনের কর্মচাঞ্চল্য বা ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। নাটকের বিষয়বস্তুর মত নাটকের চরিত্রগুলির মনোজগৎও এখানে নিতান্ত সীমাবদ্ধ। ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই বাংলা নাটকের মানুষগুলির জীবন আবর্তিত। বাংলার নিবিরোধ কৃষি-সংস্কৃতিই এইরূপ হওয়ার প্রধান কারণ। গত পৌণে দুই শত বৎসরের ইতিহাসে সবই এখানে ঢিমে লয়ে চলেছিল—কোন কিছুর মধ্যেই চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি ছিল না। বাঙালী জীবন শান্ত সরোবরের নিস্তরঙ্গ জল, উত্তাল সমুদ্রের বীচি-বিক্ষোভ তাতে অনুপস্থিত। জাতীয় আন্দোলনের ধারা নিয়ে অবশ্য চমৎকার সক্রিয় নাটক রচনার অবকাশ ছিল; কিন্তু আমলাতন্ত্রের ভ্রূকুটিকুটিল নিষেধের শাসনে এতাবৎ তা সম্ভব হয় নি। এখন আর সে বাধা নেই, ফলে এই দিকে নাট্যকারদের দৃষ্টি ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছে, সুখের বিষয়। জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে এরই ভিতর দুটি-একটি ভাল নাটক রচিত হয়েছে।

বাংলার নাট্যসাহিত্যের বিকাশের আর একটি সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে বিগত যুদ্ধে। জাপান-যুদ্ধের সন্নিহিতির ফলে বাংলা দেশ আর বাংলা দেশের সমাজজীবন এমন গভীরভাবে নাড়া খেয়েছে যে, নাটকের পক্ষে সেই বিপর্যয়ের কাহিনী একটি প্রথম শ্রেণীর উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথাই

ধরা যাক। এর পিছনে যে প্রচণ্ড লোভ, যে পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, যে অপরিমেয় অন্যায় লুকিয়ে আছে তাকে আধুনিক নাটকের ঘটনা ও চরিত্র-সৃষ্টিতে চমৎকার ঘাত-প্রতিঘাতের উপকরণরূপে ব্যবহার করা চলে। এই ধরনের নাটকের নাটকীয় সম্ভাবনা যেমন প্রচুর তেমনি নীতিগত মূল্যও কম নয়। যুদ্ধের সর্বব্যাপী দুর্নীতির আবহাওয়ায় বাঙালী সমাজের বিবেক কতদূর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল নাটকের মধ্য দিয়ে তাকে যত সফলভাবে রূপায়িত করা যায়, আর কিছুর সাহায্যে বোধ হয় তেমন করা যায় না। দুর্ভিক্ষ নিয়ে নাটক অবশ্য কেউ কেউ লিখেছেন, তবে এই দিকে এখনও অবারিত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে।

বাংলার অধুনাতন সমাজে সুন্দর পরিবেশের অভাব, আগেই বলা হয়েছে। অথচ ভারতীয় প্রাচীন নাটকের ঐতিহ্যে এই সুন্দর পরিবেশ একটি প্রধান স্থান জুড়ে আছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তার অধিকাংশ নাটকের আবহাওয়াই সুন্দর ও অনাবিল। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ—এঁদের কারুর নাটকের পটভূমিতেই তেমন কলুষস্পর্শ নেই ; সবই কেমন স্বচ্ছ, ক্লেদবর্জিত, পবিত্র। যেন কোন শুচিশুভ্র, শ্বেত উত্তরীয়ের আচ্ছাদন দিয়ে নাটকের দেহগুলি ঘেরা। কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে কণ্বমুনির আশ্রমের পবিত্রতা যেন সমস্ত নাটকের আবহাওয়াটিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিও যেন নাটকটির একটি চরিত্র। ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিতে'ও একই শুচিস্নিগ্ধ আবহাওয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বোধ হয় বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' ছাড়া আর প্রায় প্রত্যেকটি সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে উপরের মন্তব্য অল্পবিস্তর প্রয়োগ করা চলে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র নাট্যকার যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের এই ঐতিহ্যকে তাঁর নাটকে ধারণ করে আছেন। রবীন্দ্রনাথ রূপক-নাট্যের পথ বেছে নিয়েছিলেন সে এজন্য নয় যে বাংলা দেশের প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থা নিয়ে নাটক লিখতে তিনি পারতেন না ; বর্তমানের সর্বব্যাপী কুশ্রীতার কবল থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় স্বরূপেই তিনি রূপকের

মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছিলেন। তাঁর 'ফাল্গুনী,' 'ডাকঘর,' 'অচলায়তন,' 'মুক্তধারা,' 'শারদোৎসব,' 'রাজা,' 'অরূপরতন,' 'তাসের দেশ'—সব কটি নাটকের পটভূমিকাই লৌকিক বিচারে অবাস্তব। মনে হয় এই সকল নাটকের পটভূমির মধ্যে তিনি সুন্দরকে আবাহন করতে চেয়েছিলেন, অবাস্তব বলেই অবাস্তবের প্রতি তাঁর কোন ঝোঁক ছিল না। যা বাস্তব চিত্রের সঙ্গে মেলে না তাই অবাস্তব —কথাটা সব সময় ঠিক নয়। দেখতে হবে লেখকের অবাস্তবতার ভিত্তি কী, বা তার পশ্চাতে কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করছে—সেই নিরিখেই মাত্র বাস্তব-অবাস্তবের বিচার চলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ রূপক-নাট্যের সন্ধানী বাস্তব অনভিজ্ঞ বলে নয়, বাস্তবের প্রতি বীতরাগ বলে। নইলে বাস্তব সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কারও চেয়ে কম ছিল না।

কবি যে সকল সরস-নাটক রচনা করেছিলেন তারও ভিতরের কথা এই। 'গোড়ায় গলদ,' শোধবোধ,' বৈকুণ্ঠের খাতা' কিংবা 'চিরকুমার সভা' নাটকের চরিত্রগুলিকে বাংলার সমাজ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের তৎকালীন মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা বলা চলে না। কি কথাবার্তায়, কি হাবেভাবে তারা সকলেই কেমন যেন একটু সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষের আচরণের সঙ্গে তাদের আচরণ মেলে না। এর কারণ, রবীন্দ্রনাথের সরস-নাট্যে চরিত্রসৃষ্টি বাস্তবানুসারী হয়েছে কিনা সেটা মুখ্য কথা নয়, চরিত্রগুলি তাদের হাবেভাবে চলনে বলনে একটা শুভ্র, অনাবিল পরিহাসতরল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছে কিনা সেইটেই আসল কথা।

বাংলার নব্য চিত্রকলা

বাংলার নব্য চিত্রকলার ইতিহাসের তিনটি সুচিহ্নিত ক্রম আছে। আদি, মধ্য ও সাম্প্রতিক যুগ। আদি যুগ প্রায় গোটা উনিশ শতক জুড়ে বিস্তৃত, মধ্য যুগ উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর সাম্প্রতিক যুগের পরিচয় তার নামের মধ্যেই বিধৃত।

প্রত্যেকটি যুগের চিত্রকলারই একটা বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। প্রথম অধ্যায়ের চিত্রকলায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবটাই ছিল সবচেয়ে বলবৎ। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কারের ধারার প্রভাব চিত্রে প্রতিফলিত করার আগ্রহ ও চেষ্টা তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। আমাদের তদানীন্তন শিল্পীরা ইউরোপের রেনেসাঁ-যুগের শিল্পীদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলির অনুকরণে চিত্রাঙ্কনকেই তাঁদের শিল্পজীবনের সার বলে জেনেছিলেন এবং ওই-জাতীয় ছবির নিতান্ত ব্যর্থ অনুকৃতি এঁকে নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ করতেন। এ যুগটা প্রধানতঃ তৈলচিত্রের যুগ, প্রতিকৃতি অঙ্কনের যুগ। আমাদের পুরাতন জাতীয় ধারার চিত্রকলার সঙ্গে এ কালের শিল্পীদের যোগ ছিল না। সে বিষয়ে তাঁরা মাথা ঘামানোরও প্রয়োজন বোধ করেন নি। বস্তুতঃ ইতালীর নবজাগ্রত কালের চিত্রকলা, ওলন্দাজ চিত্রকলা, এবং রসেটি, মরিস, ভেলাজকোয়েজ, টার্নার-প্রমুখ বিলিতী চিত্রকরদের আঁকা ছবির আদর্শ তাঁদের মনকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, ভারতবর্ষের পুরাতন শিল্পকলার ঐতিহ্যের ভিতরও যে কিছু সম্পদ থাকতে পারে এ কথা একবারও তাঁদের মনে হয় নি। আমাদের অজন্তা, রাজপুত, কাঙড়া ও মুঘল চিত্রকলার মধ্যে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ানো বিভিন্ন কালের ভাস্কর্য, মন্দিরশিল্প আর স্থাপত্যের আদর্শের মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য আর সৌন্দর্য কিছু কম ছড়ানো নেই। কিন্তু মোহগ্রস্ত মানুষ যেমন রত্নখণ্ড ফেলে দিয়ে আঁচলে

কাচ বাঁধে, তেমনি উনিশ শতকীয় বাঙালী শিল্পীরা জাতীয় চিত্রকলার সম্পদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বিদেশী চিত্রকলার দ্বারপ্রান্তে দাসবৎ নতজানু হয়ে বসেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা তার স্ব-ক্ষেত্রে মহান সৌন্দর্যের আধার তাতে সন্দেহ নেই, তবে সৌন্দর্য বস্তুটি সার্বভৌম এবং সার্বকালিক আবেদনযুক্ত হলেও তারও দেশে দেশে রূপভেদ আছে। একের পক্ষে যা স্বাভাবিক তা-ই অপরের নিকট বর্জনীয় হতে পারে, হয়েও থাকে। আঞ্চলিক এবং কালগত এই রূপভেদ যদি আমরা স্বীকার না করি তা হলে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কোন অর্থই থাকে না। জীবনের সকল স্তরে আর সকল বিভাগেই 'স্বধর্ম' 'পরধর্ম' বলে দুটি কথা আছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও কথা দুটি কম প্রযোজ্য নয়।

স্পষ্টতঃই ওই প্রথম অধ্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে স্বধর্মের বোধ জাগ্রত ছিল না। তাঁরা বিদেশী চিত্রকলার আদর্শের ভিতর শিল্পজীবনের সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে স্বীয় অন্তঃস্বভাবকেই অস্বীকার করেছিলেন বলা চলে। এঁদের রচনার ভিতর কখনও কখনও যদিও রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর বিষয়বস্তু চিত্রিত হয়েছে, তৎসত্ত্বে সে রূপকর্ম জাতীয়তামণ্ডিত হতে পারে নি এই কারণে যে, সেই সকল চিত্রের অঙ্কনরীতি পূরাপূরিই ছিল বিদেশী। বিজাতীয় আঙ্গিকের আশ্রয়ে রূপায়িত অতি বড় জাতীয় বিষয়বস্তুও বিকারদশাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য, তা সে রূপকার যত কুশলী শিল্পীই হোন না কেন।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে আমাদের শিল্পীদের এই আত্যন্তিক পরনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর মোড় ঘুরে গেল। এই সময়ে নূতন যে সকল শিল্পীর আবির্ভাব হল তাঁরা বিজাতীয়তার মোহ ত্যাগ করে পুরাতন জাতীয় চিত্রকলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঞ্চয় থেকে অনুপ্রেরণা আহরণের চেষ্টা করলেন। নবচেতনায় উদ্দীপ্ত তাঁদের সাধনার লক্ষ্য হল স্বধর্মে স্থিত হওয়া, ভারতীয় চিত্রকলার স্বভাবগত স্ফূর্তির উৎস সন্ধান ও আবিষ্কার করা। জাতীয় চৈতন্যের ভিতর তাঁরা ওই উৎসের সন্ধান পেলেন। এই সন্ধানকার্যে তখনকার

কালের আবহাওয়া তাঁদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। তখন বাংলার আকাশে বাতাসে স্বাদেশিকতার উদ্বোধনী মন্ত্রের ধ্বনিতরঙ্গ সদা সঞ্চরমাণ। দেশকে স্বাধীন করবার আগ্রহে জাতি একটা নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের সেটি প্রাথমিক বিকাশের কাল। কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও তৎপ্রবর্তিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ছাপ এসে পড়েছিল দেশের সকল কর্মে, সকল বিভাগে। দেশের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য ওই সর্বব্যাপী প্রভাব-পরিধির বাইরে ছিল না। বৈদেশিক আধিপত্যের নাগপাশ ছিন্ন করবার চেষ্টা করতে গিয়ে বাঙালীর দৃষ্টি শুধু যে তাঁর মাতৃভূমির বহিরঙ্গের উপরই পড়েছিল তা-ই নয়, জাতির প্রাচীন সম্পদের সম্ভাব্য সকল প্রকার আধারস্থলগুলির উপরও তার মনোযোগ সমান ন্যস্ত হয়েছিল। ওই মনোযোগের ফলেই হাবানো ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারের সাধনা আরম্ভ হয়, আর ওই চেষ্টার ভিতর নানা অনুকূল কার্যকারণের সমবায়ে চিত্রকলা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। আজকের দিনে আমরা যাকে প্রাচ্যরীতির চিত্রকলা বলি তার সূচনা এইভাবেই হয়।

শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ এই পুনর্জাগ্রত জাতীয় শিল্পধারার প্রধানতম প্রবক্তা তো বটেই, অদ্যাবধি প্রধানতম প্রকাশকও বটেন। তাঁর হাতেই এই রীতির বিকাশ এবং শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী প্রথমে বৈদেশিক রীতি দিয়েই তাঁর শিল্পজীবনের আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু এই শিল্পিশ্রেষ্ঠের সম্বিত ফিরে আসতে বিলম্ব হয় নি। অল্পকাল মধ্যেই তিনি তাঁর পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছিলেন—মাতৃভূমির পুণ্য মৃত্তিকা। সব চেয়ে আশ্চর্য, অবনীন্দ্রনাথের এই ভারত-আবিষ্কার সাধনায় সর্বাধিক সহায়তা করেছিলেন যে কজন তাঁদের প্রত্যেকেই বিদেশী—হ্যাভেল, ওকাকুরা, সিস্টার নিবেদিতা প্রভৃতি। এই আশ্চর্য সংঘটনেব একাধিক কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে, তবে একটি প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বিদেশীরাই বিদেশের অনুকরণ সবচেয়ে অপ্রীতির চোখে দেখে এবং ওই অশ্রদ্ধেয় প্রক্রিয়ার ভিতরকার ফাঁকিটুকু সহজে ধরতে পারে। ইংলণ্ড যে ভিন্ন দেশবাসীর নিকট

কখনও স্বদেশ হতে পারে না সে ইংরেজের চাইতে বেশী কে আর বুঝতে পারবে? যাই হোক, অবনীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বাংলার চিত্রকলা আন্দোলনকে সম্পূর্ণ জাতীয় ভাব দ্বারা মণ্ডিত করলেন—এটি তাঁর শিল্পজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। স্বদেশীয় সংস্কারের অনুশীলনেই যে আমাদের শিল্পীদের সর্বাধিক স্বভাবের স্ফূর্তি, স্বীয় শিল্পকর্মের মধ্যে তার কার্যকরী প্রমাণ উপস্থিত করে অবনীন্দ্রনাথ বাংলার শিল্পচেতনার সুনিশ্চিত অপঘাত-সম্ভাবনা রোধ করলেন।

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে মাত্র একটি নূতন শিল্প-আন্দোলনের প্রবর্তক মনে করলে ভুল করা হবে। একটু আগেই বলেছি যে, অবনীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র নব শিল্পরীতির একজন প্রবর্তকই নন, ওই শিল্পরীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশকও বটেন। আমাদের বাংলা চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এত বড় কবিপ্রাণ শিল্পীর আর আবির্ভাব হয় নি। আমার মনে হয় শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের ভূমিকার উপর জোর দিতে গিয়ে তাঁর শিল্পী ভূমিকাকে বাংলা দেশ কিয়ৎপরিমাণে খর্ব করে দেখেছে। এতে এই মহান শিল্পনায়কের প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয়েছে, বলাই বাহুল্য। একজন শিল্পী নূতন শিল্প-আন্দোলনের প্রবর্তনার সূত্রে কী পরিমাণ কর্মদক্ষতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন সেটি ইতিহাসের বিষয়, ইতিহাসেই তার স্থান হওয়া উচিত; ওই তৎপরতার সঙ্গে বিশুদ্ধ শিল্পকর্মের বিশেষ সম্পর্ক নেই। অবনীন্দ্রনাথ যেখানে একটি নূতন আন্দোলনের জন্মদাতা সেখানে তিনি নেতা, চালক, সংগঠক, কর্মী। কিন্তু যেখানে তিনি শিল্পী সেখানে তাঁর আর সব পরিচয় বাহ্য; বিশুদ্ধ শিল্পী হিসাবেই তখন তাঁকে আমাদের বিচার করতে হবে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবনীন্দ্র-নাথের প্রতিভার তুলনা হয় না। তাঁর নেতৃ-পরিচয়কে বহুদূর ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পী-পরিচয়। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় এক অদেখা জগতের অস্পষ্ট আভাস রূপকথার রহস্যে আর কুয়াশায় মিশে আমাদের স্বপ্ন-সত্তাকে বারেবারেই আলোড়িত করতে থাকে। এ স্বাদ আর কার ছবিতে পাব! এমন সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতিই বা আর কোন্ ছবিতে মিলবে!

শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ এক সুবিশাল ও সুসমৃদ্ধ শিষ্যপরম্পরার স্রষ্টা। শিষ্য, অনুশিষ্য আর প্রশিষ্যে মিলে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব বহুব্যাপ্ত। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, সুরেন্দ্রনাথ কর, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনয়নী দেবী, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, সুধীর খাস্তগীর, রামকিঙ্কর বৈজ,—প্রখ্যাতনামা শিল্পীদের সে এক বিরাট মিছিল। এর ভিতর শিল্পাচার্য নন্দলালের নাম নানা কারণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। চিত্রকলায় গ্রামীণ ভারতের তিনি শ্রেষ্ঠ রূপকার। গ্রামজীবনের স্বপ্নসুন্দর শ্রীমণ্ডিত রূপটিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অগণিত রেখা ও বর্ণচিত্রে। চিত্রের ভাবময় রূপ এবং আঙ্গিকগত রূপ উভয়তঃ তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। বিভিন্ন পদ্ধতির অঙ্কনশৈলীর উপর তাঁর দখল অসামান্য। তাঁর রেখাসকল নির্ভুল এবং বলিষ্ঠ। তবে সব জড়িয়ে নন্দলালের চিত্রকর্মকে বিচার করতে গেলে বলতেই হয় যে তিনি মূলতঃ শান্তরসের সাধক। কাব্যের গভীর ব্যঞ্জনা কিংবা আঘাত-সংঘাতময় জীবনের আলোড়ন অপেক্ষা তাঁর ছবিতে যেন প্রজ্ঞা-সুন্দর প্রশান্তির ভাবটিই বেশী বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। নন্দলালের শিল্পী মন শান্তস্থির কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের সুরে বাঁধা; এ মনের ভিতর আধুনিক কালোচিত হতাশা আর জিজ্ঞাসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিক্ষেপের আলোড়ন এতটুকু দাগ কাটতে পারে নি। সাম্প্রতিক শিল্পকলার জটিল তথা নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্ব থেকে নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে রেখে নন্দলাল যেমন আধুনিক রীতির শিল্পকলার প্রতি তাঁর চিত্তের বিমুখতা প্রকাশ করেছেন, তেমনি ওই প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বীয় চিত্তের শান্তিকেও সুরক্ষিত করেছেন! চিত্রকলার এক অক্লান্ত সাধক আচার্য নন্দলাল, জীবনভোর তিনি ছবি এঁকেছেন এবং এখনও অবিরাম ধারায় ছবি এঁকে চলেছেন; তবে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, ওই আত্যন্তিক কর্মতৎপরতা সত্ত্বে তিনি তাঁর উচ্চ-

ভাবলোকে অবস্থিত শিল্পিমনের প্রশান্ত বৈরাগ্য অমলিন রেখেছেন। নন্দলালের অনাসক্তি বিস্ময়কর।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী নামপঞ্জীর অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারেন। যদিও তিনি মুখ্যতঃ অবনীন্দ্র-নন্দলালের ধারাবাহী শিল্পী, তা হলেও তাঁর চিত্রকলায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবও কিছু কম লক্ষ্যগোচর নয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য কলারীতির ভিতর তিনি এক সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর ছবিতে। ললিত এবং রুদ্র দুইই তাঁর হাতে খোলে ভাল, আর তাঁর ভাস্কর্য তো একান্তভাবেই ইউরোপীয় ভাস্কর্যের পৃথুলতা ও বলিষ্ঠতার স্মারক। মনে হয় দেবীপ্রসাদ ছাড়া প্রাচ্য কলারীতির অনুশীলন-কারীদের মধ্যে আর একজন মাত্র শিল্পীর ছবিতে ও ভাস্কর্যের নমুনায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সুসমঞ্জস সমন্বয় ঘটেছে—তিনি রামকিঙ্কর। আধুনিক পদ্ধতির চিত্রকলার আদর্শ রামকিঙ্করের শিল্পকর্মের উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রাচ্য কলারীতির সাধকদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে নিবিড় শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেও বলা যায়, আমাদের আধুনিক চিত্রকলার আন্দোলনের ইতিহাসে এমন একটা সময় এল যখন শিল্পচেতনাকে নূতন পথে চালিত করবার প্রয়োজনবোধ ও আকূতি আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। শিল্পরূপ যত মহানই হোক, একই শিল্পরূপের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি চললে তাতে একঘেয়েমি-দোষ বর্তাতে বাধ্য। প্রাচ্য কলারীতির শিল্পসাধনাকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম মনে করবার কারণ নেই। তা ছাড়া নতুন কালের প্রয়োজনে নতুন শিল্পরূপ দেখা দেবেই, পুরাতন অনির্দিষ্টকালের জন্য জায়গা জুড়ে থাকতে পারে না। নূতনের ভালমন্দ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ সব সময়েই থাকবে, সেই বিতর্কের ভিতর প্রবেশ না করেও বলা যেতে পারে যে, রুচির পরিবর্তনে চাহিদারও পরিবর্তন আর ওই চাহিদার অনুসার ও অনুপাতেই শিল্পরূপের বিবর্তন নিষ্পন্ন হয়। আধুনিক পদ্ধতির চিত্রকলার ভিতর বিশুদ্ধ শান্তরস আর কৃষিকেন্দ্রিক সারণ্যের ছাপ যদি নাই থেকে থাকে, বুঝতে হবে সাম্প্রতিক কালের অবস্থায়

ও ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে এবং তদনুযায়ী শিল্পরূপেরও বদল ঘটেছে। একটা জিনিস অতি প্রত্যক্ষ যে, নাগরিকতা তথা আধুনিক জটিল মনন হালের শিল্পকলার উপর ক্রমশ অধিক প্রভাব বিস্তার করছে। সু ও কু, আলো ও অন্ধকার, সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান চেতনা, পাপ ও পুণ্যের বোধ মিলিয়ে যে মিশ্র মননলীলা, সেই মননেরই সর্বাধিক ছাপ পড়ছে এসে সমকালীন চিত্রকলার উপর। শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতার হতাশা আর দ্বিধা, প্রত্যয়হীনতা আর ভোগলিপ্সা, অভাব-অনটন আর রোগজর্জরতা, অপরাধবোধ, বিষাদ আর বিমর্ষতা—একে একে সব কটি লক্ষণই হালফিল চিত্রকলার উপর তাদের কালো ছায়া বিছিয়ে দিচ্ছে। শিল্পীরা প্রকৃতি থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহরণ করে হয় তাকে মনের গভীরে চালিয়ে দিচ্ছেন, নয় তো নগর-জীবনের নিতান্ত বাস্তব পরিবেশের উপর তাকে সংবদ্ধ করছেন। নিসর্গচিত্র (landscape) অপেক্ষা সমাজ-বাস্তবতামণ্ডিত 'রিয়ালিস্টিক' চিত্র কিংবা সুর-রিয়ালিস্টধর্মী মনোমুখী চিত্র অঙ্কনের দিকেই সাম্প্রতিক শিল্পীদের সমধিক ঝোঁক। গ্রামীণ জীবনের সারল্য, সহজতা আর শান্তরস নগরের প্রান্তসীমায় এতটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে না, সুতরাং আধুনিক নাগরিক চিত্রকলায়ও তাদের ছাপ অনুপস্থিত। আদর্শ সারল্য আর প্রশান্তি খোদ্ গ্রামেই আজকাল দুর্লভ, শহর তো দূরস্থান। সুতরাং স্বভাবতঃই আচার্য নন্দলালের আদর্শবাদকে সশ্রদ্ধ চিত্তে বিদায় জানিয়ে সাম্প্রতিক শিল্পীরা আধুনিক কালোচিত জটিল মননের রূপায়ণের দিকে বেশী ঝুঁকেছেন। শক্তিভেদে এ চেষ্টার সাফল্য ও ব্যর্থতা, তবে এ চেষ্টার অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা যায় না।

কলকাতায় সাম্প্রতিক শিল্পকলার প্রবক্তাদের একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে। এঁদের সকলেই তাঁদের সাধনার মধ্য দিয়ে সমকালীন জীবনকে রূপ দেবার চেষ্টা করছেন—চেষ্টার ফলাফল, বলাই বাহুল্য, তাঁদের শক্তির তারতম্যের মানদণ্ডে বিচার্য। এক সময়ে 'ক্যালকাটা গ্রুপ' এইরূপ এক চেষ্টার সংহতিস্থল ছিল, এখন তদন্তর্গত শিল্পীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিশে গেছেন।

আধুনিক শিল্পের প্রবক্তাদের মধ্যে এই সব শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়—রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর বৈজ, গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পাল, রথীন মৈত্র, রথীন মিত্র, প্রদোষ দাশগুপ্ত, শুভো ঠাকুর, সুনীল পাল, মাখন দত্তগুপ্ত, আমিনা আহমেদ, জয়নুল আবেদীন, গোবর্ধন আঁশ, গোপেন রায়, পরিতোষ সেন, হৈমন্তী সেন, নীরদ মজুমদার, শৈলজ মুখার্জি, প্রশান্ত রায়, চিন্তামণি কর, কিশোরী রায়, রণেন আয়ান দত্ত, শৈলেন মিত্র, দেবনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আমরা এতাবৎ শ্রীযামিনী রায়ের নাম করি নি। ইচ্ছা করেই করি নি। যামিনী রায় আধুনিক বাংলার শিল্পকলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর এক ব্যক্তিত্ব —একক এবং অদ্বিতীয়। তিনি একাই একটি শ্রেণী। তাঁর ধারার পূর্বসাধকও কেউ নেই, সম্ভবতঃ উত্তরসাধকও কেউ থাকবে না। পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ অঙ্কনরীতি, বিশেষ করে তৈলচিত্র আর প্রতিকৃতি-চিত্রের আঙ্গিক সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে সেই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত হেলায় ত্যাগ করে তারপর বিগত বাংলার পটশিল্পের পুনরুজ্জীবন চেষ্টায় সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগের দৃষ্টান্ত একমাত্র যামিনী রায়ের মত আদর্শনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা শিল্পীতেই সম্ভব। লুপ্তপ্রায় কালীঘাটের পটশিল্পের পুনরুজ্জীবন আর ঐকান্তিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যামিনী রায় কতটা কী পেলেন আর কতটা হারালেন তার বিচারের সময় এখনও হয় নি। ভবিষ্যৎ একদিন এ প্রয়াসের যথার্থ মূল্য পরিমাপে অগ্রসর হবে। তবে এক বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, যামিনী রায় সাম্প্রতিক বাংলার সর্বাধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পী। ত্যাগ ও দৃঢ়চিত্ততার তিনি এক মুখ্য দৃষ্টান্তস্থল। যামিনী রায়ের শিল্পী-সত্তার এই দিকটির হিসাব না নিলে তাঁর প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে।
